কনখল

মনীশ ঘটক ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
১২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৬৩

প্রচ্ছদ
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
জ্ঞানোদয় প্রেস
১৭ হায়াৎ খাঁ লেন ।। কলিকাতা ৯

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এভারেস্ট প্রিন্টার্স (৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ।।

পুণ্যশ্লোক

৺স্থরেশচন্দ্র ঘটক

৺ইন্দুবালা দেবী

বাবা ও মা'র পাদপদ্মস্মরণে

এই আখ্যায়িকা শ্রীহুমায়ুন কবীর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র 'চতুরঙ্গে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিলো। পুস্তকাকারে মুদ্রণের পূর্বে উক্ত পত্রের কর্মকর্তাদের কাছে উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

কল্যাণীয় শ্রীমান আতাউর রহমান ও আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সোমার কাছ থেকে গ্রন্থ রচনার সময় সোৎসাহ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের ঋণ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করি।

মনীশ ঘটক

আসামের লাকাতুরা চা বাগিচা থেকে যে রাস্তা শাহ্‌জলালের দর্গার পাশ কাটিয়ে শিলেট শহরে এসে ঢুকেছে, এক বর্ষার ঘটাঘন ঘোর সন্ধ্যায় জনৈক অশ্বারোহী যুবক সেই রাস্তা ধরে ধীর কদমে শহরের দিকে অশ্বচালনা করছিলেন। সেটা ইংরেজি সন ১৯১১, হ্যালীর ধূমকেতুর আবির্ভাব ও ইংলণ্ডরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুর বছর।

দূরে পুলিস হাসপাতালের টিলার আলো, মাঝখানে পোলো খেলার ময়দান, একটু বাঁয়ে চোখ ফেরালে সিভিল সার্জনের টিলা, সব যুবকের চোখে পড়ছে। পুলিস হাসপাতালের টিলাটি বড়ো, সেখানে হাসপাতাল ছাড়াও ডাক্তারের বাংলো এবং যুবকটির বাংলো আছে। যুবতী স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র নিয়ে উৎকণ্ঠিতা হয়ে প্রহর গুণছে। যুবক উদ্বিগ্ন বোধ করলেও ক্লান্ত ঘোড়াকে আর ছোটাতে চাইছিলেন না। ঘোড়া মন্থর পায়ে যে ঢুলকীতে চলছিল তারই তালে গা ছেড়ে দিয়ে যুবক সওয়ার হয়ে ছিলেন। পোলো ময়দানের মোড় নিতে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবেই, কোনো চারা নেই।

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে বিদেশী গৌরবরবি অস্তমিত হবার প্রায় পাঁচ দশক আগেকার কাহিনী। যুবক একজন হালফিল ম্যাজিস্ট্রেট, বাঙালী। নাম হৃষীকেশ বাগচি।

তখন দূর দূরান্তর থেকে শাহ্‌জলালের দর্গার বাসিন্দা অগণিত জালালী কবুতর ঘরে ফিরে আসছে দিক অন্ধকার করে। সমস্ত দিনমান বিশ্রামহৃষ্ট অসংখ্য বাদুড় দর্গার ভেতর-বাইরের গাছগুলোর মাথা থেকে ঝটপট করে ডানা মেলছে রাত চরবার ধান্দায়। দূরে বহু দূরে লাকাতুরা চা বাগিচা বরাবর যে সীমাহীন হাওড়, তাতে

লক্ষ লক্ষ আলেয়ার নৃত্যলীলা শুরু হয়েছে—ওরা নাকি পথহারা পথিকদের পথ দেখাবার ছল করে ভুলিয়ে নিয়ে হাওড়ের গভীর পাঁকে ডুবিয়ে মারে। ওপরে, নীচে, আশেপাশে, জোনাকির খই ফুটতে শুরু হয়েছে।

যুবক রাশ ঢিল দিয়ে ঘোড়ার ওপর অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল। অভ্যস্ত পথে ঘোড়া আপনিই পথ চিনে চলেছিল। ডাহিন বাঁক নেবার সময় অদূরে অবস্থিত মেক্‌লা গ্রাম থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল কানে আসতে প্রথমে ঘোড়া, পরে সওয়ার কান খাড়া করে শুনল। যুবকের ঘনকৃষ্ণ পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ, দুধার ছুঁচলো। অভিনিবেশের দরকার হলেই একটু মাথা কাত করে বাঁ হাতে গোঁফে চাড়া দেওয়া অভ্যাস। এখনো তাই দিলেন। কোলাহল অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, ক্রমশঃ স্পষ্টতর হল। মনে হল যেন দরগার ইমাম সাহেবের দৃপ্ত কণ্ঠের জোরদার হুকুমজারির আওয়াজ কানে এল। কিছুক্ষণ পর অবোধ্য গুঞ্জন তুলে সোরগোল মিলিয়ে গেল। ঘোড়া থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রেকাব সমেত বাঁ পা ঘোড়ার পেটে ঠেকাতে ঘোড়া আবার চলতে শুরু করল। যুবকের ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেল না, অনিশ্চিত একটা দুশ্চিন্তা সারা পথ সাথী হয়ে রইল।

বাংলোয় পৌঁছবার সাথে সাথেই ঘোর বর্ষণ শুরু হল। সহিস ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল। যাবার আগে যুবক ঘোড়ার ঘাড়ে-গর্দানে আদর করে দুটো চাপড় দিলেন, কপাল থেকে নাক পর্যন্ত সস্নেহে হাত ঘষলেন, ঘোড়াও ঘাড় বেঁকিয়ে যুবকের কাঁধে মুখ বুলিয়ে দিল, ঠোঁট ফাঁক করে দাঁত বার করে তৃপ্তির হ্রেষাধ্বনিও করল। যুবক বললেন,

—যাও কাঞ্চন, আরাম কর গে।

ঘোড়ার নাম কাঞ্চন। পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া। গায়ের রং সোনালী, কপাল থেকে নাক বরাবর খাড়া সাদা তিলক, চার পায়ের খুরের গোড়া সাদা। প্রবাদ, পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া বড়ো পয়মন্ত।

যুবকের হাঁটবার কায়দা দৌড়ের সমগোত্রীয়। তিন লাফে সিঁড়ি ভেঙে বাংলো মুখী ছুট দিলেন তিনি।

হলঘরে ডিট্‌মারের ঝোলানো বাতির উজ্জ্বল প্রভাকে, চাবি ঘুরিয়ে উজ্জ্বলতর করে দিলেন নিভাননী। দরজা খুলে, একপাশে সরে দাঁড়ালেন। যুবক ভেতরে পা দিয়ে টুপির দাঁড়ে টুপি খুলে রেখে নিভাননীর মুখচুম্বন করে গোসল কামরার দিকে চলে গেলেন। পাশ থেকে গুরু গম্ভীর গলায় ন'বছরের ছেলে কনখল বলল,

—দরজা বন্ধ করে দাও মা, জল আসছে ঘরে।

মুখচুম্বনটা ছেলের চোখ এড়ায়নি টের পেয়ে নিভাননীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। বললেন,

—কংখ্, তুই বুঝি এখানেই ঘুর ঘুর করছিলি ?

হৃষীকেশের ছেলে কনখল। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, পরেরটির নাম রেখো লছমনঝোলা মেয়ে হলে জাহ্নবী।

কনখল বলল,—ঘোড়ায় চড়ে বাবা ওই নীচের রাস্তা থেকে টিলার ওপরে ওঠেন, আমার খুব ভালো লাগে দেখতে।

তারপর আবার কি ভাবলে। ভেবে মাথা নেড়ে বলল,

—না, শুধু তাই নয়। ওই দূরে দর্গার বাঁক থেকে এত্তোটুকু ছোট্ট ফোঁটার মতো সাদা টুপিওলা বাবা, বাড়ির কাছে আসতে আসতেই কতো বড়ো হয়ে যান, সেইটে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

নিভাননী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

—বাবা যে সত্যিই খুব বড়ো, তাই ; বয়েস হলে বাবার কনাও বাবার মতো বড়ো হবে, নারে কংখ্ ?

কনখলকে মা ডাকেন কংখ্ বলে। বাবা বলেন কনা।

হৃষীকেশ গোসলখানা থেকে ছাপছন্দ হয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে ঘরে এসে ঢোকেন। এই একটি হলঘরই তাঁদের বসবার ও খাবার কামরা। ঘরের মাঝামাঝি এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত লম্বা কাঠের রড, তাতে পেতলের আংটা ঝোলানো বড়ো

বড়ো ক্রোটন আঁকা ক্রেপের পরদা। মানুষের মাথা থেকে উঁচু, ফলে একখানা ঘরই পরিষ্কার দুখানা ঘর হয়ে গেছে।

বসবার দিকের সব আসবাব শিলেটি মুলি বাঁশের ও বেতের। একখানা বড়ো পা ছড়ানো আরাম কেদারা, আর খানতিনেক ছোটো, তবে অনারামের নয়। মাঝখানে গোল তেপাই। তাতে একটি ফুলদানে একঝাড় বেগুনি রং-এর মেহেদি ফুলের গোছার ভেতর গুটিচারেক সোনালী মুচুকুন্দ চাঁপা। কি তীব্র গন্ধ ঐ চাঁপার—বাবুর্চি রহমৎ বলে ও গন্ধে মশা পালায়।

তেপাইয়ের তলায় একটা থাক আছে। তাতে দু-তিন দিনের ডাক সংস্করণের বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান ও পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যের "নায়ক"।

নিভাননী যথাসম্ভব কুশন বিস্তার করে বেতের চেয়ারগুলো অধিকতর আরামের করে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে উপুড় করে বসানো একটি চায়ের বড় প্যাক বাক্সো। পুরনো ঢাকাই জামদানির আঁচলা কেটে তার কভার করেছেন নিভাননী। তার ওপর বসানো ইয়া বড়ো চোংওয়ালা ফনোগ্রাফ। ওতে যে সঙ্গীত-মুগ্ধ নিবিষ্ট চিত্ত কানখাড়া করা কুকুরের ছবিটা আছে, ওটা কনখলের বড়ো প্রিয়। চোং-এর ভেতর থেকে যারা গান গেয়ে, কথা বলে যায়, তাদের সম্বন্ধে কনখলের অদম্য কৌতূহল। মা-বাবা থাকেন বলে গানের সময় শুধু উঁকিঝুঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা চলে না। দুপুরে মা ঘুমুলে, বাবা আপিস গেলে ও হাত গলিয়ে দেখেছে, তখন কেউ থাকে না ওখানে।

ঘরের আর এক কোণে ডোয়ারকিনের জাপানী টেবিল বাজা। ভাঁজ করলে একটা তোরঙ্গেই এঁটে যায়। সামনে সাইজমাফিক বাঁশ ও বেতের উঁচু মোড়া। বাবা ঐটেতে বসে দুহাত চালিয়ে বাজান, গানও করেন। সময় সময় কনখলের ডাক পড়ে এক সাথে গলা মিশিয়ে গান করবার। কনখল মোটে ঘাবড়ায় না, সমানে বাবার সাথে গলা মিশিয়ে গান করে,

'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'

নিভাননী হেসে ফেটে পড়েন। কনখল বোঝে সেই-ই হাসির খোরাক জুগিয়েছে। বোধ হয় গলা মেলেনি, না হয় এ বেসুর হয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন,

—বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে,—আচ্ছা আবার—

বাইরের দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকতেই দুপাশে দুটো দাঁড়। একটা টুপি, ছড়ি, বর্ষাতির, আর একটা বন্দুকের। ষোলো আর বারো বোরের দুটো দোনলা বন্দুক। টিপের বেড়ের মধ্যে সরু শিকল দিয়ে দাঁড়ের সাথে তালা মারা।

কনখলের জাগ্রত কৌতূহল ওই বন্দুক দুটি ঘিরে। ওর নলে কি রহস্য আছে, ও ভাবে। বাবা যে কি করে আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখী মাটিতে নামিয়ে আনেন, একটু আঙুলের চাপ, গুড়ুম আওয়াজ, আর নল দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া বার করে, এ ওর চির বিস্ময়।

খানা কামরায় ডাক পড়তে দেরী আছে। খাবার তৈরী হবার পর টেবিলে সাজানো হলে বুড়ো রহমৎ ছোট্ট একটা টেবিল ঘন্টি টুং করে বাজিয়ে দেবে তখন বাবা-মা উঠবেন। এখন বসবার ঘরে বিশ্রাম, গল্পগুজব, এই সব।

কনখল এখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। এইবার হবার কথা হচ্ছে। কিন্তু বাংলা আর সহজ ইংরেজি পড়বার মতো বিদ্যা মা-বাবার কাছে পেয়েছে। ওর অনেক বই। রঙীন ছবিওয়ালা বাইবেলের নানান গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি, ছোট্ট রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, এগুলো বারবার পড়েও পুরনো হয় না।

থামের ওপর ঘর, তাতে ডেলিলা আছে। অন্ধ স্যামসন তার সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে সেই থাম ভেঙে ফেলছে, মরবে সবাই, জেনেও। স্যামসনের গায়ের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অথচ মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। কনখল অনেকক্ষণ ধরে দেখে, আর ভাবে গায়ে কত জোর থাকলে অমনি

করে একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়। ডেলিলা ভালো মেয়ে নয়, তার জন্যেই স্যামসনের সব কষ্ট।

ঠাকুরমার ঝুলির 'হটর হটর পবনের না, মণিমালার দেশে যা' ছবিটাও ওর প্রিয়। আর ছেলেদের মহাভারতের ঘটোৎকচ বধের ছবিটা, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আঁকা। তবে ওর সব চেয়ে প্রিয় ছবি হোলো মার বড় রামায়ণের 'শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন'।

বাংলা বই, বড়োদেরই হোক, আর ছোটোদেরই হোক বুঝুক, আর না বুঝুক, ও পড়ে যায়। খানকতো বই আছে বারবার পড়েও আগ্রহ মেটে না ওর। বিষাদসিন্ধু, কঙ্কাবতী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ইন্দিরা। বিষাদসিন্ধু পড়ে কেঁদেছে, কঙ্কাবতী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে, ইন্দিরা পড়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে। 'ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, বাঁশতলাতে জল,—আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল্'! নিজের অগোচরে এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছে, যে কথা দিয়েও ছবি আঁকা যায়।

এসব ছাড়া, এক পাদরী সাহেব সেদিন মথি লিখিত আর লুক লিখিত সুসমাচার দিয়ে গিয়েছিল। আদ্যন্ত পড়তে ও ছাড়েনি, কিন্তু ভালো লাগেনি। আড়ষ্ট ভাষা, মনে দাগ কাটে না।

মা একখানা মাসিক পত্র নেন, "প্রবাসী"। কনখলের নিজের নামেও একখানা মাসিক পত্র আসে, "সখা ও সাথী"। "প্রবাসী"তে বড় বড় মেয়েদের ছবি ছাপা হয়, দেখে, ঠিক ভালো লাগা নয়, ভালো লাগার শিহরণের মতো একটা অনুভূতি ওর মনে জাগে কেন, তা সে বলতে পারে না।

"সখা ও সাথী" পড়ে আনন্দ পায় কনখল। লিভিংস্টোনের জীবনকাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়। ফনোগ্রাফের প্যাকবাক্সের এক পাশে হাসিরাশি, জীবজন্তু, টমকাকার কুটীর আর মণিপুরের টীকেন্দ্রজিতের কাহিনী, এই সব বই রাখা আছে। ওগুলো ওর পড়া হয়ে গেছে।

মা বাবা গল্প করছেন। কনখলের কান খাড়া থাকে, বাবা কি বলছেন শোনবার জন্য। বাবা যখন হাত নেড়ে গল্প করেন, কনখল

নিবিষ্ট মনে দেখে। মাঝখানে হঠাৎ উঠে গিয়ে শোবার ঘরের বড়ো আয়নার সামনে অমনি করে হাত নাড়ে। হাত নাড়া শেষ করেই ওপরের ঠোঁটে হাত বুলোয়। যে গোঁফ এখনো ওঠেনি, তাতেই চাড়া দেয়। দিয়ে একটু মৃদু হাসে।

ফিরে এসে দেখে বাবা পায়চারী করছেন। মার মুখে মধুর তৃপ্তির হাসি। মা হালের সংখ্যা "প্রবাসী" খুলে বসে আছেন, পড়ছেন না। ঠিক গান নয়, কিন্তু গানের থেকেও মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কারে বাবা বলে চলেছেন—

'আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিণিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।'

ওটা শেষ হতে আবার শুরু করেন—

'চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের ;
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখো কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সবশেষ,
মিলনের রসাবেশ-অনন্তভবন ;
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে নূতন ভবন !
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে ॥'

কনখলের মন ঠিক ঠিক মানে না বুঝলেও খামখাই উদাস হয়ে যায়। বাইরের অবিশ্রান্ত জল পড়ার সাথে ঘরের ভেতরের অনুরণন মিশে তার মনের মধ্যে আর একটা জগৎ ধীরে ধীরে রূপ

নেয়। মথি লিখিত সুসমাচার মুখের সামনে খুলে সে চোখের জল লুকোয়।

এমনি করে কনখলের বুকে সুর লাগে। সুন্দর কথার, সুন্দরতর ব্যঞ্জনার ছবি আঁকা হয়ে যায় স্বপ্নাবিল আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘিরে।

এই মোহময় পরিবেশ হঠাৎ ভেঙে খান খান হয়ে যায় বাহিরে অনেক লোকের সম্মিলিত কোলাহলে। আর কাচের সার্শীতে ঘন ঘন করাঘাতে। বাবা, মা, কনখল সবাই চমকে ওঠেন।

বড়ো দরজার সমস্তটা কাচজুড়ে একটি মানুষ, কোনো রকমে দুহাত দিয়ে দরজা ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাচ্ছে। মাথায় বাব্‌রি চুল কাদায় জটা হয়ে গিয়েছে, মুখভরা দাঁড়িভরা কাদা, বিরাট বুক, সবল মাংসপেশী, হাতীর শুঁড়ের মতো দুটো হাত, আর কিছু দেখা যায় না। নাক মুখ যেখানে কাঁচের সঙ্গে ঘেঁষে চেপ্টে গেছে, সে জায়গাগুলো হলদে দেখাচ্ছে। যেন একটা রূপকথার দৈত্য এসে আছড়ে পড়েছে মৃত্যুবাণ খেয়ে, মনে হোলো কনখলের। সব্বার আগে ওর নজর পড়ল দৈত্যের চোখ দুটোর ওপর। কী অসহায়, কী করুণ, কী হতাশ চাউনী! বলিষ্ঠ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘিরে সে কী আর্তি!

মা উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুহাতে মার কোমর জড়িয়ে ধরে কনখল বিস্ফারিত চোখে দৈত্যকে দেখতে লাগল। এই কি, এই কি—স্যামসন?

দৈত্যের সঙ্গে, পেছনে বহুলোক। বাবা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দৈত্য ধড়াস্‌ করে পাপোশের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কনখল জানলো, দৈত্যের নাম গফুর। মেকুলা গ্রামের চাষী। পরীর মতো বিবি পরীবানু। পরীবানুকে সাথে নিয়ে ঘরে যিনি এসে ঢুক্‌লেন, তিনি হাজী ওবেদুল্লা। শাহ্‌জলালের দর্গার ইমাম। বাবা ইমাম সাহেবের হাত ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। পরীবানু পাশে মাটিতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাইরে পাঁচ-সাত জন লোক একজন ভদ্রবেশী জোয়ানকে ঘিরে

দাঁড়িয়ে, ইমাম সাহেব ইশারায় তাদের বারান্দায় দাঁড়াতে বললেন।

জানা গেল, ঐ জোয়ানের নাম কাশেম। মেক্‌লা গ্রামের বর্ধিষ্ণু জোতদার। গফুর তারই প্রজা। বিয়ের পর থেকে পরীর ওপর নজর পড়ে কাশেমের। পরী আমল দেয় না আদপেই। ফুস্‌লানো, দূতী পাঠানো, ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, আজ মওকা মিলেছিল। বাড়ির হাতায় ছটো ডালিমগাছ পুঁতবে বলে কাশেম গফুরকে ডেকে এনে গর্ত খোঁড়ার কাজে বহাল করেছিল। সন্ধে নাগাদ গর্ত মানুষ সই হয়ে যাবার পর, গফুর যেমন গর্ত থেকে ওপরে উঠবে ঠিক করেছে, অম্‌নি কাশেমের অনুচরেরা জনকয়েক ছখানা বাঁশ দিয়ে গফুরের ছকাঁধ চেপে দাবিয়ে ধরে রেখেছিল, আর অন্য কয়েকজনা মাটি ফেলে গর্ত ভরাট কর্তে শুরু করেছিল। গফুরের আর্তনাদ কাশেমের অনুচরদের হৈ হল্লায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পরীকে এই ফাঁকেই কাশেম ধরে নিয়ে এসে বন্দিনী করেছিল, কিন্তু পরী কাঁচাবাঁশের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বিশেষ বেগ পায়নি। সে সোজা গিয়ে ইমাম সাহেবের পায়ে পড়ে সব খুলে বলেছিল। মেক্‌লা থেকে শাহ্‌জলালের দরগা সামন্যই দূর। ইমাম সাহেব লোকজন নিয়ে এসে গফুরকে একটু আগেই উদ্ধার করেছেন।

হৃষীকেশ এতক্ষণে বুঝলেন সফর থেকে ফেরবার পথে সন্ধ্যার সময় কিসের গোলমাল শুনেছিলেন।

কনখল জানে বাবা ইমাম সাহেবকে ভক্তি করেন। ইমাম সাহেবও বাবাকে, আর তাদের সবাইকে ভালোবাসেন। হৃষীকেশ নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

—কনাকে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে বোসো। আর রহমৎকে বলো, ডাক্তার জাফরকে ডেকে দিতে।

কিন্তু খাবার ঘর বসবার ঘরের মধ্যে শুধু কাপড়ের পরদা। কথা সব শোনা যায়। কনখলের কান রইলো খাড়া।

পাশের পুলিস হাসপাতালের ডাক্তার জাফর সাহেব আসবার পর, ইমাম সাহেব যা বললেন, তার মোটামুটি মানে হোলো যে, পরী যদিও খুব ভালো মেয়ে, তবে আজকের ব্যাপারে সে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বইকি। কাশেম ডাকলে গফুর যেতে চায়নি, ও বেত ও বাঁশের কারিগর, ঘরে বসে তেপাই, চেয়ার বানায়, তার আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যায়। কিন্তু আজ কেবল পরীর তাড়ায় কাশেমের কাজে গিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, ওর ভুল ভাঙতেও দেরী হয়নি। ওই ত গিয়ে সময়মত ইমাম সাহেবকে খবর দিয়েছিল। তা না হলে গফুরকে কি আর জ্যান্ত ফিরে পাওয়া যেত। এখন হাকিম সাহেবের যা মর্জি।

বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে, ঠিক অর্থ কনখল জানে না, তবে আভাসে বোঝে। কিন্তু ঐ পরীর মতো দেখতে পরীবানু, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপদে ফেলার নাম যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে ত পরী তাই করেছে। ডেলিলা যেমন করেছিল স্যামসনকে। আর, আর,—ঐ জাফর ডাক্তারের মেয়ে আয়েষা, সেও ত কনখলের সাথে তাই করেছিল।

মার নিষেধ,—কংখ্, টকফল খাবে না, দুপুর রোদ্দুরে যাবে না, অসুখ করবে। সেদিন দুপুরে মা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ত্রয়োদশী আয়েষা এসে ইশারায় ওকে বাইরে ডাক দিয়ে দিল ওর হাতে দুটি পাকা কামরাঙা। বাবুর্চিখানার পেছনে, যেখানে মুরগীর ঘর, সেইখানে বসে কনখল পরম আনন্দে কামরাঙায় কামড় দিচ্ছিল। এদিকে আয়েষা করেছে কি, শোবার ঘরে মাকে জাগিয়ে, বলেছে যে, কনা লুকিয়ে কামরাঙা খাচ্চে, দেখবে চল মাসি।

ঘুমের চোখ মুছতে মুছতে মা এসে দেখেন, সত্যিই ত। আয়েষা ঘাগরা পরে, ওর ত আঁচল নেই, মার সাড়ির আঁচল মুখে চাপা দিয়ে হাসি আট্‌কাচ্ছে আয়েষা। কী চাপা দুষ্টু হাসি।

নিভাননীকে দেখে কনখল আধখাওয়া কামরাঙা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মা সেদিন ওকে একটি চড় মেরেছিলেন। ওর

লাগেনি। ও শুধু অপলক চোখে আয়েষার দিকে তাকিয়েছিল।

আয়েষা হঠাৎ কেঁদে ভেঙে পড়েছিল। বলেছিল, আমিই ওকে কামরাঙা এনে দিয়েছি মাসিমা, ওকে কিছু বলবেন না, আমাকে মারুন।

নিভাননী আর কারুকে কিছু বলেননি। তুজনার হাত ধরে ঘরে এসে প্রত্যেককে তুখানা করে হণ্টলিপামারের নাইস্ বিস্কুট খেতে দিয়েছিলেন। বিস্কুট খেতে কনখলের খুবই ভালো লাগে, কিন্তু আজ সে বুঝল, যে পরীবানু গফুরের সাথে যা করেছে, সেদিন আয়েষা তার সাথে এর চেয়ে কিছু কম করেনি।

তবু কনখলের চোখে আয়েষা পরীবানুর চেয়েও সুন্দর। কনখল এটুকু বুঝল, যারা সুন্দর, যারা মন কেড়ে নেয়, তারাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

গফুরকে জাফর ডাক্তারের জিম্মা করে দিয়ে, পরীবানুকে ইমাম সাহেবের সাথে সে রাতের মতো দরগায় পাঠিয়ে দিয়ে, এবং তু-চারজন অনুচর সমেত কাশেমকে থানা হাজতে পাঠিয়ে, বাবা অবসর হলেন।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। বুড়ো রহমৎ খানা কামরায় টুং করে টেবিল ঘন্টি বাজিয়ে দিল।

সেই রাত্রে সমস্ত আকাশ ভেঙে পড়ল। শিলেট শহর, চেরাপুঞ্জী থেকে শখানেক মাইলের মধ্যে, পৃথিবীখ্যাত প্রতিবেশীর মান রাখল সে রাত্রে। ব্যাঙের ডাকে, আলেয়ার দপ্‌দপানীতে ত্রিজগৎ উতরোল হয়ে উঠল। কনখলের শোবার ঘর আলাদা, সে রাত্রে নিভাননী কনখলকে বুকের কাছে নিয়ে শুলেন।

সমস্ত রাত ভয়তরাসে বুক নিয়ে মার কোল আঁকড়ে শুয়ে থাকা কনখলের নতুন নয়। এত বিষ্টি, খালি এইটেই নতুন। বছরখানেক আগে প্রথম শিলেট আসবার সময় যখন করিমগঞ্জ থেকে ষ্টীমার করে এসে বড়ো হাওড়ে নৌকোয় চড়া হয়, সে ছিল রাত্তির, অন্ধকার রাত্তির। জল, জল, জল—চারদিকে শুধু জল। পার

নেই। সেই নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে অসীম জলরাশির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কনখলের বুক ভরে উঠেছিল একটা বিরাট ব্যাপ্তির আশীর্বাদে। যে দিগন্তে অতো বড়ো আকাশ আর অতো জল অদৃশ্য আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে, মন উধাও হয়ে গিয়েছিল তারই দিশারায়।

সে রাত্তির পুইয়ে সূর্য উঠেছিল। সমস্ত রাত্রির হতাশা একটু আলোর ছোঁয়ায় বুকভরা আশার আমেজ এনে দিয়েছিল। ওই বয়সেই কনখল বুঝতে শুরু করেছিল, কোনোটাই—ভয়, আশা সুখ, দুঃখ,—স্থায়ী নয়। একটার পারে আর একটা জেগে থাকবেই।

আজকের বিষ্টির রাত যখন শেষ হল তখন ঝকমকে সকাল। বাবা-মা গভীর ঘুমে। আজানের সুরের সাথে শাহ্ জলালের দর্গার মিনার-এর ওপর তাজা নবারুণের আলো পড়ে এক নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। কবুতরের ঝাঁক মাঝখানের বড়ো মিনারটার ওপরে গোল হয়ে উড়ছে, কচি রোদ্দুরে তাদের ডানা, চিকচিক করছে।

তমোনাশিনী উষার এই অভ্যুদয়কে পরমসত্য বলে জানলো কনখল।

২

পুলিস হাসপাতালের টিলার নীচের মাঠে পোলো খেলা হয় প্রায় রোজ সকালেই। মাঠ ত নয় যেন ইরানী গালিচা। প্ল্যাণ্টাররা খরচের তোয়াক্কা করে না। কেবল খুব বিষ্টির রাত্তিরের পর ঘোড়ার খুর নরম মাটিতে বসে যায় বলে সাবধানে সওয়ার হতে হয়। ঘোড়াগুলোও এমন তৈরী যে তারাই যেন খেলোয়াড়, সওয়ারগুলো উপলক্ষ্য মাত্র। মাঠের যেখানেই বল থাক না কেন, সওয়ারকে এমন কায়দায় নিয়ে যাবে যাতে সে সহজেই ডান হাতে ধরা ডাণ্ডা দিয়ে বলটা ঠুকে দিতে পারে।

কনখল নিবিষ্টমনে খেলা দেখে। ওদের কাঞ্চন পোলো পনি নয়, শুধু চড়বার ঘোড়া। সহিস হারুণ যখন জিন কসে কাঞ্চনকে টিলার নীচের বড় রাস্তায় নিয়ে যায় বাবার জন্য, ও অনেকবার সওয়ার হয়েছে। তবে সব বারই হারুণ ঘোড়ার মুখের কাছের লাগাম ধরে নিয়ে গিয়েছে। ও অনেক কাকুতি মিনতি করেছে ছেড়ে দেবার জন্য, কিন্তু হারুণ ছাড়েনি। বলেছে, সাহেব বকবে। ও বলেছে,—কাঞ্চন ভীষণ ভালো ঘোড়া, কখনো আমাকে ফেলে দেবে না। তাছাড়া রোজ পোলো খেলা দেখতে দেখতে আমি শিখে গিয়েছি কি করে সওয়ার হতে হয়, হাঁটুর চাপ, রেকাবে পা, ট্রট গ্যালপের বিশেষ বিশেষ গতিভঙ্গীর সাথে কি করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, সত্যিই দেখে দেখে শিখেছে কনখল। কিন্তু হারুণ নাছোড়বান্দা, সাহেব বকবে, ওর ঐ এক ধুয়া।

সেদিন সকালে যখন হারুণ-সারথী কাঞ্চন সওয়ার হয়ে কনখল টিলার নীচে নামছে, তখন একে একে পোলো খেলোয়াড়রা মাঠে

জমায়ত হচ্ছেন। জন। আষ্টেক প্ল্যান্টার, সিভিল সার্জন সাহেব, রাজপুত রাইফেল্‌স্-এর কর্নেল রণছোড় সিং, স্থানীয় জমীদার মজ্‌মাদার সাহেব সব পৌঁছে গেছেন। কনখল যখন বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল, তখন ডেপুটি কমিশনার হ্যাসেট সাহেব আসছেন।

হ্যাসেট কাঞ্চনকে ঘোড়সওয়ার দেখে খুব খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। বললেন,

—হ্যালো ইয়ং ম্যান, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারো ?

কনখল থতমত খেয়ে, ঘাড় কাত করে জানালো, পারে। গর্বে ফেঁপে উঠলো সে। এর আগে, অনেক সাহেব মেম তাকে ডালিং বয়, কিড, সুইটি বলেছে, ইয়ংম্যান বলে কেউ ডাকেনি।

—দেন কাম অন্‌। টেক্‌ এ হ্যাণ্ড। চলো পোলো খেলবে চলো।

হারুণকে ডেকে সাহেব বললেন,—বাবাকো ইধর বৈঠায় দো বলে নিজের কোলের কাছটা দেখিয়ে দিলেন।

হারুণ কনখলকে কাঞ্চন থেকে তুলে সাহেবের ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। ওপরের বাংলোর বারান্দা থেকে হৃষিকেশ ও নিভাননী এ দৃশ্য দেখছিলেন, আর মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু হ্যাসেট যখন স-কনখল পোলো ময়দানে ঢুকে পড়লেন, তখন নিভাননী সভয়ে বললেন,

—ও কি, সায়েব কি ওকে নিয়ে খেলতে নামবে না কি ?

—নাম্‌লেই বা। হ্যাসেটের কাছে যতক্ষণ আছে ভয়ের কিছু নেই। বললেন হৃষিকেশ। হ্যাসেট ওপরওয়ালা, তাঁর কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না হৃষিকেশ। তাছাড়া, সাহেবের ওপর গভীর আস্থা হৃষিকেশের। সাহেব যা করবে, ভেবেচিন্তেই করবে, এ বিশ্বাস আছে তাঁর।

হ্যাসেট কিন্তু সত্যিই কনখলকে নিয়ে খেলায় নেমে গেল। পোলো যারা খেলেনি, কিংবা মন দিয়ে দেখেনি, তাদের বোঝানো শক্ত, কি ভাবে খেলাটা চলতে থাকে। একদিকে চারজন সাহেব

প্ল্যান্টার, অন্যদিকে হ্যাসেট, সিভিল সার্জন, মজ্মাদার আর রণছোড় সিং। তাক বুঝে গোলের সুযোগ পেয়ে হ্যাসেট লম্বা ডাণ্ডায় কনখলের হাত লাগিয়ে দিয়ে দিলেন গোল করে। যেসব সাহেবরা দর্শক ছিলেন, সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ব্র্যাভো, ইয়ং ম্যান।

খেলার শেষে কনখলের হাত ধরে হ্যাসেট হৃষিকেশের বাংলোয় এসে নিভাননীকে বললেন,—খুব ভয় পেয়েছিলে, না? এখন শিগ্গির চা ত খাওয়াও।

কনখলকে বললেন,—যাও তুমি এখন পড়াশোনা করো গে। বাগ্চি, ন-দশ বছর বয়স থেকে ছেলেদের ঝুঁকি নিতে শেখাবে। আঁচলে ঢেকে রাখলে কি ছেলে মানুষ হয়। তোমার ত খুব ঠাণ্ডা রাইডিং পনি আছে। ওকে রোজ কিছুক্ষণ একা চড়তে দিয়ো। সহিস কাছে কাছে থাকবে। তবে আমি আজ যদ্দুর দেখেছি, ও মোটামুটি রাইডিং-এর কায়দা জানে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আসতে দাও, সেজন্য দু-চার বার আছাড় খেলেও কিছু যায় আসে না।

বাগ্চি বললেন,—আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই সুযোগ দেব। তবে কিনা ওর মা—

হ্যাসেট হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—তাহলে মার ভয় আগে ভাঙতে হবে। নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—কাল থেকে খুব ভোরে তোমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাব। দেখনি, সিভিল সার্জেনের মেম কেমন কায়দা করে বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে বেরোন।

খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। নিভাননী আরক্ত মুখে বললেন,—মাগো, তাই নাকি বাঙালী মেয়ে পারে! ডাক্তার সাহেবের বিবি ত খাস মেম সাহেব।

কনখল বাড়ির ভেতরে যেতেই আয়েষা ওকে ধরেছে। ওর পোলো খেলা, গোল দেওয়া, বাহবা পাওয়া, কিচ্ছু আয়েষার চোখ এড়ায়নি। বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আয়েষা বলে,

—সাহেব ত সাহেব, কনা সাহেব। কি করে তুই ওই গুঁপো ডাকাতটার ঘোড়ায় উঠলি রে কনা? যদি পড়ে যেতিস?

—আমি বুঝি ঘোড়ায় চড়তে জানি না? দেখিসনি হারুণের সাথে রোজ ঘোড়ায় চড়ি?

—সে ত হারুণ ঘোড়ার মুখ ধরে থাকে। ছেড়ে দিলে তুই পারিস চড়তে? ঘোড়া যদি ছোটে?

—আরে আমি ছোটালে তবে ত ছুটবে! অ্যায়েসা কষে লাগাম টেনে রাখব, ঘোড়া ঠিক আমার ইচ্ছেমত চলবে।

আয়েষা ওর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বাড়ির পথ ধরে। বলে,—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব বাহাদুর।

যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকায় আয়েষা। দেখে কনখল একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে আছে। চোখোচোখি হতে কনখল মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেখতে পায় না আয়েষার মুখ কী দুষ্টু হাসিতে ভরে গেছে।

সেদিনকার সেই কামরাঙা খাওয়ার ব্যাপারে কনখলের মন আয়েষার ওপর প্রথমে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মা ওকে মারতে যখন আয়েষা সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিল, তখন কনখলের মন ভিজে গিয়েছিল। আয়েষা ত আর সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তা হলে অমন করে বলতে পারত না। আয়েষা ওর চেয়ে বড়ো, কিন্তু আয়েষা ওর মতো এতো বই পড়েনি। তবু কেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মনে মনে কনখল অনেক কথার ছবি এঁকে যেতে পারে, কিন্তু সে মুখচোরা। মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার নেই। বইয়ে পড়া অনেক বীরদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদের স্বাদ পায় কনখল। সোহ্‌রাব রুস্তমের রুস্তম, সিকন্দর শাহ্-পুরুর পুরু, মহাভারতের অভিমন্যু, মণিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ,—নিজের শোবার ঘরে একা একা এদের চরিত্র, বক্তব্য, কল্পনায় নিজের ওপর আরোপ করে তৃপ্ত হয়। কিন্তু কেন যেন, আয়েষার চোখোচোখি হলে সব গুলিয়ে যায়।

নিভাননীর নিষেধের গণ্ডী সব ভেঙে যায় আয়েষার খঞ্জন চোখের একটু ভ্রূকুঞ্চনে। রোদ্দুরে যেয়ো না, টক ফল খেয়ো না, গাছে চোড়ো না, এসব 'না'কে ভণ্ডুল করে আলেয়ার আলোর মতো আয়েষা ওকে আকর্ষণ করেছে।

সেদিনই দুপুরে, মা বই পড়তে পড়তে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই, পা টিপে টিপে আয়েষা এল। আজ আর বড়ো ঘাগরা নেই ওর পরনে, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, কাঁধে একটা সবুজ গামছা। এসে কনখলকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিসফিস করে বলল,

—কনা ভাই, চল মাছ ধরে আনিগে বড় ডাক্তার সাহেবের তলাও থেকে। ইয়া বড় বড় টাকী মাছে সিঁড়ির ফাটল ভরে গেছে। আর দাঁড়কিনে কতো। সার সার ঘাটের কাছে ঘুর ঘুর করছে। গোসলখানা থেকে একটা গামছা নে, আর খানাকামরা থেকে ফিঙারবোলের একটা কাঁচের বাটি। চল, চল। মাসিমা জাগবার আগেই ফিরে আসব।

সাঁতার জানে না বলে পুকুর জলার ধার কাছ দিয়ে হাঁটা বারণ কনখলের। কিন্তু আয়েষার ডাক। সে অসহায়ভাবে ঘুমন্ত নিভাননীর দিকে তাকিয়ে বলে,

—মা যদি জানতে পারেন?

মা ওঠবার আগেই ফিরব রে গাধা। আর অনেক মাছ নিয়ে এলে মা ত বকবেনই না, হয়ত তারিফ করবেন, বলবেন, আমার কংখ্ ছিলো তাই তাজা মাছ খেয়ে বাঁচলুম।

সাহেবী খানার বদলে মাছ ভাজা, মাছের ঝোল বেশী ভালোবাসেন মা, এ কনখল জানে। কাজেই মন স্থির করতে আর দেরী হয় না। বাটি, গামছা নিয়ে তৈরী হয় সে। পকেটে রজার্স-এর ছুরিটা নিতে ভোলে না। পা টিপে টিপে দুজনে রওনা হয় সিভিল সার্জন-এর টিলার পেছনের পুকুরের দিকে।

পুকুরটা মজুমাদার সাহেব জমিদারদের সম্পত্তি। যখন চালু ছিল, তখন হয়ত ভালোই ছিল, চিহ্ন পাওয়া যায় এককালের

বাঁধানো ঘাটের ভগ্নাবশেষ। এখন ঘাটের সিঁড়ির ধাপিগুলো আধভাঙা, এধারে ওধারে বেতঝাড়ের জঙ্গল। বেতের আগাগুলো বর্ষার আশীর্বাদে লকলক করে বেড়ে উঠেছে, আঁশফলের মতো ছোট ছোট ফলের গুচ্ছে সে জঙ্গল ভরা। ঐ বেতের আগা দিয়ে ছোট্ট ফুলবড়ি দিয়ে মা মাঝে মাঝে বাবুর্চিখানায় গিয়ে সুক্তো রেঁধে আনেন, তিত্‌কুটে বলে কনখল খেতে চায় না, কিন্তু হৃষিকেশ আগ্রহ করে খান। নিভাননীর নিষেধের প্রতিষেধক হিসেবে এক গোছা কচি বেতের আগা নিতে হবে মনস্থ করে কনখল।

বেতফলের প্রাচুর্য দেখে জিভে জল আসে দুজনারই। আয়েষা বলে,—কি পাকা পাকা ফলগুলোরে কনা—চল দু-চার থোক নিয়ে আসি। তা'পর মাছ ধরব।

—কিন্তু বেতঝাড় যে কাঁটায় ভরা। আর তা ছাড়া রহমৎ বলে বেতের ঝোপে সাপ থাকে।

আয়েষা ওর দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে। বলে,—ও, এই আমার বীরপুরুষ! সাহেবের কোলে আরামসে বসে ঘোড়সওয়ার হলেই সব বীরত্ব ফুরিয়ে গেল? দে, ছুরিটা আমায় দে—

বলে সময় দেয় না আয়েষা। ছুরিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সে বনহরিণীর নৃত্যরঙ্গে ছুট দেয় বেতঝাড়ের দিকে। যখন দু-চার থোকা ফল নিয়ে ফিরে আসে কনখল দেখে ওর মোটা ধবধবে পায়ের গোছা ছড়ে গেছে কাঁটার খোঁচায়। দু-এক জায়গায় এক-আধটু রক্তের চীড়ও দেখা যায়।

কনখল কালক্ষেপ করে না। তড়তড় করে সিঁড়ি ভেঙে পুকুর থেকে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে আসে। ঘাটপারে আয়েষা দাঁড়িয়ে। কনখল ধপ করে ওর পায়ের কাছে বসে পা দুটো বুকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে দেয়। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে,

—খুব লাগছে, না রে?

আয়েষার জবাবে চটুলতা নেই, কনখল ঠাওর করে না। ঢোক

টিপে আয়েষা বলে,—একটুও না।

কিন্তু পা ছাড়িয়েও নেয় না। এক হাতে কনখলের মাথার বড়ো বড়ো চুলগুলোর মধ্যে হাত ধুলোয়।

মাথা তুললে কনখল দেখতে পেতো আয়েষার তু চোখে জল, ঠোঁটের কোণে গভীর পরিতৃপ্তির হাসি। সে হাসি বিজয়িনীর।

এই মোহমুগ্ধ ভাব আধ মিনিটও টিকতে দেয় না আয়েষা। হাতের তেলোর পেছন দিয়ে চোখ মুছে কনখলের তুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে,

—ভূত, দেরী হয়ে যাচ্ছে না? মাসিমার ঘুম ভেঙে গেলে কি কাণ্ড হবে মনে কর ত? এই রইল বেতফল, চল, বাটিটা নে, আর দেখ, একটা শক্ত কাঠি-গোছের কিছু নে ত। যে কটা মাছ পারি চটপট ধরে নিয়ে ফিরি চল।

গামছা, বাটি, শুক্‌নো ভাঙা গাছের ডালের কাঠি, এই সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুজনে পা টিপে টিপে জীর্ণ ফাটা পেছল সিঁড়ি ধরে জলের ধারে গিয়ে নামল।

সব জেকালো গভীর জল। বাণপোকাগুলো যেন জল ছুঁচ্চে না, সাঁ সাঁ করে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। সার বেঁধে সত্যিই তিনচোখো দাঁড়কিনে মাছগুলো ঘাট পার দিয়েই আনাগোনা করছে। ওরা হাঁটুজলে নেমে গামছার তুধার তুজনে ধরে দাঁড়কিনে, খল্‌সে, বেলে, ছোটো চিংড়ী, তা মন্দ নয়, পোয়াটাক ধরল। তারপর টাকী ধরবার পালা।

আয়েষা বলল,

কনা, তুই বাটিটা এই সিঁড়ির ফাটলের মুখে—আরে যে দিকটা জলের ভেতর—ওইখানে চাপা দিয়ে ধরে থাক্। টাকী মাছগুলো ঐ ফাটল দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় কিনা। আমি ওপর থেকে যেখানে যেখানে ফাঁক আছে, কাঠির খোঁচা দেব। যেই বলব, তাক করে বাটিটা ওপর মুখ করে তুলে নিবি! আচ্ছা দাঁড়া, দাঁড়া। বাটিতে জল ভরে গেলে সুড়ুৎ করে মাছ পালিয়ে যাবে। আমার গামছাটা

...বুজ। এইটে দিয়ে বাটিটা ঘেরা টোপ করে নে! বাটি থেকে পালালেও গামছায় আটকাবে।

কথামত কনখল বাটি ধরল! আরে সত্যিই ত! খলখল করে একটা মাছ বাটিতে ঢুকে গেছে। তাক করে ঠিক তুলে ফেলেছে কনখল। আয়েষা বলছে, সাবাস কনা ভাই।

পাঁচ-সাতটা মাছ এইভাবে ধরবার পর, আয়েষা বলল,

—কনা ভাই, এইবার বাড়ি যাই চল। ধরা পড়লে মাও বকবে, মাসিমাও বকবে।

—সে কিরে—মার জন্য মাছ ধরছি, লুকোব কেন? মা যদি বলেন, কোথায় পেলি মাছ—তখন ত বলতেই হবে।

—দূর বোকা—সব সময় সব সত্যি কথা মাদের বলতে হয়। বলবি, আমরা পুকুর পাড়ে বসে ছিলাম, রাখাল ছেলেদের দিয়ে ধরিয়েছি।

কনখল গম্ভীর হয়ে গেল। মোটা ধরা গলায় বলল,—সে আমি পারব না। জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলব না, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে মিছে কথা বলতে পারব না।

—জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলব না—এই ত আয়েষার অর্ধেক জগৎ জয় সে কনখলের হাত ধরে বলল,

—চল চল—আর দেরি করিস নে।

তারপর দুজনের পা টিপে টিপে গৃহপ্রবেশ, রহমতের হাতে বাবুর্চি-খানায় মৎস্য সমর্পণ,—সত্যি সত্যিই এমন কপাল, যে গুরুজনদের কারো চোখেও পড়ল না। খুব বড়ো বড়ো হরপে ছাপা শিরীন ফরহাদ বলে একটা কেতাব আয়েষা ওকে পড়তে দিয়েছিল। সেইটে নিয়ে কনখল বারান্দায় বসে পড়তে শুরু করল।

একটু পরে নিভাননী এলেন। হৃষিকেশের অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়েছে। কনখলকে পাঠরত দেখে মৃদু হেসে বললেন,

—আজ যে কংখ্ বড়ো-লক্ষ্মী ছেলে। খুব পড়াশুনায় ব্যস্ত।

বলে, মোড়া টেনে কনখলের পাশে গিয়ে বসলেন।

কনখলের মুখ জুড়ে কী শুকনো, ক্লিষ্ট হাসি, নিভাননীর চোখে পড়ল না। কি যেন বলি বলি করেও কনখল বলতে পারল না। একজোড়া মোটা ধবধবে পায়ের গোছা তার বুক জুড়ে রয়েছে, সত্যি কথা বুক থেকে ঠেলে ঠোঁট পর্যন্ত আসতে দিচ্ছে না।

রাত্তিরে খাবার সময় হৃষিকেশ বললেন,

—ফার্স্ট ক্লাস তাজা মাছ ত। এমন মাছের ভর্তা অনেকদিন খাইনি।

নিভাননী বললেন,

—ওসব রহমতের কাণ্ড। কোত্থেকে খল্‌সে বেলে দাঁড়কিনে টাকী, সবই পুকুরের তাজা মাছ, জোগাড় করে এনেছে। আর রেঁধেছেও অপূর্ব।

যে দু-এক গ্রাস কনখলের পেটে গিয়েছিল, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল কান্নার ধমকে। সে চেয়ার থেকে নেমে কান্না চাপতে চাপতে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল।

হৃষিকেশ বললেন,—কনার হোলো কি?

—দেখে আসি, বলে নিভাননী উঠে গেলেন।

কনখল তখন বালিশ বুকে দিয়ে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। নিভাননী ওর মাথা কোলে নিয়ে বসলেন। বললেন,

—কি হয়েছে কংখ্? শরীর খারাপ লাগছে?

কনখল প্রথমে জবাব দিল না। তারপর মার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাছধরার ইতিহাস সব খুলে বলল।

নিভাননী আদর করে ওর চোখ মুছিয়ে বললেন,

—এসে আমায় সব বললেই ত পারতিস। আমার কংখ্ মিছে কথা বলবে না, সে ত আমি জানি। কিন্তু যদি পা পিছলে জলে পড়ে যেতিস্?

আয়েষা ছিল যে। ও ত হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে পারে। তাছাড়া আমরা সিঁড়ি থেকে জলে মোটে নামিইনি। ধার থেকেই যা পারি তাই ধরেছি।

—আচ্ছা বেশ করেছ। এখন খাবে চলো।

বলে নিভাননী কনখলের হাত ধরে খানা কামরায় ফিরে এলেন। হৃষিকেশ বললেন,

—হয়েছিল কি কনার?

—কি আবার হবে! শরীর হঠাৎ একটু খারাপ লাগছিল, তাই! আচ্ছা রহমৎ, মাছের তরকারী সবটাই কি আমাদের জন্যে রেখেচ? আয়েষাদিদিদের বাসায় দাওনি?

—না মেমসাব,—রহমৎ বলে।

—যাও, এখুনি অর্ধেকটা ও বাড়ি দিয়ে এস। ওঁদের খানা শেষ হয়নি ত?

—ডাক্তার সাহেবের বাসায় রাত সাড়ে নটার আগে কেউ খেতেই বসে না, মেমসাব।

—তবে ঠিক আছে। যাও দিয়ে এস।

হৃষিকেশ বলেন,

—ব্যাপার কি? এমন কিছু রাজকীয় খাদ্য নয়, যে এবাড়ি ওবাড়ি পাঠাচ্চ—

নিভাননী মৃদু হেসে বললেন,

—সবই তোমার জানা চাই। তবে শোনো! মাছগুলো আয়েষার ধরা। দুপুরে গামছা দিয়ে সিভিল সার্জনের পুকুর থেকে ধরেছে। কনাকে ভালোবাসে বলে সব দিয়ে গিয়েছিল বাবুর্চি-খানায়। আগে জানলে আয়েষাকে রাত্তিরে খেতেই ডাকতাম।

কনখল বড়ো বড়ো চোখ তুলে ঠায় মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বর্গের দেবীর মতো মার মুখ, মনে হয় ওর। কী সুন্দর ভাবে, কতো সহজে, সমস্ত ব্যাপারটার সমাধান করে দিলেন। আর এই মায়ের কাছে ও সত্যি লুকোতে গিয়েছিল।

আবার ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে স্বস্তিতে, আর কতকটা আত্মধিক্কারে। মনে মনে পণ করে, মা যা যা বারণ করেছিল, আর সেগুলো সে কখনো করবে না।

প্রতিজ্ঞা করে সে রাত্রের মতো আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরে আসে ওর। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর রাতে কি স্বপ্ন দেখে ওই জানে। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে, না না, কক্‌খনো না—আমি যাব না—তুই যা—

নিভাননী এসে আস্তে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেন ওকে।

৩

প্ল্যাণ্টার-রা নেমন্তন্ন করেছে শিকারের। মারাত্মক মৃগয়া নয়, পক্ষী শিকার। সময়টা শিকারের অনুকূল নয়, তবে খবর পাওয়া গেছে সুনামগঞ্জের রাস্তায় যে বড়ো হাওড় পড়ে, তাতে অনেক নারিয়েলি পড়েছে। হৃষিকেশ যাবেন, আয়েষার বাবা জাফর সাহেবও যাবেন। ছোকরা হারুণ সাথে যাবে। শেষ রাতে হ্যাসেট সাহেব টমটম নিয়ে আসবেন। বাংলোয় তোড়জোড় চলছে। বারো বোরের বন্দুকটা সাফসুফ করে রাখা হয়েছে। জলের মধ্যে শিকার, পোশাক-পরিচ্ছদের বালাই নেই। ডেক্ স্যু, হাফ্ প্যাণ্ট, হাতকাটা কামিজ, ব্যস্, হৃষিকেশের আর কিছু লাগবে না। তবে চচনেন রোদ উঠে যাবে ফিরতে, পিগ্ স্টিকার হ্যাটটা নিতে হবে। ছু থেকে ছ নম্বরের গুটি চল্লিশেক কার্তুজ হারুণের কাঁধের চামড়ার ঝোলায় থাকবে।

খাবার ঘন্টির আগে হলকামরায় বসে এইসব বিলিব্যবস্থা হচ্ছে। জাফর সাহেবের সাথে আয়েষাও হাজির।

বড়রা যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত, আয়েষা আর কনখল দাঁড় থেকে হালকা ষোলো বোরের বন্দুকটা নিয়ে অলীক লক্ষ্যে তাক করতে ব্যস্ত। আয়েষা বন্দুকটা ডান কাঁধে লাগিয়ে নলের মুখ বারান্দার দিকে করে দু পা ফাঁক করে ঘাড় কাৎ করে নিপুণ নিশানার অভিনয় করছে।

বাগচি জাফরের কানে ফিসফিস করে বলেন, veritable Diana.

নিভাননী বলেন, সীতারামের শ্রী।

ওরাই বড়োদের আলোচনার বিষয়, কনখল না বুঝলেও আয়েষা বোঝে। লজ্জায় ওর টুকটুকে গাল রাঙা হয়ে ওঠে। আস্তে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ে রেখে দেয়।

পরদিন শেষরাত্রে শিকার পার্টি রওনা হয়ে যাবার পর নিভাননী ঘুমকাতুরে চোখে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েন। কনখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না টমটম চাঁদমারির টিলার পেছনে অদৃশ্য না হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোড়া টেনে বসে পড়ে। তখন যদিও সূর্যোদয় হয়নি, ওর আর ফিরে বিছানায় যাবার ইচ্ছে হয় না। শাহ্‌জলালের দর্গার অতোগুলো মিনারের মাঝখানের বড়ো গম্বুজটা ক্রমঃপ্রকাশ্যমান প্রত্যূষের আকাশে বিরাট প্রহরীর মতো মাথা জাগায়।

খানিক পরে পেছন থেকে কে ওর দুচোখ চেপে ধরতেই স্পর্শে বোঝে আয়েষা। কি নরম হাতদুটো। আয়েষা ওর গালে গাল ঠেকিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলে,

—কনা ভাই, শিকার করবি?

—ধেৎ, বাবারা ত কখন চলে গেছেন।

—আরে না না,—ওদের দলে না। তোতে আমাতে শিকার করে আসি চল।

—ভারী মজার কথা বললেন। আমাদের বন্দুক কই, হাতিয়ার কই—খালি হাতে ত আর শিকার হয় না। আর কি শিকার করবি?

—শিকার দেখবি? আয়—

বলে কনখলের হাত ধরে আয়েষা এগোয়। বাবুর্চিখানার পশ্চিমে একটা শিমুল গাছ—সেই দিকে আঙুল দিয়ে আয়েষা দেখায়।

পায়রার মতো এক ঝাঁক পাখী গাছটায় বসেছে। গলার কাছটায় সবুজে হলুদে মেশা রংয়ের প্রলেপ, বাকী গায়ের রং জালালী কবুতরের মতো। ভারী মিষ্টি শিস দিচ্ছে পাখীগুলো।

আয়েষা ওর কানে কানে বলে,

—হরিয়াল। খুব ভালো পাখীরে—সাহেবরা যে নারিয়েলি হাঁস মারতে গেছে তার চেয়ে অনেক ভালো।

শিকারের প্রস্তাবে কনখল উল্লসিত। একটু ভেবে মাথা চুলকে বলে,—কিন্তু কি দিয়ে মারব?

আয়েষা আর একবার ওর হাত ধরে হলকামরায় নিয়ে আসে। বন্দুকের দাঁড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। ষোলো বোরের বন্দুকটা দাঁড় করানো আছে, কিন্তু টিপের মধ্যে শেকল দিয়ে তালা দিতে ভুলেছেন নিভাননী। আয়েষা বলে,—মাসিমার ঘর থেকে এই দ্যাখ্ চারটে টোটা এনেছি। চল।

বন্দুকে হাত দেয়া না দেয়ার সম্বন্ধে বিশেষ করে কোনো নিষেধ করেননি নিভাননী। সাধারণ বিধিনিষেধের বাইরে বলেই করেননি। কিন্তু কনখলের মন বলে, এতেও নিভাননীর নিষেধ আছেই। সে আয়েষার দিকে তাকায়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না।

আয়েষার আয়ত চোখের মণি যেন গভীর পুকুরের জল। কোথায় তার তল, হদিস পায় না কনখল। আয়েষার ডাক যেন নিশির ডাক। কী প্রলোভন, কী সম্মোহন—অমান্য করে সাধ্য কি কনখলের। চমকে গা ঝাড়া দিয়ে বলে,—চল।

নবোদিত সূর্য তখন বড়ো গম্বুজের চূড়ায়, বড়ো বড়ো গাছের মাথায় সোনা ঢালতে শুরু করেছে।

সুপঠিত বাইবেলের আদম-ইভের গল্প মনেও আসে না কনখলের।

দুজনে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে শিমুল তলায় যায়। বন্দুক আয়েষার হাতে। গাছতলায় কনখলকে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দেয় আয়েষা। ঘাড় তুলে গাছের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করে। হরিয়ালগুলো ভিড় করে বসে আছে, দু-একটা পাখী ডানা ঝাপটে এ ডাল থেকে ও ডালে যাচ্ছে, বাকীগুলো স্থির হয়ে বসে শিস দিচ্ছে।

আয়েষাও হাঁটু পেতে কনখলের পিছনে বসে ওর ডান বগলে টোটাভরা বন্দুক তুলে দেয়। ডান নলের ঘোড়া নামিয়ে বাৎলে দেয় বন্দুক আকাশমুখী করতে। বলে দেয় যে নলের গোড়ার দিকের খাঁচ কাটার সাথে নলের মুখের মাছি আর পাখীগুলোর অন্তত চার-পাঁচটা যখন এক লাইনে হবে, তখন ঘোড়া টিপতে। কিন্তু হাত যেন না কাঁপে। ওকি, বন্দুকের কুঁদো বগলদাবা কেন? না না, ওটা কাঁধের সাথে ঠেক্ দিয়ে নিতে হবে। বাঁ চোখ বুজতে হবে, ডাক চোখ খোলা থাকবে।

তামিল মাফিক কনখল আয়েষা যা বলে তাই করে। আয়েষা জিজ্ঞেস করে,

—ঠিক্?

—হুঁ।

—টেপ, ঘোড়া টেপ এইবার।

গুড়ুম। "শান্ত উষার নিঃস্তব্ধতা ভেঙে আওয়াজ টিলায় টিলায় আছড়ে বেড়ায়—গুড়ুম্—গুম্—উম্--

বন্দুকের পিছলাথিতে কনখল পেছনে উলটে পড়তেই আয়েষা হুহাতে ওকে জড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। বন্দুকের নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরচ্চে। বন্দুকটা ওর কাছ থেকে নিয়ে, ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,

—বড্ড লেগেছে, না রে?

এক ফায়ারে চারটে পাখী পড়েছে। তিনটে মরে গেছে একটার বোধ হয় ডানায় লেগেছে, গাছতলায় থুপথুপ করে লাফাচ্ছে আর ক্ষুদে ক্ষুদে লাল চোখ দুটো পিটপিট করছে।

পাখীর দিকে তাকিয়ে কনখল বলে,

—কিছু লাগেনি।

বাবুর্চিখানা থেকে রহমৎ দৌড়ে আসে। শিকার দেখে হাত তালি দেয়। ছুরি এনে মরা তাজা চারটে পাখীই হালাল করে নেয়। বলে,

—সাবাস কনাবাবা, সাবাস্।

নিভাননী, আয়েষার মা, তাঁরাও আওয়াজ শুনে সরেজমিনে আসেন। বুড়ো রহমৎ দাড়ি ঝাড়া দিয়ে, ফোক্লা দাঁতে একগাল হেসে বলে,

—হুজুরাইন—কনাবাবার হাতের তারিফ্। এক ফায়ারে চারটে। ভারী খেলোয়াড় হবে বড় হলে।

কনখলকে নিয়ে নিভাননী আয়েষার টানাপোড়েনের আভাস আয়েষার অবচেতনে পৌঁছে গেছে। আয়েষা নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়, তারপর রহমতের দিকে ফিরে বলে,

—চাচা, বুড়ো হয়ে কি ভীমরতি হচ্ছে তোমার? মারলাম আমি তারিফ হোলো কনাবাবার!

আয়েষার দৃপ্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রহমৎ মাথা চুলকোয়। বলে,

—আয়েষা মাই এত বড়ো শিকার খেল্‌নেওয়ালী, কি করে জানব হুজ্‌রাইন। তাজ্জব, বড়া তাজ্জব—

নিভাননীর মুখ প্রসন্ন হয়। কাল রাত্রে ওই বন্দুক নিয়ে তাক্ করার কথা মনে পড়ে।

—'সীতারামের শ্রী'

জাফর সাহেবের স্ত্রী কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন,

—সর্বনাশী—কবে যে তুই নিজে মরবি, আর কাকে মারবি, ভেবে পাই না আমি। আসুক সাহেব ফিরে, তোর ব্যবস্থা করছি।

নিভাননী আয়েষার মাকে আড়ালে নিয়ে যান। বলতে বলতে যান, যেন কিছু না বলা হয় কর্তাদের। শাসন যা করবার তাঁরা নিজেরাই ত করতে পারেন। রহমৎকে বলেন, দুটো পাখী ডাক্তার সাহেবের বাবুর্চিখানায় দিয়ে আসেত। এক হাতে কনখলের, অন্য হাতে আয়েষার হাত ধরে নিয়ে যান নিজের বাংলোয়। কনখল থরথর করে কাঁপছে। নিভাননী ভাবেন, দুটিতে মিলে

লুকিয়ে এসে বন্দুক ছোঁড়ার উত্তেজনা।

দাঁড়ে বন্দুক রাখবার আগে রহমৎকে ডেকে বলেন নল সাফ করে দিতে। এখুনি। তারপর আয়েষার দিকে ফিরে বলেন,

—টোটা পেলি কোথায়?

—দেরাজ খোলা ছিল। তুলে নিয়েছি। বলে তিনটে তাজা কার্তুজ ফেরত দেয়।

নিভাননী ওদের খাবার ঘরে বসিয়ে, গোসলখানা থেকে ফিরে আসেন। বলেন,

—সকালে কিছু খেয়েছিলি?

দুজনেই ঘাড় নেড়ে বলে, না।

রহমৎ বন্দুক পরিষ্কার করে এনে দিলে নিভাননী শেকল দিয়ে দাঁড়ের সাথে তালা মেরে দেন। কার্তুজ তিনটে দেরাজে পুরে দেরাজ চাবি বন্ধ করেন। করে, ওদের দুজনের মাঝখানে খাবার টেবিলে এসে বসেন।

নিভাননীর বয়েস প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ। ত্রয়োদশী আয়েষার দিকে তাকিয়ে কেন যেন হিংসে হয় তাঁর। কনখলের কামরাঙা খাওয়া, মাছ ধরার কথা মনে পড়ে। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আয়েষার চোখে চোখ রেখে বলেন,—সত্যি কথা বল্ এইবার। কে ছুঁড়েছে বন্দুক?

আয়েষা কিছু বলবার আগেই কনখল এক লাফে উঠে এসে মায়ের কোলে মুখ গোঁজে। ধরা গলায় বলে,—আমি।

আয়েষা বলে,—ও শুধু ঘোড়া টিপেছে। টোটা নিয়েছি আমি, বন্দুক নিয়েছি আমি, পাখীর খবর এনেছি আমি, নিশানা করেছি আমি—

নিভাননী বলেন,—থাম্ থাম্। সব দুষ্টুমী তোরা দুজনে মিলেই করিস্, জানি আমি। কিন্তু যেগুলো বড়রা বারণ করেন, সে কাজ করতে নেই, এ বোঝবার বয়েস তোদের দুজনেরই হয়েছে। হয়নি?

মাথা নীচু করে থাকে দুই অপরাধী। জবাব দেয় না।

নিভাননী বলে চলেন,—বাবা এলে এবার কংখ্‌কে স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তোকে ত স্কুলে দেবেন না তোর মা-বাবা, পাদ্‌রীদের মিস্‌ রোজ মেরী ডক্টর নাগের মেয়েদের পড়াতেন, তাঁকে ঠিক্‌ করতে বলব তোর বাবা ফিরে এলে। মন দিয়ে করবার মতো কাজের সন্ধান না পেলে জংলী হয়ে যাবি তোরা। কেমন, রাজী ত?

দুজনেই ঘাড় নাড়ে। রাজী।

নিভাননী উঠে এসে আয়েষাকে ধরে নিজের সামনে দাঁড় করান। তারপর বুকে টেনে নিয়ে মাথার চুলের ঘ্রাণ নেন। আয়েষাকে ছেড়ে কনখলের দুগালে দুটো টোকা দেন। বলেন,— খেয়ে নে এখন। খাবার পর বারান্দায় আসবি। আমি সেইখানে থাকব।

উনি চা খেয়ে উঠে যেতে ওরা দুজনে এ ওর দিকে চেয়ে হাসে। বড়ো ম্লান সে হাসি। কারুরই মুখে একটা কথা সরে না, নীরবে ডিম, রুটি, দুধ খেয়ে যেতে থাকে।

বারান্দায় বসে বসে বেলা বারোটা পেরিয়ে যায়, হৃষিকেশ ও জাফরের পাত্তা নেই। মা আয়েষা কনখলকে চান শেষ করে আসতে বলেন। আয়েষাকে বলেন দুপুরে এখানে খেতে।

—সাহেবেরা যখনি ফিরুন, আমি থাকব বসে। তোরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিবি।

খানাকামরার পর্দার আড়াল থেকে রহমৎ বললে,—জী মেম্‌সাব। সব তৈয়ার।

বেলা দেড়টা নাগাত হ্যাসেটের টমটম চাঁদমারির টিলার মোড়ে দেখা দেয়। আয়েষা কনখল দুড়দাড় করে নিজেদের টিলা থেকে নেবে বড় রাস্তায় দাঁড়ায়। বাঁদিকের পাদানে হারুণ বসে। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে, বন্দুক দুটো, আর দড়ি গাঁথা কম পক্ষে ত্রিশ-বত্রিশটা পাখী নামায়। হ্যাসেট নিজেই টমটম চালাচ্ছিলেন, বাগ্‌চি জাফর নামতে, টমটম ছেড়ে দিলেন। বলতে বলতে

গেলেন,—বাই বাই। হ্যাল্লো, ইয়ংম্যান—হ্যাল্লো ডার্লিং—

শিকারের পরিমাণ দেখে আয়েষা কনখলের চক্ষুস্থির। ও বাবা, এত। তা আবার আট-দশটা পাখী একেবারে জ্যান্ত। সব আবার এক পাখীও নয়। ছোট নারিয়েলি হাঁস ত আছেই, দুটো বেশ বড়ো মোটাসোটা পাখী। অনেকটা তিত্তিরের মতো দেখতে। জাফর সাহেব বলেন,—ওগুলো কোড়া। মুরগী জাতের পাখী, জলে ডুব দিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর এক আধবার মাথা জাগান দেয়। মারা ভারী শক্ত।

দলবেঁধে সবাই টিলায় উঠতে, রহমৎ এসে জিম্মাদার হয়। বাগচি সাহেব বলে দেন, সমান করে দুবাড়িতে পাখী ভাগ করে দিতে। বলে, বাংলোয় গিয়ে ওঠেন। জাফর, আয়েষার হাত ধরে নিজের হাতায় চলে যান।

খাবার টেবিলে বসে হৃষিকেশ হৃষ্টচিত্তে বলেন,—আরে একি, পিজন পাই!

বলে পাইয়ের পাত্রের ওপরকার ময়দার আস্তর ভেঙে এক চামচ মাংস প্লেটে তুলে নেন। রসুইকার রহমৎ, খেতে যে অপূর্ব হয়েছে, তা বলে দিতে হয় না। হৃষিকেশ পাত্রটি নিঃশেষ করে বলেন,—

পায়রা পেলে কোথায়? বাজার থেকে আনলে বুঝি?

—পায়রা নয় গো, পায়রা নয়। তবে পিজন বটে, গ্রীন পিজন।

বলে আনুপূর্বিক সকাল বেলার কিরাতযূথের কীর্তিকলাপের বর্ণনা দেন নিভাননী। তারপরেই বলেন,—তুমি বকাবকি কোরো না। শাপে বর হয়েছে। ওরা দুটিতেই পড়াশুনায় মন দিতে রাজি। একটা ভালো দিন দেখে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। আর জাফর ডাক্তারকে বলো, মিস্ রোজ মেরীর সন্ধান করতে। কি যে ওদের মৎলব, অমন মেয়েকে স্কুলে দেবে না, লেখাপড়া শেখাবে না। আমায় দিয়ে দেয় ত আমি মানুষ করি। লাখে একটাও মেলে না আয়েষার মতো মেয়ে।

হৃষিকেশ কামরাঙা খাওয়ার অধ্যায়টা জানতেন না। কিন্তু মাছ ধরা আর আজ সকালের শিকার-কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। বাঁ হাতে ঘাড় কাত করে গোঁপের ডগায় হাত বুলোন। তারপর নিভাননীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসেন। আস্তে বলেন—কনাকে একেবারেই হারাবে তাহলে।

৪

আপিস থেকে ফিরতে সাধারণত হৃষিকেশের চারটে-সাড়ে চারটে হয়। সেদিন নিভাননী গোটা তিনেকের সময় উঠে এক পেয়ালা চা খেয়ে বারান্দায় ডেকচেয়ারে এসে বসেছিলেন। পায়ের কাছে একদিকে কনখল তেঁতুলের বীচি সাজিয়ে এক থেকে একশো করছে, ভেঙেচুরে যোগ করছে, বিয়োগ করছে। এ খেলাটা ও শিখেছিল শিলেট আসবার আগে ঢাকায়, খেলাটা ওর খুব ভালো লাগে। সাতাশিটা বীচি থেকে তেরোটা সরিয়ে নিলে যে চুয়াত্তরটা থাকে, ও না গুনেই বলে দিতে পারে। মার পায়ের আর এক পাশে উবু হয়ে বসে আয়েষা নিবিষ্ট মনে "নারায়ণী" বলে একটা বই পড়ছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা উপন্যাস। নিভাননীর প্রিয় বই। আয়েষা বাংলা ভালোই জানে, ইংরেজিতে কাঁচা।

ওধারটার একটা বেঁটে মোড়ায় বসে রহমৎ অনর্গল বকে যাচ্ছে। বুড়ো মানুষ, কথা কয় বেশী। তা ছাড়া ওর ষাট-একষট্টি বছর বয়েস হোলো, কতো জায়গায় কাজ করেছে, কতো সাহেব-মেমের পরিবারে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছে—গল্পের ওর অফুরন্ত।

ইংরেজদের সাথে যখন সিপাইদের লড়াই হয়, ওর তখন ছ-সাত বছর বয়স। তার খবর কিছু রাখে না ও। তাছাড়া, সে লড়াই হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম মুলুকে, শিলেট পর্যন্ত ধাক্কা পৌঁছয় নি। ও জানে মণিপুরের রাজা কুলচন্দ্রের ছেলে টিকেন্দ্রজিতের গল্প। সাবাস জওয়ান টিকেন্দ্রজিৎ। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল ইংরেজকে। বেইমানের ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হল বেচারার।

এমনি অফুরন্ত বক্‌বকানি চলতে থাকে রহমতের। এই দীর্ঘ

জীবনের ওর অভিজ্ঞতা কম নয়। হাতে জরুরী কাজ থাকে না, নিভাননীরও শুনতে বেশ লাগে!

একটু জিরেন দিয়ে রহমৎ আবার শুরু করে,—এক ছোকরা সাহেবের খানসামা ছিলাম মা। কত জায়গায় আগে পরে খিদ্‌মত করলাম, অমন তেজী সাহেব দেখিনি। বাঙালী সাহেব, কিন্তু খাস্ গোরার থেকেও তিরিক্ষি মেজাজ। বিলেত থেকে পাস্ করে জয়েন্ট হয়ে এলো, থাকত ঐ হ্যাসেটের টিলার পেছনে ছোট বাংলোতে। ঘোড়ায় চড়ার জবর শখ, সওয়ার হয়ে যখন তখন গাঁয়ে গাঁয়ে দেহাতে দেহাতে টহল দিয়ে বেড়াত। কাছারী যেত নামমাত্র, ঘণ্টাখানেকের জন্যে। তখনকার ডিপ্‌টি কমিশনার মারলো সাহেব কিছু বলতে গেলে মুখ বেঁকিয়ে পাইপটা ডান দিক থেকে বাঁদিকে নিত! সিবিলিয়ান সাহেব, কেউ কি ঘাঁটাতে সাহস পেত? কিন্তু কালা চামড়ার সাহেব, প্ল্যাণ্টার ফিরিঙ্গীগুলোর চক্রান্তে প্রায় একঘরে হয়ে থাকতে হোতো। দেশী-বিদেশী কোনো দলেই নিজেকে মানিয়ে উঠতে পারতো না জয়েন্ট সাহেব। বড় কমিশনার সাল-তামামী তদারকে যেদিন এলো, মুশকিল শুরু হোলো সেইদিন। ডগ্‌লাস কাছারীতে গিয়ে দেখল জয়েন্ট সাহেবের এজলাস খালি, সাহেব নেই। মারলোকে ডগলাস জিজ্ঞেস করলো, তোমার জয়েন্ট কোথায়? মারলো লোকটা ধীর, স্থির। বললো, কাছেই একটা মার্ডার কেসের ডাইং ডিক্লেয়ারেসন নিতে পাঠিয়েছি। কমিশনার পাইপটা বুটে ঠুকে ঝেড়ে ফেলে, আবার তাজা তামাক ভরতে ভরতে বলল, ঠিক আছে। কাল ওর দফ্‌তর তদারক হবে। সদরে যেন থাকে। বলে মারলোর টমটম হাকিয়ে প্ল্যাণ্টার ক্লাবে চলে গেল। গোটা চারেকের সময় জয়েন্ট সাহেব ফিরল। ঘোড়ার রেকাব থেকে মাটিতে পা দিতে না দিতে মারলো এসে বললো, কোথায় গিয়েছিলে? ডিভিসনাল কমিশনার উপরওয়ালা—সদরে থাকতে কি কাছারী কামাই করতে হয়। বলে গেছে কাল তোমার কাজ তদারক করবে। ডগ্‌লাসকে গরমেজাজী মনে হোলো।

পরে শুনেছি, গরমেজাজের কারণ ছিলো। কালা আদমী সিভিলিয়ান হয়েছে, চা'কর সাহেবরা বরদাস্ত করতে পারত না। অনেক নালিশ নাকি গিয়েছিল শিলংয়ে লাট ফুলারের দেওয়ান-ই-খাসে। একজন বাঙালী সাহেবদের সাথে সমানে টেক্কা দিয়ে দাপটে চাকরি করছে, এতে মুখে কিছু না বললেও দেশী আমলারা জয়েন্ট সাহেবের ভক্ত ছিল। তারাই মাঝে মাঝে গোপন খবর দিত। জয়েন্ট শুনে মুখ বেঁকিয়ে হাসত। বলত কুত্তালোগোঁকো চিল্লানে দো।

মারলোর কথা শুনে আমার সাহেব ডিপ্‌টি কমিশনারের দিকে তীরের মতো চোখে তাকালো। বলল, আচ্ছা, ঠিক্‌ আছে। সে রাত্তিরে জয়েন্ট বাংলোয় ফিরল না। আরদালী এসে খবর দিতে আমি খানা নিয়ে এজ্‌লাসে গেলাম। যা কিছু সেখানেই বসে খেয়ে সাহেব কাজে ডুবে গেল। ফিরল, সেই শেষ রাতে। পরে শুনেছি, দেড় মাসের রোজনাম্‌চা সাহেব এক রাত্তিরে বসে লিখেছে। পরদিন ঠিক সাড়ে দশটায় কাছারী গিয়েছে। ফিরে এলো দেড়টা তুটোয়। চেহারা দেখে আমি ভড়কে গেলাম, মেম সা'ব! তুচোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে—দাঁতে দাঁত চাপা—নিঃশ্বাসের হল্‌কায় যেন গা পুড়ে যায়। এসেই বলল, পরিষ্কার বাংলায়—যে সাহেব ইংরেজি হিন্দী ছাড়া কোনো বাৎ করেনি,—রহমৎ, আমার বিছানা তোরঙ্গ গুছিয়ে দে। আমি আজই কলকাতা রওনা হব। ঘোড়া বেচ্‌বার ব্যবস্থা নাজিরবাবু করবেন। আস্‌বাব যা আছে, তোর যেটা খুশী রাখ্‌। বাকী নাজিরবাবুর জিম্মা করে দিবি। আমি নোক্‌রী ছেড়ে দিয়েছি। আমার বুক ভেঙে পড়লো মেমসা'ব। সাহেবকে আমি কেন জানি না ভালোবেসে ফেলেছিলাম। পাছে আমি সান্ত্বনার কিছু বলি, ভেবে সাহেব জ্বলে উঠলো! বাজের আওয়াজের মতো গম্ভীর গলায় সাহেব খালি হাঁক্‌লো, রহমৎ! আমি মাথা তুলতে পারলাম না মেমসা'ব। সাহেব গটগট করে বাংলোর ভেতরে চলে গেলো।

খানিক বাদেই, দেখি দলে দলে কাছারীর আমলা-ফয়শালা থেকে শুরু করে টাউনের গণ্যমান্য ভদ্রলোক সব আসছেন। সবায়েরই মুখে দুঃখের ছাপ, আমলাদের কারো কারো চোখে জল। সবায়েরই এক কথা—ঝোঁকের মাথায় যা করেছে, যেন ফিরিয়ে নেয়। যা করবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে করে।

মিনিট পাঁচেক পর চটিজুতো ফটফট করতে করতে সাহেব ফিরে এল। ইয়া তাজ্জব! পরনে ধুতি, গায়ে কামিজ। হাত জোড় করে সবাইকে বারান্দায় গোল কামরায়, বসালো। হুকুম হোলো, সবাইকে মিষ্টি খাওয়ানোর। সহিস ছোঁড়া টাকা নিয়ে ছুট্‌লো দোকানে।

সাহেব বললো, আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। আমি আপনাদের একজন হয়ে আপনাদের সাথে মিশিনি, তা সত্ত্বেও। আমার বিদেশী তবকমোড়া চেহারা আপনাদের ফাঁকি দিতে পারেনি, জেনে আমার মন আজ ক্ষমা ভিক্ষা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। আমায় মাফ্ করুন, কোনো অনুরোধ করবেন না। আমি যা করেছি, হুজুগে মেতে করিনি। অনেকদিন থেকেই বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছিল, ফিরিঙ্গি রাজত্বের আবহাওয়া বিষাক্ত লাগছিল। চাকরি ছেড়ে আজ আমি চলে যাচ্ছি, আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি না। বরং উলটোটা সত্যি। আজ আপনাদের এক-জন হয়ে সবায়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারলাম, এই গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে।

আর কে কি বলবে? সবাই চুপ।

পাত্তা নিয়ে পরে জেনেছিলাম, যে ডগ্‌লাস্, দেড় মাসের ডায়েরী একরাত্রে লেখা, ধরে ফেলে বলেছিল, সব বাঙালী চোর হ্যায়! জয়েন্ট সাহেব ডায়েরীখানা ডগ্‌লাসের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। বলেছিল, সে তোমাদের লালমুখোদের কৃপায়। চোরের রাজা তোমরা, চুরি করে রাজত্ব নিয়েছো, সবাইকে চোর তোমরাই বানাচ্ছো। রইল আমার চাকুরি—এখুনি ইস্তফা দিলাম।

আমি। শিলং-এ কলকাতায় তার করে দিচ্ছি। বলে হতভম্ব ডগ্‌লাসকে এজলাসে ফেলে সোজা বড় ডাকঘর হয়ে ফিরে এসেছে বাংলোয়।

নিভাননী, কনখল আয়েষা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনছিলেন। এইবারে নিভাননী জিজ্ঞেস করলেন,—সাহেবের নামটা কি রহমৎ?

—সুরিন্দর ব্যানার্জি।

নিভাননী জানেন সুরেন ব্যানার্জীর চাকুরি ছাড়ার কারণ এ নয়। কিন্তু ঘটনার সত্যাসত্য বিচারে কি লাভ? রহমতের আন্তরিকতা এ কাহিনীকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে, এইত যথেষ্ট। কিন্তু কনখল উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ও নাম তার জানা। শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ও নাম জপমন্ত্র, তা কেউ প্রকাশ করুক আর না করুক। ভাবুক ছেলে কনখল, ভাবতে বসে।

ওর মনের পটে ছবি ফোটে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলের। বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগে। নবাবপুরের রাস্তা ধরে চৌকি চলেছে, সারের পর সার। একটা চৌকীর কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে।

সে চৌকীতে বিরাট একটি মেয়ের মূর্তি—মাথা যেন আকাশ ছুঁয়েচে। বাঁ কাঁধ থেকে ডান কোমর পর্যন্ত কে বা কারা তলোয়ার চালিয়ে দু ফাঁক করে দিয়েছে। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কনখলের চোখে ভাসে, মূর্তির বুকের ওপর বড় বড় করে লেখা "বঙ্গমাতা"।

দেবীর পায়ের কাছে অনেক লোক, তার মধ্যে জনতিনেকের নাম কনখল ভোলেনি। আবদুল রসুল, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল। এমন কায়দায় এসব মূর্তি গড়া, দেখে রক্তমাংসের মানুষ বলে ভুল হয়। থেকে থেকে ধ্বনি উঠ্‌ছিল "বন্দে মাতরম্"। হাজার হাজার লোক, হিন্দু-মুসলমান একত্র, চৌকীর সাথে সাথে রাস্তা ধরে গান গাইতে গাইতে চলছিল—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

বীরদর্পে চলেছে সবাই, কিন্তু অঝোরে চোখের জল পড়ছে। দেখে কনখলের চোখেও জল এসেছিল। মহরম পরবের তাজিয়ার সাথে যারা 'হায় হাসান, হায় হাসান' ধ্বনি তুলে যায়, তাদেরও এমনি চোখে জল, এমনি দৃপ্ত পদভঙ্গী দেখেছে ও। কিন্তু মিছিলের "বঙ্গমাতা" দেখে খালি মিছিলের লোকদেরই নয়, সমবেত অগণিত দর্শকমণ্ডলীর কারো চোখই শুক্‌নো থাকেনি।

আসল ব্যাপারটা কি, বোঝবার বয়স কনখলের নয়, কিন্তু সেদিন সে মাকে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল,

—এ সব কি, মা?

মা বলেছিলেন,—বঙ্গভঙ্গ হয়েছে কিনা, তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন।

এসব শক্ত কথা কনখল বোঝেনি। বলেছিল,—বঙ্গভঙ্গ কি মা?

—আমাদের এই বাংলাদেশ এক ছিল। বাংলা বলতে কোন দেশ বোঝায়, বল ত?

কনখল মাথা নেড়ে বলে,—তা ত ঠিক্ জানি না।

—যে দেশে আমরা জন্মেছি, সেই দেশ। যে দেশের সবাই বাংলায় কথা বলে, সেই দেশ। তা সে হোক্ হিন্দু, হোক্ মুসলমান। এখন হয়েছে কি, নির্ঝঞ্ঝাটে রাজত্ব করবার সুবিধের জন্য ইংরেজরা বছর কয়েক আগে বাংলা দেশের পূর্ব দিকটা কেটে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আর পশ্চিম দিকটা বেহার আর উড়িষ্যার সাথে। তুমি যেমন আমার কোলে জন্মেছ বলে আমি তোমার মা, তেমনি আমরা সবাই বাংলা দেশের কোলে জন্মেছি বলে বাংলাদেশ সব বাঙালীরই মা। ঐ যে দেবীমূর্তি চৌকীর ওপর দেখছ, দেখ ওর বুকে লেখা "বঙ্গমাতা", আর পায়ের কাছে হিন্দু-মুসলমান যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা ঐ মায়ের কয়েকজন বীর ছেলে। বাংলামায়ের

গায়ে তরোয়ালের ঘা দেখিয়ে এইটে বোঝানো হয়েছে যে বাংলা কেটে দুভাগ করা হয়েছে। আর ঐ বীর ছেলেরা পণ করেছেন, এ ভাগ থাকতে দেবেন না। বাংলাকে আগের মতো এক করে দিতে হবে।

কনখল বুঝুক আর নাই বুঝুক, গভীর মনোযোগের সঙ্গে মার কথাগুলো শুনেছে। একেবারে বোঝেনি কিছু, তা নয়। বলেছে, —আমিও ত ওদের সঙ্গে যেতে পারি ?

—নিশ্চয় পারো, তবে তুমি এখনো যে বড্ড ছোটো।

সেই দিন নিজের অল্প বয়সের জন্য কনখলের মনে ধিক্কারের ভাব এসেছিল। বছর আষ্টেকের ছেলের পক্ষে যতটুকু সম্ভব।

আত্মগ্লানির আরও কারণ ছিল। এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছিল, যদিও ভাষায় তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওর হয়নি, যে তার বাবা ওই ইংরেজেরই চাকুরে। মাকে বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেদিন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল কনখল। ওর অপরিণত চেতনে সেদিন পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবের ঝড় উঠেছিল বাবা যা করেন, তা কখনো খারাপ হতে পারে না, সাহেবিয়ানাও নয়, ইংরেজদের মতো পোশাক পরাও নয়। আর এত লোক যে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদর্পে দাঁড়িয়েছে, দেশের দুঃখে চোখের জল ফেলছে, এও ত তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জিনিস নয়।

সেদিন থেকে বেশ মন মরা হয়ে রইল কনখল।

কদিন পরে নিভাননীকে জিজ্ঞেস করে কনখল,—আচ্ছা মা, বাবা কি কাজ করেন ?

—বিচারকের। যারা চুরী, ডাকাতি, অন্যায় কাজ করে তাদের বিচার করে শাস্তি দেন।

—সে ত খুব ভাল কাজ, না মা ?

—হ্যাঁ বাবা।

—সে কাজ ত ইংরেজদের কাছে চাকরি না করে করা যায়।

—তা কি যায় ? ইংরেজরা যুদ্ধ করে এদেশ জিতে নিয়ে রাজা

হয়েছে, বিচারের কাজ ত রাজার অধীনে থেকেই করতে হয়।

—তাহলে রাজা যদি অন্যায় করেন, অধীনের লোক ত তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না।

নিভাননী এতক্ষনে বোঝেন ছেলে কেন কদিন থেকে এমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না। বেশী কাছে আসতেও চায় না, দূরে দূরে থাকে। আদর করে টেনে নেন ছেলেকে। বলেন,—কংখ, জানিস সেদিন মিছিলের গান দুটো কার লেখা ? সেই 'বন্দে মাতরম্' আর 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা' ?

কনখল ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

—প্রথমটা বঙ্কিমবাবুর যাঁর গ্রন্থাবলী বাড়িতে আছে। আর একটা ডি. এল রায়ের। ওঁরা দুজনেই তোর বাবা যে কাজ করেন, সেই একই কাজ করতেন। বলবার কায়দা জানলে মনের কথা সব বলা যায় !

কনখলের মনে আশ্বস্তির প্রলেপ পড়ে। ভাবে, বাবাও কায়দায় পেলে অমনি করে বলতে পারে।

একটু একটু করে মনের গ্লানি কেটে আসে ওর। ঢিল খাওয়া পুকুরের জলের মতো ক্ষণিক ঢেউয়ের দোলা তুলে আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে ওর মন। আশ্রয় খোঁজে মা বাবা সুনির্ভর পরিচিত পরিবেশে।

কিন্তু যে সংশয়ের বীজ মনের গভীরে পোঁতা হয়ে যায় সেদিন, তার থেকে কবে ডাল-পালা সমেত বিরাট গাছ গজিয়ে উঠবে, সে বিচারের বয়স সেটা নয়।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। উৎকট সাহেবিয়ানার হরেক রকম উপকরণ ও আড়ম্বর জীবনপথে নিত্যসঙ্গী হলেও ওর শিশুমনের বিস্তারের পথে বাধানিষেধের পাকা দেয়াল তুলতে পারেনি। ঘৃণা দ্বেষের বোধ যেন মুছে যাচ্ছে ভেতর থেকে যত বড় হচ্ছে। কে যেন অলক্ষ্য অন্তরাল থেকে ওর কানে ভালো লাগার, ভালোবাসার,

মন্ত্র জপ করে যায়। সেই উদার মাঙ্গলিকের সুরে ওর মনে তৃপ্তি ও শান্তির অমৃত বর্ষণ হয়।

রহমৎ কখন উঠে বাবুর্চিখানায় চলে গেছে। আয়েষাও বাড়ি গেছে। নীচে বড় রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজতে হারুণ তরতর করে টিলা থেকে নেমে গিয়ে সাইকেল ধরে। হৃষিকেশ নিত্যকার কাছারী যাওয়া-আসা সাইকেলেই সারেন।

নিভাননী জেনে নেন চা কোথায় দেওয়া হবে। ঘরে, না বারান্দায়। বারান্দায়, বলে হৃষিকেশ কাপড় ছাড়তে যান। তেঁতুল বিচি, বই, পত্রিকা, তুলে রাখতে বলে নিভাননী কনখলকেও কাপড়চোপড় ছাড়তে বলেন। হারুণকে বলেন চায়ের মেজ বারান্দায় লাগাতে। নিজেও একটু গোছগাছ হয়ে আসতে যান।

চা-পর্ব শেষ হলে হৃষিকেশ বলেন,—সেদিন হ্যাসেট কনাকে ঘোড়ায় সওয়ার করে একা ছেড়ে দিতে বলেছেন। ওর জন্যে একটা ব্রিচেস্ বানাতে দিয়েছিলাম। দেখ ত, ইউসুফ এল নাকি।

ইউসুফ সরকারী চাপরাসী। কাছারির ডিড্‌বক্স কাঁধে করে সে একটু আগেই এসে পৌঁছেচে। নিভাননী ভেতরে গিয়ে একটা কাগজের পুলিন্দা নিয়ে আসেন। তার থেকে বেরোয় পাচেপা হাঁটু থেকে ফুলো ইজের, ছাই ছাই রংয়ের। তখনো খাকীর চল হয়নি, খাকী সুলভও নয়, অনায়াসপ্রাপ্যও নয়।

হৃষিকেশ হারুণকে ডেকে ঘোড়ায় জিন চড়াতে বলেন। কাঞ্চন এলে নিজে গিয়ে রেকাবের বক্‌লস টেনে খাটো করে দেন। বিচিত্র ইজের পরিহিত কনখল মায়ের হাত ধরে বাইরে আস্‌তে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেন। দিয়ে বলেন হারুণকে লাগাম ধরে টিলা থেকে নামাতে। মাঠে পৌঁছে খোকাবাবার হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিতে হবে, সেটাও বুঝিয়ে দেন। তবে সে যেন সাথে সাথে থাকে।

সব কাজই হুকুমমাফিক হয়, তবে মাঠে পৌঁছেই কনখল পা দিয়ে কাঞ্চনের পেটে গুঁতো লাগায়। জড়তা ভেঙে একটু হাত পা

খেলানোর সুযোগ পেয়ে কাঞ্চন সানন্দ হ্রেষাধ্বনি করে সবেগে ছুট দেয়।

বাংলোর বারান্দায় নিভাননী আতঙ্কে হৃষিকেশের হাত চেপে ধরেন, বলেন,

—ওগো কি হবে! পড়ে যাবে যে! হারুণকে ছুটে গিয়ে রাশ পাকড়াতে বলো--

কখন যে আয়েষা ফিরে এসেছে, কেউ দেখেনি। আয়েষার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে বলে,—কিছু ভয় নেই মাসিমা ঐ দেখুন কনাকে, কেমন করে চালাচ্ছে। সাধ্য কি ঘোড়ার ওকে ফেলে দেয়!

সত্যিই আশ্চর্য দৃশ্য। পাকা ঘোড়সওয়ারের মতো কনখল জিন থেকে একটু উঠে রয়েছে, সমস্ত শরীরের ওজন দুই রেকাবে, হাঁটু দুটো চিম্‌টের মতো আঁকড়ে আছে ঘোড়ার কাঁধ, নিজে হুম্‌ড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে ঘোড়ার গলা বরাবর, রাশ ঢিল দিয়ে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। সওয়ার কাঁচা বলে ঘোড়া বেয়াদপি করে ছুট লাগায়নি, কনখল ইচ্ছেমতো ঘোড়াকে ছোটাচ্ছে।

পুরো দুচক্কর পোলো ময়দান পরিক্রমা করে ঘোড়া এসে হতভম্ব হারুণের কাছে দাঁড়ায়। কনখল লাগাম কসে টেনে জিনের ওপর ধপ্‌ করে বসে পড়ে। বসে কাঞ্চনের ঘাড়ে গর্দানে হাত বুলায়। কাঞ্চন ঘাড় বেঁকিয়ে কনখলের দিকে চেয়ে চিঁহি চিঁহি করে ওঠে। যেন বল্‌তে চায়, কেয়াবাৎ, বহুত আচ্ছা।

নিভাননীর কানে কানে হৃষিকেশ আওড়ান—

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি, চলেছি নিশিদিন—

* * *

মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত ওঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।

নিভাননীর মন অনির্বচনীয় আনন্দে উতরোল। কিন্তু কপট ঝাঁজ দেখিয়ে বলেন,—যদি পড়ে যেত? বাঁচ্‌ত তা হলে?

—আরে ছেলে কার দেখ্‌তে হবে ত! সেই যে কি বলে, বাপ কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ্‌নেহি ত থোড়া থোড়া।

কাঞ্চন-সওয়ারী কনখল টিলার সাম্‌নে এসে তড়াক্‌ করে এক লাফে নেমে পড়ে। আয়েষা ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে। বলে—সাবাস।

বারান্দায় উঠে মা-বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাবা বলেন,—গুড্‌ বিগিনিং। ভয়ের কিছু নেই। রোজ চড়বে। কাল হ্যাসেটকে ডাকব চায়ে। খুব খুশী হবেন।

মা ওকে পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে বলেন,—তোর একটুও ভয় করেনি? কি জোরে ছুট্‌লো কাঞ্চন, আমি ত এখান থেকে দেখেই ভয়ে মরি।

কনখল চালিয়াতি শেখেনি। বলে,—ভয় কিসের মা? আমি ত শক্ত হাতে রাশ ধরে ছিলাম। যখনি মনে হোতো রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে দিতে পারতাম।

আয়েষা কনখল হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে বেড়িয়ে বেড়ায়। নিভাননী হৃষিকেশ আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হয়ে যান। নিভাননী জানিয়ে দেন,—ওরে তোরা বেশী দূরে যাস্‌নি। নতুন রেকর্ড এনেছে কলকাতা থেকে, আলো জ্বাললে ফনোগ্রাফ বাজানো হবে।

ওরা ঘাড় নেড়ে জানায়, শুনেছে।

আয়েষা কনখলের কানে চুপি চুপি বলে,—অত জোরে ছোটাতে আছে, গাধা? যদি পড়ে গিয়ে হড়েগোড় ভাঙা 'দ' হয়ে যেতিস্‌? আমি মুখে বাহবা দিচ্ছিলাম, কিন্তু বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। কি ডাকাতরে তুই!

এইবার কনখল একটু উচ্চস্তরের হাসি হাসে। ভাবখানা এ ভয়তরাসে ছোট্ট মেয়েটা ভাবে কি? সে পড়বে ঘোড়া থেকে? পড়লেই হোলো?

৫

আয়েষার অনুরাগ যেন রূপকথার সোনার কাঠি। কনখলের যে চোখ সেদিন পর্যন্তও ফোটেনি, তাতে সেই সোনার কাঠি বুলিয়ে আয়েষা কনখলকে জাগিয়ে তুলেছে। চোখ মেলে কনখল ভালোবাসতে শুরু করেছে,—আয়েষাকে নয়,—সব কিছুকে। সামান্য পোকামাকড় পাখী প্রজাপতি থেকে সব মানুষ সব প্রকৃতিকে। বিরাগ বিতৃষ্ণা ঘৃণা বোধ তার মনের ভেতর থেকে মুছে যাচ্ছে—অসীম প্রেমে তার ছোট্ট বুক কানায় কানায় ভরে গেছে, সেখানে একটু ফাঁক ও থাকছে না যেখানে বিরাগ-বিদ্বেষ বাসা বাঁধবে।

বিচ্ছেদের দিন এসে পড়ে। হ্যাসেট খবর দিয়ে পাঠান নতুন শিক্ষানবীশ জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট রবার্টস্ আসবে, তার জন্য বাগচির বাংলো ছাড়তে হবে। তবে বাগচির জন্য, যদিও টিলার ওপরে নয় আর একখানা সুন্দর বাসা হ্যাসেটই ঠিক করে দেন। কাজীর বাজারের রাস্তায় গণি মিঞার প্রাসাদের পাশে পুরোনো সিভিল সার্জনের হাতা। বিঘে চারেক জমির ওপর একতলা বাংলো। বাবুর্চিখানা, আস্তাবল সব আছে। তদুপরি আছে সামনে প্রমাণ সাইজের ফুটবল ময়দানের চেয়েও বড়ো কম্পাউণ্ড, পেছনে প্রকাণ্ড পুকুর।

পাড়াটা একেবারে বাঙালী পাড়া। আশে-পাশে ছোট বড়-মাঝারি নানা সঙ্গতির বহু ভদ্রলোকের বাস। রবার্টস্-এর পক্ষে বেখাপ্পা পরিবেশ, কিন্তু হ্যাসেট আশা করেন, বাগচি মানিয়ে নিতে পারবেন।

নিভাননী খুব খুশী হন। দু কারণে। অলস দুপুরে এবাড়ি ওবাড়ির গিন্নীবান্নির সাথে গল্প-গুজব করবার অবকাশ পাওয়া যাবে, আর কনখলের স্কুল কাছে হবে।

হৃষিকেশের সাহেব-ঘেঁষা মনে একটু ঘা লাগলেও হ্যাসেটের প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি প্রকাশ করেন তিনি। আর কনখল? আয়েষাকে ছেড়ে দূরে যেত হবে ভেবে মনমরা হয়ে যায় প্রথম দিকটায়, কিন্তু দুঃখ পুষবার মতো জায়গা মনের মধ্যে কোথায় ওর? ছুটে যায় আয়েষাদের বাংলোয় ওর যা বলবার বলতে।

আয়েষাও খবর পেয়ে গেছে রহমৎ মারফত। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। পা টিপে টিপে কনখল ঘরে ঢুকতেই আয়েষার কান্নার তোড় বেড়ে যায়। কনখল গিয়ে আয়েষার পায়ের কাছে বসে। সান্ত্বনার একটি কথাও বলতে পারে না ও।

হঠাৎ আয়েষা উঠে কনখলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। মাথায়, ঘাড়েগালে চুমো খেতে খেতে চোখের জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয় ওর। দেখাদেখি খামকাই কনখলের দু চোখ দিয়ে ধারা নামে। নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। আয়েষার কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকে। অনেকক্ষণ দুজনের কেউই একটা কথাও বলতে পারে না।

প্রথম আবেগ কেটে যাবার পর, শ্রাবণ মেঘের আড়ালে সূর্যকিরণের মতো ভিজে দুচোখের পাতার ফাঁকে ম্লান হাসির ঝিলিক জাগে আয়েষার চোখে। ধরা গলায় বলে,—তাহলে চলে যাচ্ছিস্!

—আরে দূর! রোজ ত আসবই। পোলো মাঠে ঘোড়ায় চড়তে আসব না? এখানে থাকতে কখনো সখনো চড়তাম, এখন থেকে রোজ চড়ব। দেখিস্ তুই।

দুজনে এবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে বসে। আয়েষা গোসলখানা থেকে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসে! তোয়ালে এনে

কনখলের চোখ মুছিয়ে দেয়। বলে,—জানিস্। মিস্ রোজ মেরীকে ঠিক করা হয়ে গেছে। সামনের জুম্মাবার থেকে পড়াতে আসবেন।

—আমারো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সব পাকা। সামনের বিষ্যুৎবার বাবা বললেন গুরুবার, আমাকে নিজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসবেন।

আয়েষার বয়স তেরো। নিভাননীর অনেক বাংলা বই, নিজেদের বাড়ির লয়লামজনু শিরী-ফরহাদ, গুলে বকাওলি, যা পেয়েছে, অনেক পড়েছে। কনখলের দু হাত চেপে ধরে চোখে চোখে তাকায়। ওর চোখের মণির পেছনে কি অন্তহীন সুধার সমুদ্র! বলে,—আমি তোকে ভালবাসি, কনখল।

—আমিও তোকে ভীষণ ভালোবাসি।

একটুও দ্বিধা না করে জবাব দেয় ও। নিজের ভালোবাসার চুম্বকে কনখলের বিস্তৃত প্রেমবোধকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আয়েষা। আজ এই একটি মুহূর্তের জন্য কনখলের মনে হয় এ পৃথিবীব্যাপী যতো ভালোবাসার ধন আছে, যেন সবাই মিলে রূপ নিয়েছে ওই একটি মেয়ের মধ্যে। ও আয়েষার কোলে মুখ লুকোয়।

আবেগময়ী আয়েষা যেন হঠাৎ সংযত, সংহত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আঙুল চালায় কনখলের মাথা ভরা চুলের মধ্যে। নিজের আঙ্রাখার প্রান্ত দিয়ে মুছে দেয় কনখলের উপ্ছে ওঠা চোখের জল ধারা। ওর স্পর্শে এবার ধাঁধা লাগে কনখলের। নিভাননীর ছোঁয়াচ পেল কোথা আয়েষা?

ওদিকে হ্যাসেট চলে যাবার পর, রহমৎ এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে মেমসাহেবকে একা পাওয়া যায় কিনা তালাস করে বেড়ায়। নিভাননী খানা কামরার পাশে ছোট কুঠ্রী থেকে চাল, ঘি, মস্লা বার করছিলেন। আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় দরজার পাশে। ডাকে,—হুজ্রাইন।

—কে, রহমৎ? কি খবর? শুনেছ ত সব? আমরা পরশু

বাড়ি ছাড়ব। সব গোছগাছ করতে হবে। পরশু দিনের খাবার আয়েষাদের বাড়িতে খেয়ে নেব। তোমরা ভোরে ভোরে গিয়ে ও বাসার বিলিব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। রাতের খানা ওখানেই। বাড়িটা বড়ো। আরো দু-একটা লণ্ঠন কিনতে হবে। টেবিলবাতিও একটা—কনা স্কুলে ভর্তি হবে, ওর পড়বার ঘর লাগবে।

—জী মেমসাব। ও বাসায় শেষ সিভিল সার্জেন ছিল মেজর গ্রীন। দুটো বাচ্চা মেয়ে, বিবি, পেছনের পুকুরে ডুবে মারা যায়। তাই ছেড়ে দিল ডাক্তার সাব। তিনজনেরই কবর আছে আস্তাবলের পেছনে ঝাউবনের ভেতর।

—ও মা, সে আবার কিরে—

—না মেমসাব, ভয়ের কিছু নেই। গোরগুলো বাংলা থেকে অনেক দূরে। তবে শুনেছি, ডাক্তারের পরে এক ছোক্‌রা পুলিস সাহেব দিন কত ওখানে ছিল। বেপরোয়া সাহেব। খাটিয়া খোলা-বারান্দায় টেনে রাতে শুত। মাথার তলায় থাকত কার্তুজ-ভরা পিস্তল। সাহেব ভয় কাকে বলে জানত না।

প্রত্যেক মঙ্গলবার আস্তাবলে ঘোড়া অশান্ত হয়ে উঠত। ছটফট করত। খুরের খট্‌খটানিতে সাহেবের ঘুম ভেঙে যেত। সহিস ডেকে ঘোড়া সামাল করতে বলত সাহেব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও রমজান ঠাণ্ডা করতে পারতো না ঘোড়াকে।

তারপর এক রাত্রে, সেদিনও মঙ্গলবার, সাহেব ডিনারের পর থেকে পিস্তল হাতে মোড়া টেনে আস্তাবলের দরজায় বসে থাক্‌লো। ঠিক রাত যখন একটা, ঘোড়ার দাপাদাপি শুরু হোলো! সাইকেলের একচোখো চেরাগ হাতে, পিস্তল উঁচিয়ে সাহেব আস্তাবলে ঢুকল।

কি দেখল সাহেবই জানে। তবে রমজানের মুখে শুনেছি, যখন বেরিয়ে এল সাহেব, ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে, থরথর করে কাঁপছে।

পরদিনই বাড়ি ছাড়ল সাহেব। কিন্তু কি হয়েছিল, কাউকে কিছু বলল না।

তারপর এক জজ সাহেব সেদিন পর্যন্ত ছিল ওখানে। বুড়ো সাহেব, ঘোড়াও ছিল না, আস্তাবলের দরকারও ছিল না। এই ত সেদিন রিটায়ার করে চলে গেল। জজ সাহেব শান্তিতে ছিল। দিল তড়পাবার মত কিছু হয়নি। তার পরের ভাড়াটে, হুজরাইন আমরা।

—মেমসা'ব, আমাদের কাঞ্চন আছে। আমার সাহেব যদি হ্যাসেটকে বলেন, তবে আস্তাবলটা ভেঙে দিয়ে উল্টো দিকে গণি মিঞার মোকাম ঘেঁষে নতুন আস্তাবল বানিয়ে দেবে এক্ষুনি। এই কথাটা বলব বলেই হুজ্‌রাইনকে তক্‌লিফ দিলাম। গোস্তাকী মাফ্‌ হয়।

নিভাননী নির্বাক হয়ে সব শুনলেন। বললেন,—ভালো করছে বলে রহমৎ। ওই আস্তাবলের বাইরে আর কোথাও ভয়ের কিছু নেই ত?

—না মেমসাব। তবে মঙ্গলবার রাত্রে, বারটা ইয়াদ্‌ থাকে যেন, ঝাউতলায়, আর পুকুর পারে না যাওয়াই ভালো। আর আমি থাকব কুঠিতে, কোনো ভয় ঘেঁষতে পাবে না মেমসাব। খোদার দোয়ায় আমারও কিছু ক্ষমতা আছে—আমি থাকতে কনা বাবা, আপনি কি সাহেবের গায়ে কিছু আঁচ লাগবে না জানবেন।

রহমৎ চলে গেলে নিভাননী চিন্তাকুল মুখে হৃষিকেশের কাছে গিয়ে সব বললেন। হৃষিকেশ হালে বর্মাচুরুট খাওয়া ধরেছিলেন। এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললেন,—শুনেছি বটে অফিসার মহলে ওরকম একটা কথা। তা বেশ ত। আমি এখনি যাচ্ছি হ্যাসেটের কাছে।

পোশাক বদলে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাগচি।

একটু পরে হাজী ওবেদুল্লা সাহেবের দীর্ঘসৌম্য মূর্তি দেখা দিল টিলার চড়াইয়ে। হাঁটু ছাড়িয়ে প্রায় পা পর্যন্ত ধব্‌ধবে লম্বা কামিজ কাঁধে কোশিদা কাপড়ের বড়ো রুমাল, মাথার জরীর তাজ পেঁচিয়ে সাদা মস্‌লিনের সাফা। পাকা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। যেন স্বর্গ

থেকে নেমে-আসা কোন ফেরেস্তা। নিভাননীর মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

হাজী সাহেব নিভাননীকে 'মা' বলে ডাকেন। বারান্দায় উঠতেই নিভাননী তাঁর দু হাঁটু ছুঁয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। হাজী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে উর্ধ্বনেত্র হয়ে অস্ফুট সুরে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

নিভাননী সবচেয়ে ভালো ডেকচেয়ারটা নিজের আঁচল ঝেড়ে সাফ করে ঘর থেকে কুশন এনে পেতে দিলেন। হাত জোড় করে তস্‌রিফ্‌ রাখতে অনুরোধ করলেন।

হাজী সাহেব আসন গ্রহণ করলে নিভাননী বললেন,—শুনছেন বাবা, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে পরশু চলে যাচ্ছি।

—বদলি নয়, বাবা, বাসা বদল।

—বাঁচলাম। এখনো পুরো একবছর থাকতে হবে মা। খুদা মেহেরবান।

—পুরোনো সিভিল সার্জন গ্রীন সাহেবের কুঠি—বাড়িটা খুব ভালো, তবে শুনছি বদনাম আছে বাড়িটার।

—কেয়া, ওহি মোকাম—ওই গণি মিঞার পাশে? হুঁ—

বলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন হাজী সাহেব? তারপর বললেন,—কুছ্‌ ডর নেহি বাচ্চী,—রহমৎকে বাড়িতে রাখবে রাত্তিতে। তা ছাড়া আমি চারটে মোড়ক দেব। জুম্মাবারে আল্লার নাম করে পুব পছিম উত্তর দক্ষিণ, চার দিকে সন্ধ্যেবেলা ছাদে উঠে মোড়ক চারটে ছুঁড়ে দেবে। আর ভয়ের কিচ্ছু থাকবে না। আমার বেটা কোথায়? ম্যাজিস্ট্রেট সাব্‌?

—হ্যাসেটের ওখানে গেছে। রহমৎ বলছে আস্তাবলেই নাকি ভয়। উনি গেছেন ডিপ্‌টি কমিশনারকে ধরে আস্তাবলটা ওখান থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে।

—ঠিক্‌ করছে! কনা বাবা কোথায়? বাড়ি ছাড়তে হবে, তাই আয়েষার হাত ধরাধরি করে দুজনে কাঁদছে বোধ হয়।

নিভাননীর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। একটু হেসে বলেন,—দু'জনে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, বাবা। ছেড়ে যেতে কষ্ট ত হবেই।

—দুঃখ, কষ্ট, যত হোক্, হতে দাও। আগুনে পুড়বে, তবে ত খাঁটি সোনা বেরোবে। ভালোমন্দের সাথে লড়বার শিক্ষা নিজে থেকে পেতে দাও ওকে, দুঃখ পেয়ে, প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে ভালোবাসে। মায়ের স্নেহের আঁচল দিয়ে কত ঘিরে রাখবে মা। কনখল বড় হবে, আল্লার আশীর্বাদ আছে ওর ওপর।

—কিন্তু বাবা, দেশ, সমাজ, আইন, এ সবকিছু ভালো চোখে দেখে না। কংখ্ ছোট আছে এখনো, আয়েষা বড় হয়েছে। ওর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আয়েষার মায়ের যেটি গেছে, সে ত ওই বয়সেই হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়ে যায় বাবা।

হাজী সাহেব মনেপ্রাণে সুখী। প্রেমই ধর্ম, ধর্মই প্রেম। অদৃশ্য জগৎ, আংশিক অদৃশ্য জগৎ, সদৃশ জগৎ, দৃশ্যমান জগৎ, কতরকমের জগৎ আছে,—যা কিছু সুন্দর, তা সে মানুষই হোক, কি প্রকৃতিই হোক, তার আকর্ষণ মণকে টানে পরম সুন্দরের দিকে। কারণ মানুষ সেই পরম সুন্দরের, ভগবানের, আল্লার, আংশিক বিকাশ মাত্র।

এত শক্ত কথা পাড়েন না তিনি। বলেন,—নিন্দা প্রশংসার উৎস হবে নিজের মন, মা, নিজের মন। সেই মনের আইনের নির্দেশে যে অবিচলিত থেকে আজীবন চলতে পারলো, তারই ত সার্থক বেঁচে থাকা। তুমি কিছু ভেবো না মা। ভালোবাসার টান শুধু শরীরের নয়—শরীর ত ধুলো-মাটির। কত জন্মজন্মান্তরে বহু ভালোবাসার স্বাদ বাসা বাঁধে বুকে—সেই স্বাদ ফিরে ফিরে আসে, বারে বারে ভালোবাসায়—যাক্ এসব কথা। আমি যা বলতে এসেছি শোনো। আজ সন্ধ্যেয় মিলাদ আছে দর্গায়। তোমরা সবাই আস্‌বে। রাতের খানা আমার ওখানে হবে—শুধু বিরিয়ানি, আর জর্দা পোলাও। কেমন আসছ তো?

—বাবা, আপনার ডাকে মেয়ে যাবে না ভাবলেন কি করে!

প্রশান্ত উদার দাক্ষিণ্যে নিভাননীর কেশ স্পর্শ করেন হাজী সাহেব। আশিস বর্ষিত হয় অকৃপণ স্নেহে। বলেন,—জাফর সাহেবের বাড়ির সবাইকে বলতে হবে। উঠি মা। খুদা হাফিজ।

হাজী সাহেব চলে যেতে না যেতে কনখল আর আয়েষা হাত ধরাধরি করে নিভাননীর কাছে এসে বসে। তুজনেই হাসিখুশী—একটু আগে যে চোখের জলের বান ডেকেছিল, কোন চিহ্ন নেই তার। কি করে জানবেন নিভাননী যে মন দেওয়া-নেওয়া খতম হয়ে যাবার পর গভীর তৃপ্তি ওদের মুখচোখ থেকে শেষ বিদায়ের চিহ্নটুকুও মুছে নিয়েছে।

ওরা তুজনে তু পাশে বসে। তুজনেরই মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিভাননী বলেন,—আমরা যে চলে যাচ্ছি অন্য বাসায়—শুনেছিস আয়েষা?

—শুনেছিই ত। মা বলছে পরশু তুপুরে আমাদের ওখানে তোমারা খাবে সবাই।

—তা ত খাবো। কিন্তু তোর মন খারাপ হচ্ছে না? আমার ত তোদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছে আয়েষা।

কথাটা বললেন নিভাননী, খানিক সত্যি—খানিক আয়েষার মন বোঝবার টোপ হিসেবে। কিন্তু তেরোশো সতেরোর ত্রয়োদশী প্রায় যুবতী—বাল্য আর যৌবনের মধ্যে কৈশরের অবকাশ তখনকার দিনের মেয়েদের থাকতো কমই। ছলাকলা আপনা থেকেই রপ্ত হয়ে যায় যুবতীর, হাত ধরে কাউকে শেখাতে হয় না। বুক ফাটে ত, মুখ ফোঁটে না। আয়েষা হেসে বলল—মন খারাপ একটু হচ্ছে না, বলি কি করে? তবে ও বাড়ি ত খুব ভালো মাসিমা। এখানে খেলতে গেলে বাড়ি ছেড়ে মাঠে নামতে হয়, মাছ ধরতে অন্যের পুকুরে যেতে হয়, আর ও বাসার খেলার মাঠ, পুকুর, সবই ত বাড়ির সামিল। মিশনের টমটমে রোজমেরী বিবি পড়াতে আসবেন আমায়, তাঁর সাথে ঘুরে আসব তোমাদের ওখান থেকে।

আর চাঁদবিবির শিকার খেলার কি হবে? ভোলানোর জন্যে আর একটা কনা ভাই পাবি কোথা?

উদ্গত অশ্রু দাঁতে ঠোঁট টিপে থামায় আয়েষা। বলে,—শিকার কনাভাই একাই খেলবে। আমি শিকারের কি জানি।

চিড়িয়া নয়, চিড়িয়ামারকে শিকার করে বসে আছে আয়েষা, ভাবেন নিভাননী। এক লহমার জন্যে বিরূপ হয়ে ওঠে মন। হাজী সাহেবের কথা মনে পড়তে সামলে নেন নিজেকে। মায়ের স্নেহের কয়েদখানায় উঠতি বয়সের ছেলেকে চিরদিন বেঁধে রাখা যাবে না, বোঝেন। বলেন, মমতাস্নিগ্ধ গলায় বলেন,

—তোর কাছ থেকে দূরে থাকতে আমারই কষ্ট হবে রে আয়েষা। তুই যে আমার বড়ো আপনার হয়ে গিয়েছিলি।

বলে, আয়েষার দুগালে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরেন। তারপর কোলের ভেতরে গুঁজে নিয়ে পিঠে হাত বুলোন।

এইবার আয়েষার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ পাহাড়ী নদীর ঢলের মতো কান্নার তোড়ে ভেঙে যায়। দু হাতে নিভাননীর কোমর জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে অস্পষ্ট কান্না-জড়িত গলায় বলে,—মাসীমা—

৬

নতুন বাসায় এসে ভালো লাগছে কনখলের। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো কৌতূহলে আনাচ, কানাচ, ঝাউতলা পুকুর সব সরেজমিনে তদারক করে বেড়াচ্ছে ও। একটা করম্চা গাছ আছে, কাঁটাভরা ডাল ছাতার বাঁট দিয়ে নুইয়ে একরাশ ফল পেড়েছে। সাদা দুধের মতো কষ হাতে লাগবার একটু পরেই কালো হয়ে উঠছে, ভ্রূক্ষেপ নেই ওর।

আরও ফলের গাছ আছে। পেয়ারার, কাঁঠালের, ভুবির। ভুবি লকেট ফলের মতো একরকম ফল, পাকা সুপুরীর মতো রং, টকেমিষ্টিতে ভারি সুন্দর খেতে।

দিন ছ-সাত হোলো, ওরা এসেছে। আয়েষা কথা রেখেছে। বিবি রোজমেরী টমটম হাঁকিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যান ওকে। কনখল এ কদিনে একবারের বেশী যেতে পারেনি কাঞ্চন-সওয়ারী হয়ে পোলে ময়দানে। আয়েষা ঠোঁট ফুলিয়ে ছিল, তবে সামলে গেছে। যৌবন চাঞ্চল্যে দেহমন ভরে উঠলেও বুদ্ধি-বিবেচনার স্থিরতা এসেছে।

আস্তাবল পরিকল্পনা মাফিক উঠিয়ে অন্য প্রান্তে নেয়া হয়েছে। এক মঙ্গলবার কেটে গেছে, নিভাননী কান খাড়া রেখেও কিছু শুনতে পাননি রাতে। হাজী সাহেবের দেওয়া মোড়ক চারটে নারায়ণ স্মরণ করে প্রথম শুক্রবার সন্ধ্যেতেই চার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন নিভাননী। কেবল উত্তরে, ঝাউতলার দিকে গোরস্থান পর্যন্ত পৌঁছয়নি একটা মোড়ক। অনেক আগে অবশ্য বাবুর্চিখানা পেরিয়ে গিয়ে পড়েছে।

কুঠিতে কুঠিওয়ালা কেউ ছিল না কিছুদিন। সামনের কম্পাউণ্ড পাড়ার ছেলেদের হা-ডু-ডু আর গোল্লাছুট খেলার আস্তানা হয়েছিল। ছেলেরা কনখলের বয়সী দু-একজন, বেশীর ভাগই তিন-চার বছরের বড়ো ওর থেকে। ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছে পুকুরপাড়ের জমিদার প্যারীবাবুর ছেলে জীবন, আর গণি মিঞার ছেলে ইক্‌বালের সাথে। ওরা ওর সমবয়সী। কনখল এখনো খেলায় যোগ দেয়নি, তবে ঠিক করছে এইবার দেবে। নিপুণ হয়ে খেলা দেখে ও—খেলার উৎকর্ষের স্লুক-সন্ধান নেয়, কায়দা-কানুন দেখে, যতটুকু পারা যায়, রপ্ত করার চেষ্টা করে। ওর ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা ফাঁস হয়ে গিয়েছে ছেলেদের মধ্যে, কিন্তু আর আর কেরামত, যথা—বন্দুকছোঁড়া, এসব এখনো কেউ জানে না।

রবিবার রাত্রে জাফর ডাক্তার সপরিবারে খাবেন ওদের ওখানে। বিকেল নাগাদ এলেন ওঁরা বন্ধ গাড়িতে। আয়েষার মার আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা। আয়েষারও ঘাগরা আঙরাখার ওপর পাতলা ফিলফিলে আশমানী রঙের ওড়না, ঘোমটার মতো কপাল ঢেকে বেঁকিয়ে ঠোঁট ঢেকে বেড় খাওয়ানো। চোখ নাক খালি বেরিয়ে আছে।

কম্পাউণ্ডের পর খোলা বারান্দা, বেশ চওড়া। তারপর ঢাকা বারান্দা, তারপর কামরা শুরু। খোলা বারান্দায় সবুজ রং-করা বেতের টেবিল-চেয়ার পাতা। বাবা, ডাক্তার সাহেব, পাড়ার গণি মিঞা, প্যারীবাবু, মুরারীচাঁদ কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর বিদ্যাভূষণ মশায় সবাই সেখানে বসে। মেয়েরা অন্দরে ঢুকে গেছেন। ডাক্তার সাহেব ছাড়া আর সবাই রোজই আসেন।

গোল্লাছুট খেলায় কনখলের সেইদিন প্রথম তালিম। খেলাটা মজার! একটা বড়ো গোল দাগের মধ্যে ছ-সাত জন দাঁড়ায়, আর ওদের দলেরই একজন শখানেক গজ দূরে একটা ছোট গোলদাগের মধ্যে থাকে। প্রতিপক্ষ সবটা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মাঠের চৌহদ্দি কাটা আছে অবশ্যই।

বড়ো গোল দাগ থেকে এক-একজন করে ছুটতে হয় যা-কিছু একটা ছড়া সুর করে বলতে বলতে। ছুটন্দাজকে একদমে পৌঁছতে হবে শত্রুর হাত এড়িয়ে ছোট দাগে। ছোট দাগের খেলোয়াড় আবার সুর করে ফিরে আসবে বড় দাগে। মাঝপথে শত্রুকবলিত হয়ে যদি দম ফুরিয়ে যায়, তবে তাকে 'মইর' হতে হবে অর্থাৎ খেলার মাঠের চৌহদ্দী থেকে বাইরে গিয়ে বসতে হবে। এইভাবে এক পক্ষ 'মইর' হয়ে খতম হয়ে গেলে, অপর পক্ষ দাগে ঢুকবে। এইভাবে চলবে খেলা।

কনখল প্রথম দিনের খেলাতেই উৎরে যায়। দম নিয়ে সুর ধরে সে যখন প্রথম ছুট দেয়, পাকড়ে তাকে ফেলে শত্রুরা বারবার, কিন্তু আটকে রাখতে পারে না। ছোট গোল দাগে পৌঁছাবার ঠিক আগে যখন ধরা পড়ে, তখন ঝটাপটি করতে ওর দম প্রায় ফুরিয়ে আসে। গলার শির ফুলে উঠেছে, চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভাবছে, এবার 'মইর' হওয়া ছাড়া আর গতি নেই।

ঢাকা বারান্দার বাঁ দিকের ঘরটা ওর থাকবার, পড়বার ঘর। সেই ঘরের খোলা জানালা থেকে আশমানী ওড়না বিজয় নিশানের মতো কে ওড়ায়? কনকচাঁপা রঙের সুডৌল হাত নেড়ে উৎসাহ-সূচক সংকেত কে করে? ওর চেয়ে বেশী বয়সী, শক্তিমান প্রতিপক্ষের দুহাত থেকে সবলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে পৌঁছে যায় ছোট দাগে—গিয়ে হাঁপাতে থাকে, তাকায় নিজের ঘরের দিকে। জানলায় বিজয়লক্ষ্মীর সস্মিত সহাস্য মুখ দেখা যায় এক লহমার জন্য। তারপর জানলা বন্ধ হয়ে যায়।

খেলাশেষে দলপতি অমৃত, সেই বয়সে সবচেয়ে বড়ো আর কুস্তি করে মুগুর ভেঁজে সবচেয়ে জোয়ান—কনখলের পিট চাপড়ে বলে,—কদিনের মধ্যেই কনখল সবসে সেরা খেলোয়াড় বনে যাবে, দেখিস তোরা। অমূল্যর হাত ছাড়ালি কি করে রে কনখল? ওটার হাত দুটো তো লোহার সাঁড়াশির মতো।

অমূল্য কাঁচুমাচু মুখে বলল,—আরে, হঠাৎ এক পা পেছনে ঝোঁক দিতেই ফসকে গেল ছেলেটা। তারপর দে ছুট। ছুটে ওর সাথে পারে, দলে এমন আর কেউ নেই বলে মনে হয় আমার।

খেলার শেষে সিরাপ জল খেতে দেন ছেলেদের নিভাননী। এটা বাঙালী পাড়া, নিজে বেরোন না কর্তাদের সামনে বারান্দায়। খিড়কি থেকে ইশারায় ডাকে।

ছেলের দল দঙ্গল বেঁধে জমায়েত হয়। কাচের বড়ো বড়ো দুটো জাগ ভরা শরবত, গেলাসে ঢেলে দেন প্রত্যেক ছেলেকে। রহমতের হাতে খেতে বেশীর ভাগ হিন্দু ছেলেদের বাড়ির আপত্তি উঠতে পারে আঁচ করে পরিবেশনের ভার নিজের হাতে নেন নিভাননী। ছেলেদের সাথে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছে এই কদিনে। অমৃতকে বলেন,—হ্যাঁরে অমৃত, কনা খেলতে-টেলতে পারে ত?

—খুব ভালো পারে মাসিমা। দিন কতক যাক না, দেখবেন, ওর সাথে কেউ পেরে উঠবে না।

কনখল পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। পড়বার ঘরে "সখী ও সাথী"র নতুন সংখ্যার পাতা ওলটায় আয়েষা। বলে,—এই যে বীরপুরুষ। আয়, আয়। আর একটু হলেই ত 'মইর' হয়ে গিয়েছিলি।

—হলেই হোলো? অ্যায়সা তাক্ করে অমূল্যর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম নিজেকে, ও হুমড়ী খেয়ে পড়ে যায় আর কি। তারপর, ব্যস্ এক ছুটে বুড়ি।

দুজনে দুজনার চোখোচোখি হতে হেসে ফেলে। কনখল বলে,—তোর ওড়না দেখা মাত্তর আমার গায়ে বিশ জোয়ানের জোর এল। তারপর যখন তোর হাত নাড়া দেখলাম, আর আমাকে রুখতে পারে কেউ?

—গেঞ্জি ছেঁড়া, ইজেরে কাদা, যা ওগুলো ছেড়ে আয়।

এ পাড়ায় এসে দিন দুয়েকের মধ্যেই ধুতি পরা ধরেছে

কনখল। কাল্গোপেড়ে আটহাতি বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি দুজোড়া আনিয়ে দিয়েছেন নিভাননী, আর পাবনা শিল্প সঞ্জীবনীর কোরা গেঞ্জি। নিজেও দিশী পেলে বিলিতি কাপড়-চোপড় পারতপক্ষে কিনতে চান না নিভাননী। এইখানে বাগচি সাহেবের হার। তাঁর নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ আসে হারম্যান, র‍্যাঙ্কিন, আর্মিনেভি থেকে। মাপজোক দেওয়া আছে দোকানে দোকানে। দরকার মতো ডাকেই সব এসে যায়। সে আমলে কলকাতার সাহেব দোকানদারের গেজেটে নাম ওঠা সরকারী চাকুরেদের লম্বা ধারের সুবিধে দিত। রাজার জাতের দোকানী, জানত নেটিভ্ সাহেবগুলো দাম ঠিক মিটিয়ে দেবে। ধারে জিনিস দেওয়ার আর একটা দিকও ছিল। দশটাকার জিনিনটা কিস্তিতে দিলে পঁচিশ টাকা উসুল হোতো।

আয়েষা কনখল ছাদে উঠে গল্পগুজব করতে বসে। সূর্য সবে অস্ত গিয়েছে। পড়ন্ত আলোয় ঝাউতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে কনখল বলে,—জানিস্ ওখানে গোরস্থান আছে।

—সে কিরে? কার?

—আগে কে ডাক্তার গ্রীন ছিল, তার মেমের আর দু মেয়ের।

—কি হয়েছিল ওদের?

—আমাদের অমৃত বলছিল যে, মেয়ে দুটো সাঁতার জানত না। একদিন হয়েছে কি, ওরা দুটিতে পেছনের পুকুরটা দেখছিস ত, ওই পুকুর পাড়ে খেলা করতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। মেমসাহেব ছাদে পায়চারী করছিল, দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে, সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। মেয়ে দুটো আগেই জলখেয়ে ডুবে গিয়েছিল। মেমসাহেব এক-আধটু সাঁতার জানত, চাকর-খানসামা কাউকে না ডেকেই জলে নেমেছিল মেমসাহেব। লম্বা গাউন ভিজে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে মেমসাহেব, মেয়েদের পাত্তা ত পেলই না, নিজেও ডুবে গেল। পাশের বাড়িতে সবাইকে বলতে প্যারীবাবু এসে মেজর গ্রানকে খবর দেন, সাহেব সেইমাত্র ফিরেছে। তারপর নাকি জাল-টাল ফেলে তিনজনকেই তোলা হয়। তখন সবাই মরে গেছে।

—আচ্ছা, তবে কবর বাড়ির ভেতরে কেন? সাহেবদের ত গীর্জার পাশে মস্ত গোরস্থান আছে?

—তাও শুনেছি। সাহেব বলেছিল, সে আর চাকরি করবে না, বিলেতে ফিরে যাবে। যে কটা দিন আছে, মেমসাহেবের আর মেয়েদের কাছছাড়া হতে চায় না। পাদরী সাহেব আপত্তি করেননি, পাড়ার মাতব্বররাও 'না' বলেননি। এ বাড়ির হাতাও ত মস্ত। ঐ ঝাউতলার দিকে দেখ। ওদিকটায় কোনো বাড়িও নেই।

—ওখানটায় কোনো ঘর ছিল নাকিরে কনা? ইট-সুরকির মেঝের দাগ দেখা যায়?

—আরে, ঐটেই ত ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। ডাক্তার চলে যাবার পর এক পুলিস সাহেব এ বাসায় থাকত। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে, দেড়টা-দুটোর পর, আস্তাবলে ঘোড়া ভড়কাতো। অমনি মঙ্গলবারের এক রাত্রে সাহেব কারণ খুঁজতে আস্তাবলে ঢুকেছিল। কিন্তু সেও নাকি এত ভয় পেয়েছিল, যে পরদিনই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমরা আসবার আগে বাবা হ্যাসেটকে ধরে অস্তাবল উঠিয়ে ইক্‌বালদের বাড়ির দিকে নিয়ে গেছেন।

তোরা আসবার পর এক মঙ্গলবার ত পার হয়ে গেছে। কিছু দেখেছিস, কি শুনেছিস?

—কিছু না। আর আমি ত ভালো করে সব শুনলাম সেদিন। ঐ অমৃতদের সাথে ভাব হওয়ার পর। মা বোধ হয় আগেই শুনে থাকবেন, তা না হলে আস্তাবল সরানো হবে কেন। তবে ভয় পেতে পারি বলে আমায় কিছু বলেননি।

—ভয় পেতে পারি? তুই বলিস্ কিরে। পুলিসের ডাকু সাহেব ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে দেয়, আর তুই ত একরত্তি ছেলে! খবরদার, মঙ্গলবার রাত্রে একা শুবি না। মার কাছে শুবি।

এ যেন মায়ের মতো আর এক মা হুকুম করছে ছেলেকে।

কনখল লজ্জা পায়, ওর রাগও হয়। বলে,—থাম্ তো তুই। আমি কারুকে ভয় পাই না। বার বার 'রাম, রাম', বলে আমি ওই কবর থেকে ঘুরে আসতে পারি রাত্তিরে, জানিস ?

খুব বাহাদুর। দাঁড়া, আমি মাসিমাকে তোর মতলব ফাঁস করে দিচ্ছি আজই।

আয়েষা অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পায়চারী করে দু-চার পাক। আবার ফিরে এসে বসে' স্নেহসিক্ত গলায় বলে,

—কনাভাই, আমি যদি জলে ডুবে মরে যাই, আর আমার ভূত রাত্তিরে তোর পাশে এসে দাঁড়ায়, ভয় পাবি না তুই ?

—ধেৎ, তুই ত জলের পোকা। তুই ত সাঁতার জানিস।

—ইচ্ছে করে সাঁতার ভুলে যাব।

কনখল ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। হেসে ফেলে বলে,—চালাকী হচ্ছে। তুই জ্যান্তই আসিস্ আর তোর ভূতই আসে, আমার কাছে দুইই ত তুই, ভয় পাব কেন রে!

যেন এই কথাটা বার করবার জন্যেই আয়েষার এত আয়াস। নিজে উঠে, ওর হাত ধরে টেনে তোলে। বলে,—চল যাই এবার নীচে। ফনোগ্রাফ শুনব। কি কি যেন নতুন সব গান এসেছে বলছিলেন মাসিমা।

—চল্।

দুজনে ছাদ থেকে নেমে যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নীচে ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। ওরা দুটিতে গিয়ে বসবার ঘরে মা-মাসী যেখানে বসে গল্প করছিলেন সেইখানে আশ্রয় নেয়।

৭

টিলা থেকে নীচু জমিন। পোলো স্কারির পর গোল্লাছুট। সাহেবী থেকে দিশী পাড়া। ন' বছরের জীবনে কনখল মেনে নিয়েছে—এমনিই হয়। বহুরূপী গিরগিটির মতো রং বদলে যাচ্ছে বাড়ি সুদ্ধ সবার। বাবুর্চিখানা আছে, ঠাকুরের হেঁসেলও হয়েছে ভেতর বাড়িতে। দিনের খাওয়া পিঁড়েয় বসে, কাঁসার খালায়। ভাত, মাছ, শাক, সুক্ত। রাতে আগের নিয়মে কাঁটা চামচের টুং টাং—সুপ, কাটলেট, রোস্ট, পুডিং। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে কনখলের উদারতা বাড়তে থাকে। নিভাননীর পায়ে আর অষ্টপ্রহর চটি থাকে না। হৃষীকেশ কাছারী-ফেরত বাইরের বারান্দায় জমিয়ে বসেন। জমিদার প্যারীবাবু, কলেজের বিদ্যাভূষণ মশায় নিয়মিত সঙ্গী। চা চলে, নিভাননীর নিজের হাতে তৈরী, ঠাকুর দিয়ে যায় বাইরে। বিদ্যাভূষণ মশায় নিজের হুঁকো সাথেই আনেন, হৃষীকেশ প্যারিবাবু চুরুট টানেন।

প্যারীবাবু কথাই বলেন না, মৃদু মৃদু হাসেন শুধু। বিদ্যাভূষণ অনর্গল বকে যান। অনেক শক্ত শক্ত তত্ত্বকথার আমদানি হয়, কনখল তার একটাও বোঝে না।

হরেন চাকী মশায় উকীল, রোগা শুঁটকো চেহারা। তিনি যেদিন আসেন, খুব হাসির হৈ-হল্লা ওঠে। পণ্ডিত মশায় বলেন,—এস এস 'নিঃস্বার্থ চাকী', আজকের খবর বলো।

হৃষীকেশ বলেন,—হরেনবাবুর খবর খারাপ কেন হবে? ওঁরা "Conscience to them is a marketable thing which they sell to the highest bidder." আমার কথা নয়, কান্তকবির।

বিদ্যাভূষণ বলেন,—ঠিক।

উকীলরা,—ওরা বাদীকেও বলে "হ্যালো,
তোমার মামলা ত অতি ভালো?"
আবার প্রতিবাদী এলে বলে "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

হরেনবাবু জাত-উকীল। কোনঠাসা হয়ে ঘাবড়াবার লোক নন। পাল্টা জবাব দেন,—যদি কান্তকবির নজীর ওঠালেন, তবে শুনুন। ডেপুটিরা—

"তাঁরা দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চটপটে;
যাঁহা এজ্‌লাসে বসে,—মেজাজ রুক্ষ
চট্ করে ওঠে চটে।

তাঁদের বয়েসটা খুব বেশী নয়,
আর এই পোশাকটাও এদেশী নয়;
আর এই হাম্‌বড়া ভাব তাঁদের অস্থি-
রক্ত-মাংস-পেশীময়!

কিন্তু সাহেবটি ভালোবেসে
যদি কান মলে দেন কসে,
ঐ করকমলের কোমলতা করে
অনুভব হেসে হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,
একটু দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হলেও
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।"

আর বিদ্যাভূষণ?

—"যদিও ছোঁয়নি সংস্কৃত কেতাব,
তবুও 'বিদ্যাভূষণ' খেতাব,

কিন্তু কিচ্ছু জানে না, বলে কোন ভেড়ে ?
মুখের এমনি প্রতাপ !
সুদ্ধ আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত নচ্ছার ছেলে তুষ্ট,
কি বিষনয়নে ঐটে দেখেছে,
কাটতে পেলেই তুষ্ট !"

টিকি কাটবার প্রসঙ্গে কনখল ঘরের ভেতর মায়ের কোলে মুখ গুঁজে খিলখিল করে হাসে। নিভাননীও মুচকি হাসেন। কিন্তু বাইরে প্যারীবাবু উসখুস করতে থাকেন। হরেন উকীলের মুখ খুলেছে, রেহাই তিনিও পাবেন না, জানেন। হৃষীকেশ সহাস্য মুখে বলেন,—আরে প্যারীবাবু সম্বন্ধে লিডিং কিছু বলুন হরেনবাবু, —কোনো নজির-টজির,—

—আলবত। ঐ কান্তকবিই আজকে চলুক।

"মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা !
রসিক সেই যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ ;
সেই কাজের লোক চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যায় উপলক্ষ—"

—আরে থামো হে নরেন। ছেলেপুলের বাড়ি, কি আবোল-তাবোল বকছ ?

প্যারীবাবু যদিও ষাট বছরের বুড়ো নন, কিন্তু সম্প্রতি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন। হরেনের আলগা মুখে যা আসবে তাই বলে বসবে। এ প্রসঙ্গ থামাতে চান তিনি।

কনখল শেষের দিকের ছড়ায় হাসির কিছু পায় না, কিন্তু নিভাননী মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপেন।

হৃষীকেশ এ ধরনের সান্ধ্য বৈঠকে খুব মজা পান, বুঝতে পারে কনখল, কিন্তু প্রাণ খুলে মেশেন না। কারণ না বুঝলেও এটুকু সে বোঝে যে তার বাবা একজন সাহেবলোক, ধুতিচাদর পরতে সে তাঁকে কচিৎ দেখেছে। বাবাকে মানায় ঘোড়ার পিঠে, শিকারের

পোশাকে, কাছারী যাবার সময় সাইকেলে। ঐ দুচাকার গাড়িতে চড়ে মানুষ চলে কি করে, ভাবতে অবাক লাগে ওর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে অথবা কাঠের দাঁড়ে ঝুলিয়ে না রাখলে যে গাড়ি সোজা হয়ে থাকে না, রাখতে গেলে ধুপ করে পড়ে যায়, তাতে চড়ে অত জোরে চলে যান বাবা, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ঝোলানো সাইকেলের চাকা হাত দিয়ে ঘুরোতে বেশ লাগে। ঘণ্টা বাজাতেও জানে, তবে আওয়াজ হলে লোক জানাজানি হবে, সে ভয় আছে। একবার পাদানের শেকল ঘোরাতে গিয়ে আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই থেকে নিভাননীর বারণ আছে ঐ যন্তরটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে। কিন্তু হাত না কেটেও কি করে জিনিসটির সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় সে লোভ ওর মনে মনে আছে।

তিন চাকার সাইকেল আছে ওর একটা, সাতবছর বয়েসে কেনা। ও এখন বড় হয়েছে, তিন চাকায় চড়তে লজ্জা করে। তা ছাড়া, ঘোড়ার পিঠে যার অনায়াস দখল, সে যাবে কিনা পুঁচকেদের মতো ট্রাইসিকলে চড়তে। যদি চড়তে হয়, বাবার মতো ওই বাইসিকলেই চড়বে ও। ফাঁক খুঁজছে শেখবার জন্যে। অমৃত চড়তে জানে, বলেছে সুবিধে পেলেই শেখাবে।

বাড়ির সামনের রাস্তায় দিনকতক হোলো একটা খোয়া-কাঁকড় ভাঙবার গাড়ি এসেছে, অনেকটা রেলের এঞ্জিনের মতো দেখতে। ইয়া জগদ্দল পেছনের চাকা, চাঁই চাঁই পাথর ইঁট গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। চলবার সময় কী আওয়াজ, আর ধোঁওয়া। একদিন খাসিয়া ড্রাইভার ওকে উঠিয়েছিল সেই গাড়িতে। চলে আস্তেই, কিন্তু চড়েই কনখলের মনে হয়, আরো ঢের ঢের জোরে চলবার ক্ষমতা আছে ওটার। রামায়ণের সেই বিরাট কুম্ভকর্ণের ছবিটা মনে পড়ে—চিত হয়ে শোয়া ছবিটা—বানরেরা দড়ি দড়া দিয়ে বাঁধছে। ও জানে, দৈত্য পাশ ফিরলেই দড়িগুলো পটাপট ছিঁড়ে যাবে আর হাজার খানেক বানর পড়বে চাপা। গাড়িটাও তেমনি একটা শক্তিধর দৈত্য, যা পারে যেন তার এক কণা অংশের পরিচয়

দিচ্ছে ঢিমে তেতালা তালে চলে। ইচ্ছা করলেই যেন ওটা পাহাড়-পর্বত গুঁড়িয়ে অনেক জোরে চলতে পারে।

মা উঠে যান ভেতর বাড়িতে, পাশের বাড়ির কারা যেন এসেছেন, গিন্নীবান্নিরা। কনখল উঠে নিজের ঘরে আসে, শোবার-পড়বার ঘর। ঢাকা বারান্দার লাগ পুবে। এটা-ওটা বই নাড়ে—মন বসে না।

বিকেলের চা হয়েছে ভেতরের হেঁশেলে, রহমৎ অবসর। বুড়ো এসে কনখলের ঘরে ঢুকতেই ও উল্লাসে লাফ দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে বসায়। নিজে পাশে বসে। বলে,—আজ গল্প বলতে হবে, খালি বড়দের গল্প সব মাকে শোনাও তুমি।

—আচ্ছা, আচ্ছা হবে। আকবর বাদশাহ নাম শুনেছ কনা বাবা?

—নিশ্চয়। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বর বা।" সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন তিনি।

নিভাননীর বইয়ের দপ্তরে "প্রতাপসিংহ" নাটক ছিল। বুঝুক-না-বুঝুক, গোগ্রাসে পড়ছে। আকবর, প্রতাপ, শক্তসিংহ, মানসিংহ নামগুলো জানা আছে ওর।

—সমস্ত হিন্দুস্থানের নয় বাবা, বাংলা দেশের কোন কোন জায়গা তখনও শাহান শাহের তাঁবেতে আসেনি। ছোটখাটো রাজায় তখন বাংলা দেশ ভর্তি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন চালাক, তেমনি বীর। বাদশাহের ফৌজ যখন আসে, খানাপিনায় তাদের তুষ্ট করে দেশে ফেরত পাঠায় তারা, লড়াই বড় একটা করে না। অতবড় দিল্লীর বাদশাহ কত সৈন্য, কামান, গোলাগুলি! পারবে কেন লড়াই করে তাদের সাথে?

—কিন্তু বীরেরা ত দেশের জন্যে লড়াই করে মরে যেতেই ভালোবাসে; তাতেই ত তাদের খুব নাম হয়।

—দূর বোকা ছেলে। লড়াইয়ে হেরে যদি দেশ চলে গেল অন্যের হাতে তবে লড়াইয়ে লাভ? বুদ্ধিমান লোক তা না করে',

কৌশল করে। বাংলা দেশের এমনি এক রাজার নাম ছিল ঈশা খাঁ। তাঁরই একটা বীরত্বের কেস্‌সা শোনাব তোমাকে।

কেস্‌সা মানে কেচ্ছা নয়, গল্প; কুৎসা নয়, শাস্তর; এ জ্ঞান কনখলের হয়েছে অনেক শুনে শুনে। সে সাগ্রহে রহমতের গা ঘেঁষে বসে বলে,—বলো রহমৎ—শিগগির।

—বলি, শোন। এখন হয়েছে কি, দু-তিন বার নানান ফন্দী-ফিকির করে ঈশা খাঁকে বশে আনতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত আকবর বাদশা সেনাপতি মানসিংকে পাঠালেন বহুৎ ফৌজ সাথে করে, গোটা বাংলা দেশ জয় করে ফেরবার জন্য। মানসিং একে ভারী জবরদস্ত জংবাজ; তাতে সঙ্গে বন্দুক-কামান-সিপাই অগুন্‌তি। ছোটখাটো রাজাদের মধ্যে অনেককে হারিয়ে দিলেন তিনি।

—তাদের রাজ্য সব আকবরের হয়ে গেল ?

—হোলো বৈকি। ঈশা খাঁর রাজত্বে পা দিয়ে মানসিং দেখেন কি, কোথাও যুদ্ধের তোড়জোড় নেই। ভারী দুর্গ খিজিরপুর—চড়াও হয়ে মানসিং দেখেন বিলকুল খালি। বারুদ, রসদ, বন্দুক—সব হাওয়া। এইভাবে লড়াই না করেই একটার পর একটা পরগনা দখল করতে করতে মানসিং তাজ্জব হয়ে ভাবলেন ব্যাপার কি, ভয়েই পালালো নাকি লোকটা !

—ঈশা খাঁ ভয়ে পালিয়ে গেলো ?

—আরে না না—শোনোই না। শেষমেশ মানসিং এগারো-সিন্দুর বলে একটা জায়গায় এসে দেখেন, দুর্গের ওপর ঈশা খাঁর নিশান উড়ছে। কাছাকাছি তাঁবু খাটিয়ে তিনি লড়ায়ের তোড়জোড় করতে লাগলেন। ওখানেই গল্প শুনলেন, তাঁর আগে আর এক সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর হাতে লড়ায়ে হেরে পালিয়েছে—ঐখানে থেকেই। গোঁফে চাড়া দিয়ে মানসিং ভাবলেন, যে আচ্ছা, দেখা যাবে। সাহাবাজ মানসিং এক চিজ্‌ নয়। এবারে বাঙালীগুলোকে কচুকাটা

করে ফিরতে হবে, মনে মনে তারই মহড়া দিতে লাগলেন সিংজী।

এখন হয়েছে কি, ঈশা খাঁ আক্রমণ করলে পাল্টা জবাব দেবেন মানসিং, এই তাঁর মতলব। কারণ তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবল বেশী, আর ঈশা খাঁর কম। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকার যুদ্ধে ঈশা খাঁ হারবেই হারবে। কাজেই ওত পেতে বসে থাকা ছাড়া মানসিং আর কিছু করলেন না।

ঠিক ঐ কথাই ভেবে নিয়েছেন ঈশা খাঁ। তাই তিনি হানা দেওয়া স্থগিত রেখে দিন গুনছেন, কিন্তু তাঁর খুদে সেনাপতিরা অস্থির হয়ে উঠেছে। বাঙালীর দলের হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা দিল্লীর ফৌজের তুলনায় অনেক নীরেস। ঈশা খাঁ বোঝেন সেটা, চেলারা বোঝে না, তারা যাহোক তাহোক একটা মারামারি কাটাকাটি করে দেশের জন্যে প্রাণ দেবে, এই তাদের মত। বীরের মত কথা ঠিকই, তবে নির্বোধ বীরের মত। প্রায় নিশ্চিত হার জেনে অত লোককে মরতে পাঠাতে গররাজী ঈশা খাঁ। তিনি সে রাত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন, কর্তব্যের ইশারা পাবার তপস্যায়। সকালে অনুচরদের ডেকে বললেন, দেখো, কাঁচা তালিমের ফৌজ নিয়ে আমি পাকা দিল্লীওয়ালাদের সাথে লড়ব না। তবে যুদ্ধ হবে। তোমরা সবুর করো, আমি মানসিং-এর কাছে দূত পাঠাচ্ছি।"

কনখল জানে, রহমতের অন্য অন্য গল্পের মতো এটাতেও শেষের দিকে গিয়ে কাঁটা দেবার মতো কিছু থাকবে—হয়ত মহৎ, হয়ত চমকপ্রদ, বা ঐরকম কিছু। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে,

—তারপর, তারপর—কি বলল গিয়ে দূত—?

—দূত কিছু বলবে কেন—ঈশা খাঁর চিঠি নিয়ে আকবরের সিপাহ্-সালারের হাতে দিলে। চিঠিতে ছিল, 'আপনি শাহানশাহ আকবরের সেনাপতি, আমি বাংলাদেশের একজন রাজা। যুদ্ধ আমাতে আপনাতে। তাই হোক্—আমি হারলে এ রাজ্য মুঘলবাদশার,

জিত্‌লে আমার। এ শর্তের খেলাপ নেই। অনর্থক কতকগুলো খুনখারাব করে লাভ কি! মানসিং ত চিঠি পড়ে অবাক! মনে মনে তারিফ করে সম্মতি দিলেন। পরদিন চাঁদপুরের কাছে মাঠে দুজনের লড়াই শুরু হোলো।

বুঝলে কনাবাবা,—একদিকে মানসিং, সুবে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, পঞ্জাব, আফগান যুদ্ধের বিজয়ী বীর—অন্য দিকে সামান্য গাঁইয়া রাজা ঈশা খাঁ। লড়াই হোলো শুরু—দুপক্ষের সৈন্যরা খালি হাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিজ নিজ সর্দারের লড়াই। ঈশা খাঁর তলোয়ার চালানোর কায়দা দেখে মুঘলবীরেরা হরবখত 'সাবাস্‌, সাবাস্‌' করতে থাকলে। হঠাৎ ঈশা খাঁর তলোয়ারের ঘায়ে মানসিং-এর খাণ্ডার দু টুক্‌রো হয়ে ভেঙে হাত থেকে পড়ে গেল। মানসিং চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কখন এইবার ঘাড়ের ওপর কোপ পড়বে বলে! কিন্তু ঈশা খাঁ কি করলেন জানো কনাবাবা? নিজের তলোয়ার তাঁর হাতে দিয়ে, আর একখানা তলোয়ার নিজের জন্যে ফরমাশ করলেন। বললেন, যদি দিল চায় তবে আজ রাত্রে বিশ্রাম করে চাঙা হয়ে ফের কাল লড়াই হতে পারে। মানসিং-এর মুখে কথা সরল না। হাত থেকে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে ঈশা খাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—ভাই, তুমি শুধু বীরই নও, তুমি মহৎ!

কনখলের গায়ে পুলক শিহরণ ওঠে। বলে,—ঈশা খাঁ ত তবে সত্যিই দয়ালু লোক। বড় লড়াই হলে কত লোক মরত, না রহমৎ?

—ঠিক্‌। আর বীরই কি কম? তলোয়ার ভেঙে যেতে মানসিং-এর গর্দান নিতে পারত, কোন দোষ হত না। কিন্তু হাতিয়ার-হীন বিপক্ষের গায়ে হাত তুলল না, রাতে আরাম করে তাজা হয়ে আবার পরদিন লড়বার সুবিধে দিতে চাইল।

কনখল মাথা নেড়ে জানায়, ঠিক মনে মনে ভাবে, বীরত্ব দেখানোর অমনি সুযোগ ও যদি একটা পেত।

নিকেলের ফাঁপা নলের ভেতর প্যাঁচানো তারের স্প্রীংএ বসানো ডোমওয়ালা মোমের শেজ্ জ্বলছিল টেব্লে। আলো কমে আসতে রহমৎ বলল,—আজ বাতি বদলায়নি দেখছি হারুণ। মার কাছে চলো কনাবাবা, আমি বাতি বদলে নিয়ে আসি।

বাইরে বারান্দায় কর্তাদের বৈঠক ভাঙেনি। ভেতর থেকে প্যারীবাবুর গিন্নীর সাথে মায়ের গল্পগুজবের আওয়াজ আসছে। কনখল বিছানায় চিত হয়ে টান টান শুয়ে ভাবতে লাগল: আচ্ছা, ঐ যে প্যারীবাবুর স্ত্রী, ও ত প্রায় আয়েষার বয়েসী কি কিছু বড় হবে। প্যারীবাবু নিজে ত বুড়ো, অর্ধেক চুল সাদা। প্যারীবাবুর ছেলে জীবন ওর গোল্লাছুট খেলার সাথী, কিন্তু বয়সে বড়ো, জীবনের নতুন-মা জীবনের থেকে কতোইবা বড়ো! অথচ কনখল শুনেছে কি পাকা কথা মেয়েটার, মার সাথে বোলচাল দেয় যেন তাঁর সমবয়েসী। দেখতে পারে না তুচক্ষে ঐ উষাটাকে কনখল। মেয়েটার নাম উষা। ঢেপ্সী, মোটা, তবে রং খুব ফরসা। হ্যাঁ, সেটা কনখল মানতে রাজী। কিন্তু কি পরিমাণ গয়না গায়ে দেয়, বাপ্রে বাপ, হাঁটে চলে কি করে? আয়েষার ত একটিও গয়না নেই, কিন্তু তার দিকে তাকালে কেউ চোখ ফেরাতে পারে? আর আয়েষার চোখ তুটো? যেন একজোড়া খঞ্জন পাখী, যেমন মিষ্টি, তেমনি চঞ্চল। বারে বারে আয়েষার কথা মনে পড়ে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ও। তুদিন আয়েষা আসেনি। কী যে রোজমেরী বিবির ইস্কুল হয়েছে, আয়েষা পণ্ডিত না হয়ে যায় না। অথচ এই ত সেদিনও আয়েষা ওর থেকে কম পড়তে জানত। কবে যে বাবা ইস্কুলে ভরতি করবেন ওকে।

বাতিদানে নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে রহমৎ ঘরে ঢোকে। এখন ত মাত্র সন্ধে পার হয়েছে। বাবা এখন টাউন হলে যাবেন। সেইটে দেশী ক্লাব। লাইব্রেরী আছে, থিয়েটরের স্টেজ আছে, তাস-পাশা-দাবা খেলার বন্দোবস্ত আছে। থিয়েটর কখনো দেখেনি কনখল! খুব ইচ্ছে করে দেখতে। শুনেছে পুজোর সময়

ফী-বছর থিয়েটার হয়, এবারও হবে। মাকে বলে কয়ে দেখতে হবে।

বাইরের বারান্দার বৈঠক ভেঙেছে। বাবা সেই কুকুরমুখো ছড়ি-হাতে এবার ক্লাবে চললেন বোধ হয়। ভেতর থেকে মা ডাকলেন,—কংখ, আয় না এদিকে। তোর মাসীমাকে দু-একখানা নতুন কলের গান শুনিয়ে দিবি আয়।

মাসীমা না হাতি। মুটকির দু পায়ে মল ঝম্‌ঝম্, দু হাতে চুড়ি ঝুন্‌ঝুন্, একগাল হাসি। বসবার ঘরে সবাই বসলে রেকর্ডের বাক্‌স খুলে কনখল ফনোগ্রাফে দম লাগায়। চোং-টা উষার দিকে মুখ করে পিন রেকর্ডে লাগিয়ে দেয়। বেদানা দাসী, না পান্নাকীর্তনউলি, কার যেন গাওয়া সেই গানটা বাজতে থাকে।

—কেন রং দিলি ঢং করে,
সাদা কাপড় রঙিয়ে দিলি পিচকিরি মেরে।
আমার কালোবরণ,
কালোবরণ- ভালবাসি,
যখন তখন তাই ত আসি,
আড়াল থেকে মুচকি হেসে
তোর পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে।

উষা মুটকিই হোক, আর জীবনের নতুন-মা-ই হউক ছেলেমানুষ। এ গান তার খুব ভালো লাগে, আবিষ্কার করেছে কনখল। 'কালোবরণ'-এর জায়গায় 'কনখলে'র দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসে। কনখল বেশ কালো,—নিকষ নয়, উজ্জ্বল শ্যাম।

৮

ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে কনখল। প্রথমদিন বাবার সাথে প্যাণ্ট কোট পরে যেতে হয়েছিল, বিরাটদাড়ী, চাপকানআঁটা, হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে; কাটাতেও হয়েছিল কিছুক্ষণ। ভর্তি হয়ে যাবার পর তিনি নিজে এসে ওকে ওদের ক্লাস দেখিয়ে ভূগোল-স্যার গোপালবাবুর সাথে পরিচয় করে দেন। গোপালবাবুই ওদের ক্লাসটিচার। ক্লাস ঘরটা স্কুলের বড় বাড়ির এক অংশে নয়। স্কুলটা মস্ত বড় হাতার মধ্যে—দক্ষিণে সুরমা নদী। উত্তরে প্রকাণ্ড একটা দীঘি, তার মাঝখানটায় টলটলে জল, কিন্তু পায়ের কাছ-বরাবর প্রায় চারদিকেই কলমি সুষনি-পানিফলের জঞ্জাল, আর সাঁপলা-পদ্মর ঘন দল। বড় বাড়িটায় সব উঁচুক্লাসের ঘর। কেবল নীচের দিকের তুটি ক্লাসের আলাদা তুখানা ঘর—টানা বারান্দা নদীর দিকে—স্কুলগেটের কাছে। ফাঁকা ময়দানের একটেরে প্যারালেল বার, হোরাইজণ্টাল বার, এইসব। কম্পাউণ্ডের ধার দিয়ে বড় বড় বাঁদরলাঠি, শিরীষ, আর ঝাউগাছের সার—তার ওপারে গীর্জার চূড়া দেখা যায়। তারও পর সাহেবদের কবরখানা, তবে স্কুল থেকে দেখা যায় না। সেখানেও কেবলি ঝাউগাছ। গীর্জা কি কবরখানা থাকলেই ঝাউগাছ থাকবে, মনে হয় কনখলের। ঢাকাতেও অমনি ছিল।

প্রথমদিন বইয়ের লিস্ট নিয়ে বাবার সাথে ফিরে আসে। পরদিন থেকে নিয়মিত ক্লাস করবে। কিন্তু স্কুলে পাঠানোর সময় তু-একদিন হারুণের সাথে পাঠানোর পরই নিভাননী বোঝেন কনখল খুশী নয়। বলেন,—কি হোলো রে? হারুণ গেলে ত

ভালো—বইগুলো নিয়ে যাবে। তা ছাড়া অতটা রাস্তা—

—ধেৎ—সব্বাই একা একা যায়, আমার লজ্জা করে।

প্যারীবাবুর ছেলে জীবন দুক্লাস ওপরে পড়ে ওর। বিদ্যাভূষণ মশায়ের অমূল্য ত রীতিমত উঁচু ক্লাসের ছেলে। একটু দূর থেকে আসে অমৃত, সেও অমূল্যর সহপাঠী। ওর সাথে পড়ে গণি মিঞার ছেলে ইকবাল। ওরা কজনে একত্র হয়ে সাড়ে নয়টায় রওনা হয় স্কুলের দিকে। কাজীর বাজার ধরে, সুরমা নদীর ধার বরাবর টাউন হল পেরিয়ে গেলেই খেলার মাঠ। তারপর গীর্জা, তার পরেই স্কুল। মাইলখানেকের নীচেই হবে। একটুও কষ্ট হয় না যেতে। বিশেষ করে কাজীর বাজারে কি কাণ্ড! কতো দোকান, কতো জিনিস। কিন্তু মুড়ি-মুড়কি কদমা-বাতাসার দোকানগুলোই সবসে সেরা! লোভ হয় সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, মিষ্টি একটা মাতা মাতা গন্ধ ওকে টানে, কিন্তু কী মৌমাছিরে বাবা! ভিন্ ভিন্ করছে। একবার হুল ফোটালেই সর্বনাশ। ঢাকায় এক মিছরি-ওয়ালার কাঠের বারকোশে হাত দিতে গিয়ে কামড় খেয়েছিল একবার, মা ছুঁচের ডগা দিয়ে ছোট্ট কালো মত একটা কাঁটা ওর আঙুল থেকে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, মৌমাছিরা কামড়ায় না, হুল ফোটায়। কী যন্ত্রণা, ভুলবে না ও কোনদিন। কিন্তু অমৃতর কি সাহস—সোজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে কোঁচড়জাত করে ফিরে আসে। দু-এক মুঠো ওকে দেয়, কোথায় লাগে রসগোল্লা ও জিনিসের কাছে। অমৃতই একটা করে পয়সা পায় স্কুলে যাবার সময়, ওদের আর কেউ এখনো পয়সাওয়ালা নয়। আর সবারই টিফিনের খাবার হয় বাড়ি থেকে যায়, না-হয় সাথে থাকে। কিন্তু টিফিন বাবদই যে ঐ এক পয়সা অমৃতর বরাদ্দ প্রত্যেক স্কুলখোলা দিনে, তা কেউ জানে না। অমৃত স্কুল যাবার পথে কোনদিন, কোনদিন স্কুল ফিরতি, মুড়ি-মুড়কি অথবা তিলের খাজা কিনে নিজে খায়, কনখলকে আর কখনো-সখনো আরও এক-আধজনকে দেয়। কনখল একদিন

বলেছিল,—তুমি যে রোজ খাওয়াও, আমি ত একদিনও পারি না। আমার যে পয়সা নেই।

—চুপ কর গাধা। বড়রাই ত ছোটদের খাওয়ায়। তুই খাওয়াবি কেন?

অমৃতর বয়স চৌদ্দ, সে আর অমূল্য সম-বয়সী।

আর একটা মজার দোকান তিলের খাজার। কি কায়দায় জ্বালদেওয়া চিনিকে ধবধবে রেশমীচুড়ির মতো জেল্লাদার করে ফেলছে লোকগুলো আর মাজা তিলের আস্তরে পরিয়ে একটার ওপর একটা খাজার পাহাড় ওঠাচ্ছে। কড়ায়ে ফুটন্ত ঘন চিনির ক্বাথ্ দিয়ে যখন নই টানে কাঠের হাতা দিয়ে, সে একটা বিচিত্র দৃশ্য। কি চটপট হাত চলে লোকগুলোর, এক সেকেণ্ড কামাই দেয় না। খাজা ছাড়াও চিনির ছড়ি, গুলাবী রেউড়ী, এইসব বানায় ওরা। খাজাওয়ালার একটা মেয়ে আছে, তার একটা পা নেই। ছোট্ট বছর চারেকের মেয়েটা ছেঁড়া চটের ওপর একধারে থাকে। ওর বাপ মাঝে মাঝে ওকে রুকমানিয়া বলে ডাকে। কনখল কাল দু দানা মুড়কি বেছে দিয়েছিল ওর হাতে, গোলগাল ময়লা হাত দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরম পরিপাটি করে ঐ দু দানা মুড়কি খেল মেয়েটা, মুখে কি মিষ্টি হাসি।

কাজীর বাজারের অফুরন্ত আকর্ষণ পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছে যায় সবাই। স্কুল বেশ লেগেছে কনখলের, কেবল অঙ্কের ক্লাস ছাড়া। মানসাঙ্কে ও খুব চটপটে, কিন্তু ক্লাসের অঙ্ক কষতে কেমন আলসেমি আসে। মানসাঙ্ক মজার খেলার মত! ড্রিল করার ঢং-এ সব ছেলে সার দিয়ে দাঁড়ায়, প্রত্যেকের পায়ের কাছে একটুকরো কাগজের চিরকুট ভাঁজ করা থাকে। মাস্টার মশায়ের আদেশে উবু হয়ে কাগজ তুলে নিতে হয়, কাগজে কতকগুলো আঁক লেখা, ওপরে নির্দেশ থাকে 'যোগ কর' কি 'বিয়োগ কর' কি 'ভাগ কর'। আর লেখা থাকে, 'সময় পাঁচ মিনিট'—কি 'তিন মিনিট'। মাস্টারমশায় ইয়া বড় ঘড়ি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলেন 'কাগজ

রাখো'। সবাই যেখানকার কাগজ আবার সেইখানে রেখে দেয়। তখন মাস্টারমশায় একটা টুলে বসে বলেন, 'নিয়ে এস'। ওরা এক এক করে নিজ নিজ কাগজ নিয়ে যায়। এই অঙ্কের খেলাতে আজ দিন চার-পাঁচের স্কুল জীবনে ওর একদিনও ভুল হয়নি। ওর সহপাঠী ইকবালের রোজ 'রং' হয়, আর দশ মিনিট নীলডাউন হয়ে থাকে। নীলডাউন হওয়া খুব কষ্টের, আর ভীষণ লজ্জার। ইকবালের লজ্জার কথা ও বুঝতে পারে না, কারণ পাজিটা উঠে এসেই খুব হাসতে থাকে। তবে কষ্টের কথাটা একদিন গোল্লাছুটের মাঠে ওর খেলার গুরু অমৃতকে জিজ্ঞেস করেছিল। অমৃত একটু উচ্চস্তরের হাসি হেসে বলেছিল,—ও আর কি, সব ঠিক করে দেবোখন।

দিয়েওছিল ঠিক করে। এক রবিবার দুপুরবেলা অমৃত এসে ডাক দিল।

—চল, দিনের বেলা ঐ কবর তিনটে দেখে আসি।

—মা যদি বকেন?

—দিনে দুপুরে গেলে বকবেন না। আর আজ ত রবিবার।

কনখল যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। শুনেছে মঙ্গলবার রাত্রে ওদিকটায় ভয়ের কিছু হয়ত আছে, কিন্তু রবিবার দুপুরে আবার কি হবে। দুজনে বেরিয়ে পড়ে। কবরগুলো ছেড়ে হাতিমারার বাবুদের পোড়ো কাছারি বাড়ি, তার পর আবার বনবাদাড়। কাছারি বাড়ির মাঠে গিয়ে অমৃত ওকে তালিম দিতে শুরু করে।

—নীলডাউন? আচ্ছা হাঁটুভেঙে বোস—না, না, গোড়ালির ওপর বসা চলবে না, খাড়া থাকবি। হ্যাঁ হয়েছে। থাক্, যতক্ষণ না আমি এক থেকে দুশো পর্যন্ত গোনা শেষ করি। হাত আমার দিকে সোজা টান করে রাখ।

ষাট পর্যন্ত গুনতেই কনখলের গা ঝিনঝিন করে। কনুয়ে, কোমরে, হাঁটুতে ভীষণ লাগছে। আর পারে না। ওর মুখ দেখে বোঝে অমৃত। বলে,—আচ্ছা, থাক। আয় একটু বেড়াই।

কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর বলে,—এইবার চেয়ার। এইটে শক্ত।

তা হোক, শিখে নে। সোজা দাঁড়া। বেশ। এইবারে মনে কর চেয়ারে বসছিস। চেয়ারে যেখানে বসবার কাঠ থাকে, হাঁটুভেঙে সেই পর্যন্ত আয়। ঠিক, হাত দুটো হাতলওয়ালা চেয়ারে যেভাবে রাখা হয়, তেমনি করে শূন্যে ভাঁজ কর। বেশ। এখন বাইরে কেউ দেখলে মনে করবে তুই আরামসে তোর বাবার চেয়ারে বসে আছিস। আছিসই ত, কেবল চেয়ারটা নেই। এটা প্রথমে পাঁচ গোনা পর্যন্ত করে শুরু কর। এক, দুই, তিন,—ওকি কাঁপছিস কেন ? —চার—পাঁচ—দূর গাধা, পড়ে গেলি ?

অমৃত এসে ওর হাত ধরে তোলে। বলে,—অমনিই লাগে প্রথম প্রথম। মাস্টাররা এক এক সময় আধঘণ্টা পর্যন্ত চেয়ারে বসিয়ে দেয়। আমি তার চেয়েও বেশী পারি। প্র্যাকটিস করে নিয়েছি।

অপরিসীম সমীহের চোখে ওকে দেখে কনখল। ওস্তাদ বটে। আধ ঘণ্টারও বেশী, মানে তিরিশ মিনিটের থেকেও -আর ওর দুই গুনতে না গুনতে চোখে সরষে ফুল ফুটে উঠেছিল। এমনি তালিমে সব ধীরে ধীরে শিখে নেয় কনখল অমৃতর কাছ থেকে। বেত খাবার সময় হাতের তেলো কি ভাবে পাততে হয়, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানোর সময় দুহাতের মুঠো শক্ত করে চিপে ধরে থাকলে পায়ের কষ্ট কম হয়, এইসব কায়দা কসরত। অমৃত বলে,—শিখে রাখা ভালো রে, জীবনভোর কত মার খেতে হবে।

অমৃত কনখলের থেকে মাত্র বছর পাঁচেকের বড়, কিন্তু এমন ভারিক্কি চালে কথাটা বলে, যেন জীবনদর্শনের সারমর্ম বুঝে নিয়েছে। কনখল ভাবে, লেখাপড়া শেখার মতো মার খাওয়াও স্কুলে ভর্তি হবার লভ্যাংশের একটি তাহলে। কিছু জিজ্ঞেস করে না, গুরুবাদী মন, যা শোনে বিশ্বাস করে। অঙ্কে ভুল না করলে, কিংবা ভালো হয়ে থাকলে মার না-ও খেতে হতে পারে, এ বোধ চট করে মনে আসে না।

খানিক পরে বাড়ি ফিরে আসে ওরা। এখনো বিকেল হয়নি, খেলুড়ের দল তখনো এসে জোটেনি, অমৃত বলে,—যা যা শেখালুম

আজকে, প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু রোজ। বেত খাওয়াটা আমি যখন থাকব তখন হবে, কিন্তু নীল্‌ডাউন, চেয়ারডাউন, এগুলো শোবার ঘরে রোজ রাত্রে বার কতক করে করবি, বুঝলি? জিম-ন্যাস্টিকের সার্ বলেন, প্র্যাকটিস মেক্‌স ম্যান পারফেক্ট। দেখিচিস আমার মাস্‌লগুলো? এ শুধু প্যারালেল বারের দয়ায়। রোজ কুড়ি মিনিট।

—ওগুলোও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

—তা জিম্ ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলেই ত পারিস। ও, না না,—ক্লাস ফাইভের আগে ত ভর্তি করবে না। তা বেশ ত, ডন-বৈঠকগুলো শুরু করে দে বাড়িতে, আমি শিখিয়ে দেব। যদি চটপট শিখে নিতে পাবিস্, বাবাকে বলে বাড়িতেই একজোড়া প্যারালেল বার বসিয়ে নিতে কতক্ষণ। উনি রাজী হবেন ত?

কনখল মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। ধরে নেয় যে, ঘোড়ায় চড়তে বাবা যখন অমত করেননি, বন্দুক ছোঁড়ার কথা শুনে বকেননি, তখন সামান্য প্যারালেল বারে আপত্তি উঠতেই পারে না।

যদিও ভরা ভাদ্র, তবু এক রাত্রে কাজীর বাজারে আগুন লাগে।

আর আগুনের সাথে যড় করেই যেন বিষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। প্যারীবাবু বলেন যে বছরের এ সময়টা, মানে পূজো পর্যন্ত সাধারণত শিলেটে পুরো বর্ষা থাকে! এ বছর কি যে হোলো।

কাজীর বাজার শিলেটের প্রাণকেন্দ্র। দোকান, পসার, দিনবাজার, গমগম করে। সেখানে আগুন লাগা মানে সোজা কথা নয়। পাকা বাড়ির সংখ্যা কম। বাঁশের বেড়া, খড়ের চালা, এই সবই বেশী। রহমৎ সকালে এসে বলে,—সব ছাই হয়ে গেছে কনাবাবা। টাউন ক্লাব, গীর্জে, আর খানকয়েক পাকা বাড়ি কোনো মতে আছে। তবু ভাগ্যি, ভালো, সামনে সুরমা

নদী, নেভানোর জলের অভাব হয়নি। আর জানো,—তোমার ইস্কুলের অমৃত, সে যে কাল কি করেছে! জল আনা, লোক টেনে বার করা, সমস্ত রাত দৈত্য-দানোর মতো খেটেছে। হ্যাঁ, গতরে তাগত আছে বটে। এইত একটু আগে ওর দাদা এসে জোর করে নিয়ে গেল। তাই কি যেতে চায়—

—কখন আগুন লাগল?

—সে অনেক রাত্রে। দুটো হবে। তোমরা সবাই ঘুমে। হারুণের ঠেলায় আমার ঘুম ভাঙল। জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি, ওদিকটা লাল হয়ে গেছে, তার সাথে ধোঁওয়া। আর বাঁশ ফাটবার কি পটাপট শব্দ। লোকের হৈ হল্লায় পাড়া সরগরম—হারুণ ত এক লাফে ছুট দিলে, আমিও খোদার নাম করে আস্তে আস্তে গেলাম এগিয়ে। আমাদের সাহেবও একবার ঘুরে এসে সাইকেল নিয়ে ডিপ্‌টি কমিশনার, পুলিস সাহেব, ওঁদের খবর দিতে ছুটলেন। পুলিসরাও কম জল ঢালেনি সারা রাত। তবে খোদা মেহেরবান—জানে মরেনি বেশী লোক।

অদম্য কৌতূহল হয় কনখলের দেখতে যাবার। নিভাননী যেন আঁচে টের পেয়ে যান। এসে বলেন,—কি হবে ওখানে এখন গিয়ে কংখ? আগুন ত নিভে গেছে। এখন সব সাফসুফ করবার পালা চলছে।

—তাহলে একবার অমৃতদের বাড়ি যাই মা?

—আচ্ছা তা যাও। রহমৎ সঙ্গে যাক। শিগগির ফিরো।

অমৃত তখন স্নান করে ফিরছে। কনখলকে দেখে ম্লান হেসে বললে,

—রুক্‌মানিয়াটা পুড়ে মরে গেছে রে।

কনখলের বুক ধ্বক্ করে ওঠে রুক্‌মানিয়া? কাল না পরশু যাকে মুড়কি খেতে দিয়েছিল? তার যে একটা পা নেই, কেউ কোলে করে তাকে বার করতে পারল না?

অমৃত যেন কনখলের মনের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়,

—ওখানে পৌঁছতেই আমার মনে হোলো ওর কথা। ওর যে

একটা পা নেই, ওকেই ত আগে বাঁচাতে হবে। গিয়ে দেখি ওদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খাজাওয়ালা কাঁদছে আর বলছে, তোমরা আমার রুকমানিয়াকে বাঁচাও বাবু, ও ঘরের মধ্যে থেকে গেছে। ঘরগুলো তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর লোকের চেঁচামেচি, বাঁশফাটার শব্দ, কে কার কথা শোনে। আমি একলাফে ঢুকে পড়লাম ঘরে। ধোঁয়ায় আর জিনিস পোড়ার গন্ধে আমার দম আটকে আস্‌ছে। খুঁজছি কোথায় রুক্‌মানিয়া, চেঁচিয়ে ডাক্‌ছি, হঠাৎ ধড়মড় করে সামনের ঘর ছুটোর চালা ভেঙে পড়ল। একটুর জন্যে গেলাম বেঁচে। পেছন থেকে রুকমানিয়ার বাবাই এসে আমাকে টেনে বার করে নিয়ে এল। বলল, তুমি ছেলেমানুষ, কেন মরতে যাচ্ছ, রাস্তায় দাঁড়াও। আমি হতভম্বের মতো রাস্তায় দাঁড়ালাম। খাজাওয়ালা একটা চাদর দিয়ে গা মাথা ঢেকে ঢুকে পড়ল আগুনের মধ্যে। মিনিটখানেক পরেই বেরিয়ে এল, কোলে রুক্‌মানিয়া চেনা যায় না, পুড়ে গেছে।

ঢোক গিল্‌তে গিলতে চোখের জল চেপে কনখল বলে,—মরে গেছে?

—না, তখনো যায়নি। সব মুখটা, চুলগুলো, আর গায়ের অর্ধেক পুড়েছে। একটা চোখ পোড়েনি, জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। আমি কাছে যেতেই ঠোঁটটা একবার নড়ল, তার পরই স্থির হয়ে গেল। ওর বাবা বলল, মরে গেল বাবু। কনা, ভাই, একটা চোখ কিন্তু খোলাই রইল। মনে হোলো যেন বলতে চায় একটু আগে এসে আমায় বাঁচালে না কেন।

রহমতের কোলে মুখ রেখে কনখল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অমৃত বলে চলল,—আমি এক ঝটকায় নিজেকে সামলে নিয়ে জল আনা জল ঢালার কাজে লেগে গেলুম। রুক্‌মানিয়ার মতো অমনি কতজন হয়তো ঘরচাপা পড়ছে, কিংবা পড়বে, যদি বাঁচানো যায়—

ছু-একদিনের দেখা রুক্‌মানিয়া, তার জন্যে কান্না কেন, বোঝে না ও। তবে পায়।

মার খাওয়া শুরু হয়ে গেল কনখলের। অমৃতই বলেছে একদিন, জীবনভোর কত মার খেতে হবে রে! হাতের মার আর আঁতের মার-এ তফাত কি, অত বোঝে না ও। বুঝতে চেষ্টাও করে না।

রহমতের হাত ধরে বাড়ি ফেরে। ছেলের মুখ দেখে শঙ্কিত হন নিভাননী। আর একবার মার কোলে মুখ গোঁজা, আর একবার ফুঁপিয়ে কাঁদা। তারপর যথানিয়ম। চান, খাওয়া—আজ স্কুল যাওয়া বারণ করে দেন হৃষীকেশ। বলেন,—বাজারের রাস্তা আনসেফ্। অন্য রাস্তা খুব ঘুর পড়বে। আজ থাক। কালকের মধ্যেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর শোনো নিভা, জাফর কিন্তু দুপুরে খাবে আজ—ও ডিউটিতে আছে বাজারে। এই ধরো একটা-দেড়টা হবে।

—আমি তাহলে একটা স্লিপ লিখে হারুণকে পাঠিয়ে দি, ও গিয়ে আয়েষা আর তার মাকে নিয়ে আসুক?

—সে ত বেশ হয়। আমি ভাবছিলুম ডাক্তার বাড়িতে খাবে না শুধু এই খবরটা ইয়ুসুফকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব—তা এ অনেক ভালো হোলো। আমি যাই—নটা-সাড়ে নটায় হ্যাসেট আসবে। ক্ষতির পরিমাণ বোধ হয় লাখ পাঁচেক টাকার হবে। সামনে পুজো, দোকানীদের ঘরভরা মাল। তা ছাড়া গুটিচারেক পাটের গুদামও গেছে—প্যারীবাবুর নতুন গুদামসুদ্ধ। সাহেবদের গুদামগুলো ত ইনসিওর করা আছে জানি, প্যারীবাবুর বৃত্তান্ত ঠিক জানা নেই। লোকও মরেছে আর পুড়েছে, তা শখানেক হবে। মেজর ক্যালামিটি।

—নতুন বৌ এসেছিল। প্যারীবাবু ত সকাল থেকেই বাজারে। তবে বৌ বলছিল, ওদের গুদাম খালিই ছিল, পাট ছিল না তাতে।

আয়েষা দুপুরে আসবে জেনে একটু উৎফুল্ল হয় কনখল। দুপুরের রান্না যে ভেতর বাড়িতে হবে, সে ত জানা কথা। তবে হয়ত মা আজ নিজেই অনেক রাঁধবেন। রান্না করার মার খুব

সখ। তা হোক। বেগুনের কাট্‌লেট খেতে আয়েষা খুব ভালোবাসে। গোল বেগুন আধাআধি করে কেটে ভেতর থেকে শাঁস বার করে মাংস পুরে ডিমের গোলা মেখে ভাজা—কনখল যায় রহমতের সন্ধানে। ব্রিঞ্জল কাট্‌লেটের ফরমাশ দিতে। জানে যে বুড়ো রহমৎ কনাবাবার অনুরোধ ঠেলবে না। আর, আয়েষা আসবে যে! ঠেললেই হোলো! তবে হ্যাঁ, মার কাছে বেগুন চাইতে হবে। মুরগী? সে ত বাবুর্চিখানায়ই আছে। সে সব রহমৎ ঠিক করে নেবে।

আয়েষার আসা হালে কমে এসেছে। বাড়ি অনেক দূর। রোজমেরী বিবির রোজ আসা সুবিধে হয় না। একা ত আর আসতে পারে না। ও যে মেয়ে। কনখল নিজে ত ছেলে তবু কবার একা যেতে পেরেছে ওদের ওখানে? কাঞ্চনকে টহল দিতে হারুণ যখন ভোরে বার করে, দু-একদিন সওয়ার হয়ে ঘুরে এসেছে। দূর বলে ওদিকে রোজ ঘোড়া নেয় না হারুণ। কাছে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। হারুণটা মতলবী—রহমতের মতো ভালো নয়। বললে সব সময় কথা রাখে না। বড়ো হোলে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে ওটাকে।

আজ আয়েষা আসবে। সব ভালো লাগতে শুরু করেছে ওর। রান্নাঘরে মার কাছে একবার ঘুরঘুর করে এল, মা তরকারি কুটতে ব্যস্ত। এদিকে রহমৎ কাজে লেগে গিয়েছে। নিজের ঘরে এসে বই-টই এক-আধটা উল্টে দেখল, ভালো লাগে না। হারুণ চিঠি নিয়ে পুলিস হাসপাতালের টিলামুখো রওনা হয়ে গেছে। ছন্‌মন্‌ করছে কনখল।

পাশেই প্যারীবাবুর বাড়ি। সেই দিকে রওনা দেয়। যাক জীবনের সাথে একটু গল্প করে আসা যাক।

জীবন স্কুলে রওনা হয়ে গেছে। তাকে ত আর তার বাবা বারণ করেননি। প্যারীবাবুও বাজার থেকে ফেরেননি। ফিরে আসছে, উষা ওকে ডাকে,

—কে, কনখল ? আয় না, গল্প করি। স্কুলে যাসনি কেন ?

—বাবা বারণ করেছেন। আর আজ আয়েষা আর তার মা, আর তার বাবা দুপুরে খাবে আমাদের বাড়ি।

উষা আয়েষার থেকে বছর তিনেকের বড়ো হতে পারে, কিন্তু বিয়ে হয়েছে তার। জীবনের অনেক রহস্য জানা হয়ে গেছে। আয়েষার উল্লেখে মুখ টিপে হাসে, বলে,—আয়েষা আসবে, খুব মজা লাগছে তোর, নারে ?

—লাগছেই ত। জানো নতুন মাসি, আয়েষাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ও আমাকে ভালোবাসে।

—কি করে বুঝলি তুই ?

—বা রে, যেদিন টিলার বাড়ি ছেড়ে এলাম, ওতে আমাতে গলা জড়িয়ে ধরে কত কাঁদলাম। আয়েষা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কতো চুমো খেল।

থাম থাম বোকা। খিলখিল হাসি চাপে মুখে আঁচল চেপে উষা। কনখলের গা ঘেঁষে এসে বসে বুকের মধ্যে ওর মাথা টেনে নিয়ে কাণে কাণে ফিসফিস করে বলে,—আমাকে যা বললি, বললি। সব জায়গায় আয়েষার তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়া, এসব বলতে যাসনে যেন। বলে, কনখলের গালটা টিপে দেয় উষা।

কনখল ভাবে মুটকিটা বলে কি ? আয়েষার সাথে ভালোবাসার কথা কে না জনে। বাবা, মা, রহমৎ, ইমাম সাহেব, সব্বাই। লুকোনোর কি আছে বোঝে না ও। গাল টিপে দেওয়াতে বিরক্ত হয়। বলে—ছাড়ো নতুন মাসি, যাই এবার।

অতর্কিতে উষা ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। ঘাড়ে, গালে, ঠোঁটে, কপালে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে। থর থর করে কাঁপছে ওর সারা গা, নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে, যেন আগুনের হলকা। কনখলের শিরায় শিরায় একটা তীব্র শিহরণ জেগে উঠলেও কেমন যেন অশুচি মনে হয় তার। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে।

নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে উষা তখনো ফুঁসছে। রোদ্দুরে ঝলমল করে ওঠা পুলিস রাইফেলের কিরীচের মতো উষার চোখের দৃষ্টি কনখলকে যেন বিঁধতে আসছে। আধখোলা শাড়ির আঁচলের ফাঁক থেকে ওর বুকের পাহাড় ছুটো মেঘনার বুকে শুশুক মাছের মতো উঠছে নামছে। ওর দিকে তাকিয়ে পুতনা রাক্ষসীর কথা মনে হয় কনখলের। অস্বস্তিকর একটা তীব্র বিস্বাদে ওর সমস্ত মন তেতো হয়ে ওঠে।

বাড়ী যাবার জন্যে দরজার চৌকাঠ পেরোতেই উষা এসে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে,—আজকের এসব আবার কাউকে বলতে যাসনে যেন, তোর আবার যেমন ঠোঁট পাতলা।

উষার আদিখ্যেতা ওর আদপেই ভালো লাগেনি, তবু বলে,—কেন, ভালোবাসার কথা বললে দোষ কি ?

—সব ভালোবাসার কথা বলতে নেই।

—আমি কারুকে কিচ্ছু লুকোই নে।

—আজকের কথাটা লুকোস্।

বলে মাথা নুইয়ে কনখলের দুই ঠোঁটে চুমো খায় উষা। চুমো খায় না ত, যেন শুষে নেয় ঠোঁটের রস। কোনো মতে নিজেকে ছাড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বাড়ী ফেরে কনখল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে উষাকে। দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে থর থর করে কাঁপছে। ঠোঁটের কোণে একরকমের হাসি ; সে হাসি ও কোনো মেয়ের মুখে আজও দেখে নি।

সদরে পৌঁছতেই জীবনের সাথে দেখা। স্কুল থেকে ফিরছে। বলে,—এই কনা, তুই স্কুলে যাস্নি ?

—না, বাবা বারণ করেছেন। তুই গেলি ত ফিরে এলি যে বড় ?

—হেডমাষ্টার ম'শায় ছুটি দিয়ে দিলেন। অর্ধেক ছেলের স্কুলে যাবার রাস্তাই ত ঐ বাজার। কেউ আসেনি।

—কাল খোলা ত ?

—হ্যাঁ। এখন কি করবি ? মারবেল খেলবি ?

কনখল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। জীবন বলে,—দাঁড়া বই রেখে আসি।

বেলা গোটা বারো নাগাদ আয়েষারা এসে পৌঁছে যায়। কনখলের স্নান হয়ে গেছে, মা বলেছেন, আয়েষারা এলেই ছোটদের আগে খাইয়ে দেবেন। বাবুর্চিখানায় রহমতের ব্রিঞ্জল কাটলেট অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে। আয়েষার হাত ধরে কনখল বাবুর্চিখানার দিকে টেনে নিয়ে যায়। গিয়েই খোঁজে কোথায় সেই পরমলোভনীয় চীনেমাটির ডোঙাটা আছে, ধবধবে সাদা ন্যাপকিন দিয়ে ঢাকা। এসব হালচাল জানা আছে রহমতের। ফোক্লা দাঁতে একগাল হেসে বুড়ো রহমৎ আয়েষাকে অভ্যর্থনা করে। বলে,—আয়েষা মা আমার বিলকুল মিসিবাবা বনে যাচ্ছে।

আজ আয়েষার পরনে কুর্তা ঘাগরা পেশোয়াজ নেই। হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, খোলাচুলে ঘাড়ের কাছে নীল রিবনের ফুল বাঁধা। আয়েষা স্মিত হাসি হেসে বলে,—চাচার চোখ ত জবর। রোজমেরী বিবির স্কুলে এম্‌নি সব পরতে হয় চাচা।

—যা মানিয়েছে—কোথায় লাগে ইংরেজ বাচ্চা। এই কনা বাবা, কি হচ্ছে, রাখো, রাখো। ভেঙে যাবে—সোভান আল্লা,—

কনখল আবিষ্কার করে ফেলেছে কাটলেটের ডোঙা। রহমৎ চট্‌পট গিয়ে সামাল করে। বলে,—সব মালুম আছে আমার। হাত দিও না, ছট্‌ফট কোরো না, খামুশ হয়ে থাকো। দিচ্ছি বার করে চাখ্‌নীর কাটলেট।

উনোনের পাশে ঢাকনা দেওয়া সস্‌প্যানের ভেতর থেকে সন্তর্পণে দুটি বেগুন বার করে ওদের হাতে দেয় রহমৎ। আয়েষা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়, ওর পায়ের কাছে ধুপ্‌ করে মাটিতে বসে কনখল লাগায় কামড়। চোখ বুঁজে বলে,—এমন আর কোনদিন হয়নি। রহমৎ আর একটা—

—খিদে মরে যাবে না? মেমসাহেব খেতে ডাকবেন এক্ষুনি। তাছাড়া গনতিতে—

কনখল হেসে ওঠে। বলে,

—তাই বুঝি ওই প্যান থেকে বেরুল ? মা'ত মাথা পিছু হুটো করে কাটলেটের বেগুন গুণে দিলেন আমার সামনে। সে গুনতির বুঝ ত তুমি ডোঙায় রেখেছ। বাড়তি বেরোল কোত্থেকে শুনি ?

. রহমৎ দাড়ি চুলকোয়, আর হাসে। মাথা গুনতির থেকে বেশী ওকে ভালোমন্দ জিনিষে করতে হয় কনখলের চাখনীর জন্য, তার জন্য বাড়তি সামগ্রী আসে কোত্থেকে সে রহমতের হাতের কস্রত ! সব কথা খুলে কি বাচ্চাদের বলা যায়।

কনখল কাটলেট খাওয়া হাত আয়েষার সুগৌর পায়ের গুলে মুছতে মুছতে বলে, –বাপরে, পা নয়ত যেন পাঁচ নম্বরী মুগুর হুটো। আমাদের জিম্‌ক্লাসে আছে। সার বলেন, ইণ্ডিয়ান ক্লাব !

কপট বিবক্তিতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আয়েষা বলে,—ভূত, করলি কি ! রোজমেবী বিবি হলে কি বলতেন জানিস ? বলতেন, 'ন'টি, ন'টি—ডার্টি হ্যাবিট'। বলে এক ঝটকায় কনখলের হাত ধরে উঠিয়ে দেয়। হুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে বাড়ীর দিকে ছুট লাগায়। বাবুর্চিখানায় রহমৎ মাথা হুলিয়ে হুলিয়ে হাসে।

ভেতরের বারান্দায় ওদেব খেতে বসিয়ে দিয়ে নিভাননী কুল্‌সম্‌ পাশে বসেন। ঠাকুরের যা দেবার দিয়ে গেছে আগেই, পরিবেশন করছেন নিভাননী। রহমৎ একটি পিরীচ ঢাকা কোয়ার্টার ডিশ সামনে রেখে যায়। আয়েষা কনখল চোখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি হাসে। কুল্‌সম্‌ বলেন,—ও কি দিদি ?

—ও তোমার মেয়ের ভোগ গো, ভোগ বোঝ তো ? আমাদের হিঁহুর বাড়ীর পূজোপার্বণে দেবদেবীকে ভোগ রেঁধে দেওয়া হয়। তোমরা আজ এখানে খেতে আসছ শুনে কনা গিয়ে রহমতের কাছে বায়না ধরেছে বেগুনের কাটলেট এর, আয়েষা নাকি খেতে ভা-রী ভালোবাসে।

কনখল কেন খামখাই লজ্জা পায় বোঝে না। ঘাড় কাত করে থাকে। আয়েষা মা-মাসীর অলক্ষ্যে চিমটি কাটে ওর উরুতে, বলে—

আমি ভালোবাসি, না ও ভালোবাসে ? বাবুর্চিখানায় গিয়ে—

এঁটো হাতেই আয়েষার হাত চেপে ধরে কনখল।

—আর তুই ? তুই খাসনি ?

এবারে মুচকি হাসির পালা মা-মাসীর। ছাড়িয়ে দিয়ে নিভাননী বলেন,—ছি কংখ, খাবার সময় অসভ্যতা করতে নেই।

ছেলের লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়া, ভালো রান্না চেখে আসা, এ সব অভ্যেস জানা আছে নিভাননীর।

পাতের প্রতিটি খাবার জিনিষ ডবল সুখাদ্য বলে মনে হয় আয়েষার। এটা ওটা চেয়ে খায়। মুখে কথার বান ছোটে। মাসীর সাথে বক বক করে যায় অনর্গল। ওদিকে কনখল মুখ গুঁজে খায়। কথা কয় না।

খাওয়া শেষ হলে নিভাননী বলেন ওদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে। বলেন,—দুপুর রোদে বেরিও না কেউ। বই পড়ো, ওয়ার্ডমেকিং খেলো।

হাত-মুখ ধুয়ে তিন লাফে কনখল নিজের ঘরে ঢোকে। পেছন পেছন আয়েষা আসে। এসেই সামনে যে বই পায় হাতে নিয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বই খোলে, পাতা ওলটায় না। ঠাট্টা করে বলে,—কনা বাবার গোসা হয়েছে বুঝি ?

কনখল কথা বলে না। পড়বার চেয়ারে বসে হাতের লেখার লম্বা বইটার পাতা ওলটায়। "খট্টা ভাঙ্গিলেই ভূমি শয্যা", "শ্রীহট্টে কমলালেবু জন্মে", "বিল্বফল পাকিলে সুরস হয়", ইত্যাদি সারগর্ভ বাক্যে মনোনিবেশ করে।

আয়েষা উঠে এসে হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে বসায়। বলে, —বোকা, আমি কি তোকে জব্দ করার জন্যে কিছু বলেছি ? রহমতের কাছ থেকে আমিও ত আগেই খেয়েছি। কিন্তু কি ভালো রে তুই কনা, আমি ভালোবাসি বলে ঐ রান্নার কথা তুই বলেছিলি ? তোর মত আমার কথা কেউ ভাবে না ভাই।

কনখলের সব রাগ গলে জল হয়ে যায়। আয়েষার পায়ের

বুড়ো আঙুলটা মট্‌কে দিতে দিতে বলে,—তোর কি কি ভালো লাগে আমি সব জানি। খালি বেগুনের কাটলেট কেন,—পনীর দিয়ে নোস্তা বিস্কুট, চামচে করে কণ্ডেন্‌সড্‌ মিল্ক, তেঁতুলকাশন, রুটির পায়েস—সব মনে আছে আমার।

বড় বড় চোখ টান করে বোকা বোকা ভাবে আয়েষা বলে,—আচ্ছা গাধা ত তুই। লুকিয়ে কামরাঙা খাওয়া, বন্দুক দিয়ে হরিয়াল মারা, বাটি চাপা দিয়ে টাকী মাছ ধরা, কেউ বাড়ী ছাড়লে কেঁদে ভাসানো—এগুলো বুঝি ভালো লাগে না আমার?

কনখল বোঝে, আয়েষা ঠাট্টা করছে। গায়ে মাখে না। বলে,—ধেৎ, ও ত সব অন্য কথা।

—আর, আর একজন কি ভালোবাসে, জানিস?

—না ত—

কনাবাবা ভালোবাসে আয়েষাকে। বুঝলি হনুমান? বিশ্বাস না হয় সুধিয়ে আয় মাসীমাকে।

বলে কনখলের চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দেয় আয়েষা।

কনখল ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। কি যেন বলি বলি করে ঠোঁটদুটি, কথা ফোটে না। চোখ ভরে জল আসে কেন, বুঝতে পারে না। আজই খানিক আগে আর একজন যে ওকে দলে কচ্‌লে আর এক রকম সুখের জ্বালা ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, ভুলে যায় তার দাহ। পরম নির্ভয়ে আয়েষার কোলে মুখ গুঁজে থাকে, চোখের জলে আয়েষার জামা ভিজে যায়। আয়েষা ওর গায়ে পিঠে হাত বুলোয়, আর বলে,—কি উজবুক রে তুই! আস্ত-গাধা একটা। এই বাঁদর, ওঠ্‌, ওঠ্‌—

নাকের দু পাশ দিয়ে আয়েষার দু'গালে জলের ধারা চিক চিক ক'রে গড়িয়ে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আয়েষা বলে,—কংখ, কংখ—কনাভাই

দরজার পাশে চাপাহাসির শব্দে চমকে ওঠে দুজন। মুখে কাপড় গুঁজে মুটকি উষা হাসির হুল্লোড় থামাতে না পেরে আথালি পাথালি

করছে। দুলে দুলে উঠছে ওর গা বুক ঢেউ খাওয়া জেলে ডিঙির মতন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছে,—মা গো! কোথায় যাব গো! উজ্‌বুক, বাঁদর, গাধা! কি মিষ্টি ডাক—মা গো! খুব দেখালি যা হোক্ তোরা দুটিতে! থাক থাক—ভয়ের কিছু নেই। আমি কারুকে বলতে যাব না। ভাব কর দুটিতে বসে—

শেষের দিকের কথা ক'টিতে সোহাগ ঢেলে দেয় উষা। কনখলের দিকে তীব্র চোখে একবার তাকায়, যেন দাগ টেনে দেয় 'আমি কারুকে বলব না' কথাটার নীচ দিয়ে। তারপর, আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে কনখল।

—ওই জীবনের নতুন মা-টাকে আমি আচ্ছা ল্যাং কস্‌ব। দেব আলপিন ফুটিয়ে ওর ফুলো ফুলো গায়ে। পাজির পা ঝাড়া ওটা—

কনখলের হঠাৎ তিড়বিড় করে ওঠার কারণ বোঝে না আয়েষা, বলে,—কি হোলো রে? খাম্‌খা রেগে যাচ্ছিস্ কেন?

—তুই জানিস্ না আয়েষা—ওটা পাজি। আজই সকালে—

থতমত খেয়ে থেমে যায় কনখল। উষা বলেছিল, 'আজকের কথাটা লুকোস্।' বলবে? বলবে ও আয়েষাকে সব কথা?

আয়েষার নিষ্পাপ সাদা মনে কালীর আঁচড় না পড়লেও বুদ্ধিমতী মেয়ে বোঝে, কনখল যে কোন কারণেই হোক ঐ উষা সম্বন্ধে একটা কিছু বলতে গিয়ে দোনামনা করছে। চাপ দেয় না, কিন্তু ধ্বক করে বুকে আঘাত লাগে কনখল ওকেও বলতে পারছে না, কি সে কথা, সেইটে জানবার জন্যে।

সেদিন বেলা শেষে, বিকেলে চা'য়ের পর আয়েষা সমেত জাফর দম্পতি যখন বিদায় নেন, তার মধ্যেই রুক্‌মানিয়া উষার সকল কাহিনী আয়েষার জানা হয়ে যায়।

৯

পরদিন স্কুলে যাবার পথে কাজীর বাজার হয়ে যায় ছেলের দল। অমৃত দেখায়,—এই দেখ, এইখানটায় মিংড' সাহেব,—ঐ যেরে খাসিয়া পাদ্রী,—মার্ক লিখিত মথি লিখিত সুসমাচার বেচত। এইটে ত বিন্দেবন সা'র কাপড়ের গদি। ও দিকটা মেছোবাজার, ফাঁকামেলা, ওদিকে পুড়বার কিছু নেই। এই দেখ দুটো তিনটে মুদিদোকান, একেবারে গেছে। তারপরই ঝগড়ুর দোকান। ওই দেখ, ভেতরের মেটে ঘর দুটোর কিচ্ছু চিহ্ন নেই দেয়াল চারখানা ছাড়া। ওরই ভেতরেরটায় রুক্‌মানিয়া আট্‌কা পড়েছিল। এই ত, এইখানটায় আমি এনে নামালুম।

ছেলের দল মহোৎসাহে ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে এটা ওটা, যেমন পুড়ে যাওয়া কলের লাটিমের টুকরো, উড্‌ পেন্সিলের বাণ্ডিলের অক্ষত অংশ, এই সব আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কনখল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খাজাওয়ালার ঘরের সামনে।

অমৃত একটু অপেক্ষা করে বলে,—চল্‌রে ক্লাস বসে যাবে।

—রুক্‌মানিয়াটা কথাও বলতে পারত না ভালো করে, না রে অমৃত ?

—আধআধ বলত। তিনচার বছরের বাচ্চা ত।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কনখল। থামাতে পারে না, বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল ঝরঝর করে পড়ে চোখ থেকে।

কনখল দুরন্ত নয়, ফুর্তিবাজ। আজকে কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে রইল সারাক্ষণ। অন্য ছেলেদের কলকাকলীতে আদৌ যোগ দিতে পারল না। অমূল্য বলছিল,—ছাই জানিস তোরা। প্রকাশদাদের

দলের নিবারণকে চিনিস ? তার ছোট ভাই রাখহরি কলেজে পাখা টানে। সে নাকি কাকে বলেছে যে কাজীর বাজারের আগুন স্বদেশীরাই লাগিয়েছে। এবারে পূজোয় দোকানে দোকানে দেদার বিলিতী মালের আমদানি। কাপড়চোপড়, খেলনা, এইসব। দোকানদারদের হাতজোড় করে আগে থাকতেই কত বলেছে বিলিতী জিনিষ না আনতে, ওরা শোনে নি। তাই তাক্ বুঝে দিয়েছে—বলে ফাঁকা হাতে দেশলাই জ্বালবার ভঙ্গি করে দেখায় অমূল্য।

কনখল কান খাড়া করে শোনে। কাল দুপুরে ডাক্তার জাফর আর বাবা যখন খেতে বসেন, তখন এই ধরনের কথা ওঁদের আলাপের মধ্যে শুনেছে কনখল। ছেলেদের কথায় যোগ দেয় না ও, কিন্তু অমৃতকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করে,—শুনছিস্ কি বলছে ওরা ?

—সব বাজে কথা। আমি ত সারাক্ষণ আগুন নেভানোতে ছিলাম। প্রকাশদাদের দল প্রাণ তুচ্ছ করে কাল যা করেছে, তার তুলনা হয় না। প্রকাশদা নিজে ত হাসপাতালে। বিন্দাবন সা'র দোতলায় উঠেছিল মেয়েদের বাঁচাতে, জ্বলন্ত কড়ি ভেঙে পড়েছে ওর কাঁধে। বাঁ দিকের ঘাড় আর হাত দুইই পুড়ে গেছে—হাতটা ভেঙেওছে। ওদের ফক্কুড়ি কথায় কান দিস্‌নে। লোকের বিপদে আপদে ওরাই এগিয়ে এসে বুক পেতে দেয় সবার আগে, আর ওরা লাগাবে বাজারে আগুন ? যাতে হাজার হাজার লোকের অনিষ্ট হোলো আর কতোজন মারা গেল ? ফুঃ !

উড়িয়ে দেয় এমনিভাবে কানগুজবি কথা অমৃত।

কনখল কথার জবাব দেয় না, কিন্তু মন থেকে উড়িয়েও দিতে পারে না একথা অসার গুজব বলে। কাল শুনেছে জাফর ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন যে পুলিস সাহেব বিশেষ করে প্রকাশের উল্লেখই করেছেন এই অগ্নিকাণ্ডের কর্মকর্তা হিসেবে। বলেছেন নাকি যে 'হিজ বন্দে মাতরম্ গ্যাং ইজ অ্যাট দি রুট'। এও বলেছেন যে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তের কথা তিনি ভাবছেন, তবে প্রকাশ

হাসপাতাল থেকে না বেরোলে কিছু করা হবে না। খবরও পেয়েছেন সৎলোকের কাছে, তবে, সে বিশেষ গোপন ব্যাপার।

প্রকাশ বোস ওদের থেকে অনেক বড়। মুরারীচাঁদ কলেজের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র। স্থানীয় গীতা সোসাইটির মেম্বর। কিন্তু প্রকাশের নাম ডাক খেলায়। টাউন ক্লাবের ফুটবল ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন, কলেজের সেক্রেটারী। তাছাড়া সবরকম আর্তত্রাণের কাজে অগ্রণী। ওদের গীতা সোসাইটির বড় কাজই হোলো লোকসেবা। ওরা সব স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, ধর্মের বই পড়ে, শরীরচর্চা করে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, যাই হোক না কেন, ওরা বেরিয়ে পড়ে ওদের সেবাদল নিয়ে। সরকারী মহলেও তার জন্যে তারিফ পেয়েছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ওদের সৎ কাজের জন্য লাটের সার্টিফিকেট পেয়েছে। বাবাদের বৈঠকের নানা আলোচনায় কনখল এসব জেনেছে। হরেন চাকী, উকীল, ওদের লাঠিখেলার এলেম দেখে বলেন, ডাকাতরে বাবা! প্যারীবাবুর তৃতীয় পক্ষের বিয়ের সময় ওরা রুখে উঠেছিল, কিন্তু সীতানাথ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। তবে প্যারীবাবু যে ওদের ওপর প্রসন্ন নন, সে তাঁর হাবভাবে বোঝা যায়, মুখে তিনি কিছু বলেন না। চাপা মানুষ। কেবল বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন, ওরাই দেশের আশা ভরসা। জুলাই মাসে কলকাতার ফুটবল খেলায় মোহনবাগান বলে একটা দল দুর্ধর্ষ গোরা ফৌজের দলকে হারিয়ে দিয়েছিল যখন, শিলেটেও একটা খেলায় টাউন ক্লাব দল পুলিসের দলকে হারিয়ে দেয়। পুলিসের দলে তিনটে সাহেব খেলোয়াড় ছিল। কনখল দেখেছে সে খেলা। খেলার কিছু ভালো করে বোঝেনি, তবে প্রকাশ একাই তিনটে গোল দিয়েছিল, দেখেছে। আর দেখেছে খেলা ভাঙার পর মাঠ ভরা লোককে প্রকাশকে মাথায় তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে। হেরে গেলে ত পুলিসের রাগ হবারই কথা। তাই পুলিসসাহেব ওর ওপর চটা, মনে হয় কনখলের।

কিন্তু সে যাই হোক্, অমৃতর কথা শোনবার পর ও বুঝতে

পারে না, যে লোক নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না রেখে আগুন থেকে লোক বাঁচাতে যায়, সে-ই আগুন লাগাবে কেন? সে ত বীর, বীরেরা কখনো চুরি করে আগুন লাগিয়ে রুক্‌মানিয়ার মতো অসহায় ছোট্ট মেয়েকে মেরে ফেলতে পারে? প্রকাশদা নিশ্চয়ই নয়, তবে সত্যিই যে বা যারা এই খারাপ কাজ করেছে, তাদের সম্বন্ধে মন বিষিয়ে ওঠে ওর। ও যদি বড় হত, আর গায়ে অনেক জোর থাকত, দেখে নিত সেইসব ভীরু বদমায়েসগুলোকে। রুক্‌মানিয়া! একটা পা ছিল না তার! ভালো করে কথাও বলতে শেখেনি! আবার চোখ ছল ছল করে ওঠে কনখলের।

স্কুল পৌঁছে যায় ছেলের দল। সেখানে গিয়ে দল ভেঙে যায়, যে যার নিজ নিজ ক্লাসে গিয়ে বসে। পড়াশুনা তেমন জমে না, বাজারে আগুনের গল্পই চলে। টিফিনের আগের পিরিয়ডে ভূগোল স্যার গোপালবাবু ম্যাপ দেখতে চান, কদিন আগেই টাস্ক্‌ দেওয়া ছিল বাড়ী থেকে এঁকে আনবার। সব ছেলে না আনলেও কয়েকজন এনেছিল, কনখল শেষের দলে। ওর ম্যাপ দেখে গোপালবাবু বললেন,—ইষ্টার্ন বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম—বেশ হয়েছে। সুরমা থেকে ব্রহ্মপুত্রের নীল দাগ মোটা হবে। প্রথমত ওটা নদ, আর তা ছাড়া অনেক বড়ো। মণিপুরের জায়গায় রং না দিয়ে সাদা দেখিয়েছ কেন?

—ওটা ত স্বাধীন, মানে করদ রাজ্য—তাই,—

—ঠিক ঠিক। আচ্ছা যাও, বোসো।

তারপর অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন গোপালবাবুও। বলেন,—এই ছ্যাখো, এত বড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল তোমাদের চোখের সামনে। এর থেকে কি কি জানতে পারলে তোমরা, কি কি শিখলে? প্রথম, ভাবো আগুন লাগল কেমন করে। নিশ্চয় অসাবধানী কেউ রাত্রে তামাক খেয়ে পাটগাদা কিম্বা বাঁশখড়ের কাছাকাছি কল্কে উপুড় করে রেখেছিল, অথবা কেরোসিনের কুপি উল্টে গিয়েছিল—এমনিই হবে একটা কিছু। একজনের সামান্য

ভুলে কতলোকের সর্বনাশ হয়ে গেল। তাহলে বুঝলে—যা থেকে বিপদ আসতে পারে এমন জিনিষ অত্যন্ত সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। তোমরা ছোট ছেলে, তোমাদের হয়ত আগুন নিয়ে কারবার নেই। কিন্তু মনে রেখো, কালীপূজার সময় বাজী পোড়ানোর কথা, জান ত, তখনো এমনি কত কাণ্ড হয়। 'আগুন নিয়ে খেলা' গুরুজনদের বারণ—তার মানে এ নয় যে, আগুন ছোঁবে না। অসাবধান ব্যবহারে আগুন যে ভয়াবহ অনিষ্ট করতে পারে, তারই সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

এতখানি জ্ঞানগর্ভ কথা বলে গোপালবাবু দম নেন। ছেলেরা পুরো না বুঝলেও মোটামুটি মর্ম গ্রহণ করতে পারে। কনখল মনে মনে জোর আশ্বাস পায়, যদি এইভাবেই আগুন লেগে থাকে, তবে ত প্রকাশদাদের সম্বন্ধে যা শুনেছে সব মিথ্যে হতে পারে। হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই তাই। নইলে তাঁর মতো অমন দয়ালু, আর বীর।

যেন ওর মনের কথা টেনে নিয়ে গোপালবাবু বলেন,—দুর্ঘটনা ত ঘটে গেল। কিন্তু তার থেকে দেখ, আমরা পরিচয় পেলাম কয়েকটি আসল মানুষের। যারা নিজের প্রাণের মায়া না করে অন্যের উপকারে এগিয়ে আসে, অসহায়কে বাঁচাতে গিয়ে ফলাফল না ভেবে বিপদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমনি সব ছেলের। তারা আমাদেরি নিজেদের জন বলে গর্ব অনুভব করি। বীরত্ব সব সময় পূজার জিনিষ, তার সাথে যদি দয়া মিশে যায়, তবে তাকেই বলি মহত্ত্ব। আমাদের প্রকাশ, অমৃত এইসব ছেলেরা মহৎ কাজ করেছে শুনেছ বোধ হয়—

অনেক ছেলে মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, শুনেছে।

—বীরের জাতিভেদ নেই। যে বিপন্ন, সে বড়ই হোক্, ছোটই হোক্, ধনী হোক্, গরীব হোক্, এসব বিচার না করে তাকে উদ্ধার করাই সাহসীর কাজ। আমি শুনেছি অমৃত একটি পঙ্গু শিশুকে বাঁচাতে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু পারেনি—কিন্তু ফল দিয়ে বীরত্বের

পরিমাণ মাপা যায় না। সে যে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, তাই সে বীর। ওকি, কনখল, তুমি কাঁদছ ?

ডেস্কে মাথা গুজে কনখল ফোঁপাচ্ছিল। পেছন থেকে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলল,—ওটা ঝগড়ু খাজাওয়ালার মেয়ে সার্। স্কুল আসবার পথে কনখলরা ওকে মুড়কি খেতে দিত। মেয়েটার একটা পা কাটা ছিল। ছোট্ট মেয়ে সার্, তিন চার বছর বয়স হবে।

গোপালবাবুর বক্তৃতায় ছেদ পড়ল। ছোট্ট একটি হুম্ বলে টেবিল ছেড়ে বারান্দায় পায়চারি করে এলেন একবার। ফিরে এসে কনখলের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন,—বি ব্রেভ্ মাই বয় !

তারপর ক্লাসকে বললেন,—যাও, ছুটি। ডিসপার্স। ফিরে কনখলকে বললেন,—বি এ ম্যান।

ম্যান ? কনখল ভাবে একদিন হ্যাসেট সাহেব পোলো খেলার মাঠে ইয়ং ম্যান বলেছিলেন। গোপালবাবুও বলেছেন, বি এ ম্যান। ম্যান মানে লম্বা চৌড়া জোয়ান, না বুকে সাহসভরা মানুষ ? প্রকাশদাদের মতো গায়ে জোরওয়ালা মানুষ ও নয়, অমৃতর মতোও নয়। কিন্তু গায়ের জোরে না পারুক, বুকের সাহসে ওদের থেকে পিছিয়ে থকবে না ও। মনে মনে সঙ্কল্প করে কনখল।

টিফিনের সময় হারুণের আনা ফল, রুটি, দুধ অমৃতর সাথে ভাগ করে খাবে বলে তাকে খোঁজে। প্যারালেল বারে এম্‌নি এম্‌নি কসরত করছিল অমৃত। ডাক দিতে বলল,—আজ কেন রে ? আজ ত আমার টিফিনের একপয়সা মজুত আছে, খরচ হয়নি।

—তা থাক্, খা তুই।

অমৃত রুটি আলুর দম আর একটা কলা খায়। বলে,—ভালোই হোলো। যাবার সময় বুড়োর দাড়ি খাওয়া যাবে।

বুড়োর দাড়ি মানে সোহনপাপ্‌ড়ি। স্কুল গেটে গুলাবছড়িওয়ালা বসে, তার কাছে সোহনপাপ্‌ড়িও থাকে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ীর কাছে এসে অমৃত বলল,—আজ আর আমি খেলতে আসব না রে। প্রকাশদাকে দেখতে যাব।

—আমিও যাব।

—তবে মাকে বলে রাখিস। আমি এই এলাম বলে।

সদর হাসপাতালের ডাক্তার চেনেন কনখলকে। বাগ্‌চিদের বাড়ীতে তাঁর যাওয়া আসা আছে। প্রকাশকে দেখবার কোন অসুবিধা হয় না।

হাতে, কাঁধে, পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রকাশ খুশী হয় ওদের দেখে। অমৃতকে চেনে সে, কিন্তু কনখল নতুন। জিজ্ঞেস করে,—এ ছেলেটি কেরে অমৃত ?

—বাগ্‌চি সাহেবের ছেলে, ওদের বাড়ীতেই ত আমরা খেলি।

পরিচয় করিয়ে দেয়। ওযে খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারে, গোল্লাছুটও শিখে উঠলো বলে, ওর বাবাকে বলে বাড়ীতেই প্যারালেল বার বসাবে, এসব তথ্য জানা হয়ে যায় প্রকাশের। চারটে পাখী একফায়ারে মেরেছে, এ গল্প বহমতের কাছে অমৃত শুনেছে। কিন্তু কনখল স্বীকার করেনি, বলেছে সে গৌরব প্রাপ্য আয়েষার। এসব অন্তরঙ্গ কথাও প্রকাশের কাছে বলে ফেলে অমৃত।

প্রকাশ প্রাণখোলা হাসি হেসে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বলে,—বটে! তাহলে তুই ত একটা মরদ কা বাচ্চা! আমি ভালো হয়ে উঠি, তখন ভাব করব তোর সাথে।

কনখল উল্লসিত হয়ে ওঠে। এ তার কাছে অসামান্য সম্মান বলে মনে হয়। প্রকাশদা একজন বীরপুরুষ, তাঁর সাথে ভাব হওয়া কি সহজ কথা। কনখল ভয়ে ভয়ে বলে,—আমি আপনার কাছে তা হলে ফুটবল খেলা শিখব। আসল ফুটবল।

ন্যাকড়ার ফালির, বাতাবি লেবুর, পুরোনো টেনিস বলের ফুটবল ওরা খেলেছে। সে হোলো খেলার ফুটবল, ফুটবল খেলা নয়।

—সে ত বেশ হবে। শিখিয়ে পড়িয়ে একটা চিল্‌ড্রেনস্‌ ইলেভেন্‌ বানিয়ে নেব। দাঁড়া ভালো হয়ে উঠি আগে। হ্যাঁরে অমৃত, ওদিকের খবর কি ? বিন্দাবনের মা আর বৌ বেঁচেছে ত ?

—বাঁচবে না। তুমি নিজেই বাঁচালে ওদের। তোমার কিছু

মনে নেই। ওদের নিয়ে যখন তুমি একতলায় নেমেছ, ছোটকোঠার কড়ি ভেঙে পড়ল তোমার ঘাড়ে। সিঁড়ির রেলিংয়ের জন্য বেঁচে গেলে, কড়িটা তাতে আট্‌কে গেল। সবটা চাপ তোমার ওপর পড়লে ত গুঁড়ো হয়ে যেতে। ওরা দুজন ছিল তোমার বগলদাবা। হাত থেকে ছিটকে ওরা গড়িয়ে গেল একটু দূরে, অন্য ছেলেরা সরিয়ে নিল ওদের। আশ্চর্য জানো, ওরা পোড়েওনি।

—যাক, তা হলেই হোলো। ওরা ভালো থাকলেই ভালো। আমার কাঁধ ত দুদিনেই সেরে যাবে। আচ্ছা আগুন লাগল কি করে খোঁজ পেলি কিছু!

—না। আমাদের গোপালবাবু, ভূগোল মাষ্টার গোপালবাবুর ধারণা যে কেরোসিনের কুপি বা তামাকের কল্কে উল্টে গিয়ে পাটগাদায় পড়ে, তার থেকে ছড়িয়েছে চার দিকে। আমারও মনে হয় অম্‌নি কিছু হবে।

—পাটগাদার কথা বলেছেন গোপালবাবু? উনি কি কিছু শুনেছেন?

—কৈ তা ত বললেন না। শোনেননি কিছু নিশ্চয়, অনুমান বলেই মনে হয়। কনখল নিজে শুনেছে গোপালবাবুর কথা—ঠিক্ কি বললেন রে তিনি?

—ঐ রকম একটা কিছু হবে বলে তাঁর মনে হয়। খবর কিছু পাননি। আমাদের বলেছিলেন যে অসাবধান হলে কত কি হতে পারে।

প্রকাশ যেন আশা করছিল আগুন লাগার কারণ বিষয়ে ওরা আরো সঠিক খবর কিছু দিতে পারবে। তা না পারায় একটু ক্ষুণ্ণ হলো বলেই মনে হলো। কনখল ভাবছিল নিবারণের ভাই রাখুর রটানো গুজব, আর ডাক্তার জাফরের খবর, সব বলবে কিনা। প্রকাশকে ওর এত ভালো লেগে গেছে যে খবরটা না বলা অন্যায় মনে হতে লাগল। কপটতা ওর মধ্যে আসেনি, গোপন করতে কিছু চায় না। কিন্তু দ্বিধা একটা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে যে অমৃতর

সামনে সরকারী সন্দেহের কথা ফাঁস করবে কিনা। বাবা অসন্তুষ্ট হতে পারেন একথাও ভাবছে সে।

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে মনে মনে ঠিক করে ফেলে, যে মাকে আগে সব বলে, মা যদি বারণ না করেন, তবে প্রকাশের কানে ও সব কথা তুলবে। তার আগে নয়।

আরো অনেক শুভার্থী ধীরে ধীরে আসছে দেখে প্রকাশ বলে,—কনখল, অমৃত,—তোরা যা এবার, খেলগে যা। সময় পেলে কাল আসিস। আমার খুব ভালো লাগবে।

চলে আসে দুজন বাড়ীর সামনের খেলার মাঠে। গোল্লাছুট খেলা শুরু হয়ে গেছে। ওরাও গিয়ে যোগ দেয়।

খেলার শেষে ছাপছন্দ হয়ে কনখল যখন নিজের ঘরে যায়, ভাবতে ভাবতে যায় মাকে কোন ফাঁকে কথাটা বলবে। মা-ত এখন বাইরের আসরের জন্য চা করতে ব্যস্ত। হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ মশায়কে দেখা যায়, কিন্তু প্যারীবাবু নেই। অল্পক্ষণ পরেই ঘোড়ার পায়ের টগ্‌বগ্ শব্দে সবাই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, সাহেব পাড়ার দিক থেকে প্যারীবাবুর একঘোড়ার বেরুশগাড়ী বাড়ী ফিরছে। ভেতরে প্যারীবাবু বসা, চোগা, চাপকান, মাথায় শামলা। সঙ্গে, কনখল অবাক হয়ে দেখে তাদেরই স্কুলের নতুন থার্ড মাষ্টার বিপিনবাবু। তাঁর পরনেও ইজের কোট, মাথায় ল্যাজঝোলা বাঁধা পাগ্‌ড়ী।

বাবা বলেন,—ভর সন্ধেয় ওঁরা দুজন কোন রাজকর্ম সেরে আসছেন?

বিদ্যাভূষণ বলেন,—যোগাযোগ ভালো ঠেকছে না হে বাগ্‌চি। দরবারী বেশে প্যারীবাবু, সঙ্গে বিপিন কার্লাইল, কোন ছেলের আবার কি সর্বনাশ করে এল কে জানে।

হরেন চাকী ম'শায় বলেন,—বিপিন কার্লাইল? সঙ্গের নতুন লোকটা? ওকে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

—কারণ, দেখনি। হপ্তা দুয়েক আগে শিলচর থেকে বদলী

হয়ে এসেছে। সেখানকার স্কুলে পর পর জনাদশেক ছেলে স্বদেশী বলে গ্রেপ্তার হবার পর সরকার আর ওর ওখানে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করেননি। ডবল প্রমোশন দিয়ে বদলী করে এনেছেন এখানে। শোনা যায় যে শীগ্‌গীরই 'রায় সাহেব' টাইটেল পাবে।

—ওঃ, তাই! কার্লাইল সারকুলারের ভগ্নদূত! তা ওর সঙ্গে রসরাজ কেন?

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবার পর থেকে হরেনবাবু 'রসরাজ' নাম দিয়েছেন প্যারীবাবুর। বিদ্যাভূষণ কল্কেয় ফুঁ দিয়ে হুঁকো টানতে থাকেন, জবাব দেন না। বাবা একটা নতুন চুরুট ধরান। কনখল এইসব দুর্বোধ্য কথার মানে বোঝে না। কিন্তু যখন যেটা মাথায় আসে, তার সমাধান না করে তৃপ্তি পায় না। ছোটে রান্নাঘরে মায়ের কাছে।

—আচ্ছা মা, কার্লাইল সারকুলার কি?

মা চা ঢালছিলেন। পেয়ালাকটা কাঠের চৌকো থালা ন্যাপ্‌কিন দিয়ে মুড়ে তার ওপর বসিয়ে, ঠাকুরকে বললেন বাইরে দিয়ে আসতে। কয়েক প্লেট মুগের পুলি পিঠেও দেখা গেল। কনখল যদিও স্কুলফেরত এসে একবার খেয়েছিল, তবুও হাত পেতে বসে মায়ের কাছে। মা হেসে ওর হাতে দুটো পুলি দেন।

—হঠাৎ ও জিনিষ জানার তোর শখ্ কেন রে কংখ?

কনখল বিপিন মাষ্টার ও প্যারীবাবুর গাড়ী চড়ে ফেরার গল্প বলে। বিদ্যাভূষণ মশায়ের শিলচরের ছেলে গ্রেপ্তার হবার উল্লেখও করতে ভোলে না। মা গম্ভীর হয়ে যান। ভাবেন, যতদিন ছেলে আঁচলের আড়ালে ছিল, সব জিনিষ জানবার, বোঝবার, ওর দরকার হয়নি। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হবার পর কত ছেলের, কত লোকের সংস্পর্শে আসছে, আরো আসতে হবেও। এখন ছেলেকে রইয়ে সইয়ে জানতে দিতে হবে অনেক কিছু। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা বলেন,—কার্লাইল সারকুলার হোলো ছেলেরা যাতে স্বদেশীতে মেতে পড়াশুনা নষ্ট না করে, সেই সম্বন্ধে সাবধানী হুকুম। ঐ নামের

সাহেব শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তা কিনা, হুকুম নামায় তাঁর দস্তখৎ আছে। ছেলেরা যদি মাষ্টারমশায়দের কথা না শোনে, বারণ সত্ত্বেও স্বদেশীতে মেতে যায়, তাহলে মাষ্টারদের ওপরও হুকুম দেওয়া আছে, তাঁরা সে সব ছেলের নাম বলে দেবেন সরকারকে। ওই বিপিন মাষ্টার তোদের পড়ায় নাকি ?

—না, উনি ত উঁচু ক্লাসে পড়ান।

—ওর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ পরিচয় করার দরকার নেই। যখন এত জানবার আগ্রহ তোর, তবে জেনে রাখ, আর একটা অমনি হুকুম আছে। সেটা রাস্তাঘাটে যখন তখন 'বন্দেমাতরম্' না বলবার। সেটার নাম লায়ন সারকুলার।

—বন্দেমাতরম্ ত সবাই বলে। ও কথার মানে কি মা ?

—মানে 'মাকে পুজা করি'।

—তাহলে ওতে দোষের কি হোলো ?

—সে তুই বুঝবি নে। আরো বড় হ, আরো লেখাপড়া শেখ, বুঝিয়ে দেব। তবে এখন এইটুকু জেনে রাখিস, যে সব লোকেরা সাহেবদের গায়ে বোমা ছুঁড়ে মারছে, বিলিতী নুন, বিলিতী কাপড় জোর করে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তারা সবাই 'বন্দেমাতরম্' বলে। কথাটার এমনি মানে ত ভালো, কিন্তু দোষের কাজ যারা করছে, তারা বলে, তাই কথাটাই দোষের হয়ে গেছে। তুই ত অনেক গল্পের বই পড়েছিস। জানিস নে, আমাদের দেশে আগেকার দিনের ডাকাতের দল খুব কালীভক্ত ছিল। ডাকাতি করতে যাবার সময় 'জয় মা কালী' বলে হুঙ্কার ছেড়ে বেরোত।

—জানি, জানি, রঘু ডাকাত। কিন্তু সে ত খালি দুষ্টু বড়লোকের বাড়ীতেই ডাকাতি করত। আর সব টাকাকড়ি বিলিয়ে দিত গরীবদের।

—তাহলেও ডাকাতি ত আর ভালো কাজ নয়।

বলে কথায় ছেদ টানেন নিভাননী। প্রসঙ্গ বাড়াতে দেন না। বলেন,—সন্ধে হোলো। এইবারে পড়াশুনা। কেমন ?

ঘাড় নেড়ে উঠে আসে কনখল। মনে অনেক সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। কিন্তু বন্দেমাতরম আর জয় মা কালী, দুইদলের কারুকেই খারাপ মনে হয় না ওর।

বাইরের বারান্দায় প্যারীবাবু এসে গেছেন। কিন্তু কান পেতে শুনে আশ্চর্য হয় কনখল, বাবা, হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ মশায়, কেউ বিপিনবাবু সম্বন্ধে একটিও উচ্চবাচ্য করছেন না। প্যারীবাবু নিজেই বলে চলেছেন,

—পঞ্চাশ হাজারের নীচে হবে না। সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। মাল খালাস করে ব্যাপারীদের নৌকো এখনো বিদেয় হয়নি, এরই মধ্যে কি ঘটে গেল!

—অত পাট ছিল আপনার গুদামে?

—ছিলই ত। কাল সমস্ত দিন হিসেবপত্র কষে দেখলুম।

—গুদাম ইন্‌সিওর করা ছিল ত?

—ছিল ভগবানের কৃপায়। কিন্তু সেও অল্প টাকার। মাত্র ত্রিশ হাজারের। তাহলেও দেখুন হাজার বিশেক ক্ষতি। ধনে প্রাণে যাকে বলে গেলুম এবার। কিন্তু করবই বা কি? পুলিশকে জানিয়ে রাখা ছাড়া করবার আছেই বা কি?

হরেন চাকী বলেন,—অর্থহানি হেলো অবশ্য, কিন্তু প্রাণের আবার কি হোলো মশায়? বেশ ত বহাল তবিয়তে আছেন—

—আরে মশায়, ক্ষতির পরিমাণটা একবার ভাবুন। বিশ হাজার টাকা, এ ক্ষতি সামলে উঠতেই ত জান কাবার হয়ে যাবে। আর এই বুড়োবয়সে—

বিদ্যাভূষণ মুখে আঙুল দিয়ে সতর্জনে বলেন,—চুপ্‌ চুপ্‌। সহধর্মিণী হয় ত পাশের ঘরেই আছেন, প্রায়ই আসেন কি না। আপনার মতো যুবক যদি সামান্য অর্থক্ষতিতে নিজের বয়স বাড়িয়ে বলে,—

একটা হাসির গুঞ্জন ওঠে।

কনখল এসব রহস্য বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সহজ বুদ্ধিতে

এইটুকু বোঝে যে প্যারীবাবুর গুদামের পাট পুড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু, তবে যে মা সেদিন বাবাকে বলছিলেন, নতুন মাসী বলেছে ওদের গুদামে একটুও পাট ছিল না? সেই আগুন লাগবার পরদিন, যেদিন আয়েষারা খেতে এলো দুপুরে? কনখলের ধারণা হোলো, মুটকিটা শুধু পাজীই নয়, মিথ্যেবাদীও। গালটিপে দেবার জন্য, আদিখ্যেতা করার জন্য, মনটা বেজার হয়েছিল উষার ওপর। না জেনে শুনে বাজে কথা বলার জন্য আরও বিরূপ হয়। মা, মাসী বলতে যে শ্রদ্ধার ভাব উদয় হয় ওর মনে, উষা সম্পর্কে সে ভাব আদৌ স্থান পায় না। তাচ্ছিল্যের, অবজ্ঞার, ভয়ের সাথে একটা চাঞ্চল্যকর আকর্ষণ জাগে। দুচক্ষে ওকে দেখতে পারে না। কিন্তু চোখ বুজলে বিভীষিকার মতো ওর উপস্থিতি আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

রাত্রে খাবার পর বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না ওর। মণিপুরী খেশ্ বুক পর্যন্ত টেনে চোখ বুজে ভাবতে থাকে। এই দুদিনের নানা ঘটনায় ওর জগৎ কতো খাটো হয়ে এসেছে। যতদিন বেশী কাউকে চেনেনি, জানেনি, বেশী কিছু বোঝেনি, অনেক বেশী বড়ো ছিল ওর জগৎ। বিরাট আকাশ, উদার মাঠ, বিস্তৃত হাওড়, অফুরন্ত রেললাইন, অন্তহীন নদী। দূর, দূর, দূর—যতদূর চোখ যায়—সীমা নেই, শেষ নেই। কত দুরাশায় মন ভরে থেকেছে। আলেয়া কি পথ দেখিয়ে হাওড় পার করে দেবে? কাঞ্চনসওয়ারী হয়ে কি মাঠের ওপারে পৌঁছনো যাবে? জঙ্গলের শেষ কোথায়? একটার পর একটা—তার পর আর একটা—আরো, আরো, কত গাছ! রেলগাড়ী যদি আর সামনের ষ্টেশন বলে কোনো জায়গায় নাই থামে, মেঘনার বুকে ষ্টীমার যদি আর কোনদিন পার খুঁজে না পায়—তাহলে চলা শেষ হবে কোথায়? শেষ খুঁজে না পাওয়ার চলার জগতে ওর মনে কেবলি গুণ গুণ করে গান বেজেছে—কি আনন্দ, কি আনন্দ!

জগৎ খাটো হয়ে এল। জগৎ থেকে শহর, শহর থেকে বাড়ী,

বাড়ীর থেকে ঘর, ঘরের ভেতর মশারী। লেপ কম্বল মুড়ি দিলে মশারীর মধ্যেও ঘর। ভিড় করে আয়েষা, উষা, অমৃত, প্রকাশ, রুক্মানিয়া, প্যারীবাবু, বিপিন কার্লাইল, কাজীর বাজার, পাটের গুদাম,---সব ঢুকেছে এসে লেপ কম্বলের মধ্যে। অসোয়াস্তীতে ছট্‌ফট্‌ করছে ও।

কিন্তু না, পরিত্রাণ আছে। মা'র মুখ, আয়েষার চোখ। আর আর সব সুখের জ্বালা, দুঃখের দাহ, উত্তেজনা, অবসাদ। মিলিয়ে যায়। স্মরণ আচ্ছন্ন হয়ে জাগতে থাকে, মা'র মুখ, আয়েষার চোখ। ঘুম আসে আস্তে, নিশ্চিন্ত, পরমনির্ভর, অন্তরঙ্গ, পরিবেশে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে কনখল।

ঘুমের রাজ্যে আবার অবাধ বিচরণ। মন-সওয়ারী হয়ে এক লহমায় যেখানে খুশী চলে যায়, কোথাও প্রবেশ নিষেধ নেই, বাধা-বন্ধন নেই, নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব বিহার। যেন ওর সত্যিকার-এর জীবন এই স্বপ্নের দেশে জেগে উঠে সুরু হয়। বরফ ঢাকা বিরাট পাহাড় মাঝে মাঝে সামনে পড়ে, কিন্তু ওর পায়ের ছোঁওয়া লাগতেই বরফ গলে জল হয়ে পাহাড় মিলিয়ে যায়।

১০

সকালে উঠে প্রথম কথা মনে হয়, ডাক্তার জাফরের খবর আর রাখুর গুজব—মাকে বলে অনুমতি নিতে হবে, প্রকাশদাকে জানাবার। বিপিনবাবুর প্যারীবাবুর সাথে পুলিশ সাহেবের কাছে যাবার অর্থ কিছু বোঝেনি, মার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় কথাবার্তা বলার পর মনে হয়েছে তার সাথে এসবের যোগাযোগ থাকতেও পারে।

সকালের ছোট হাজিরা রহমতের এলাকায়। খানা কামরায় মা তখনো একা বসে কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বাবা সাইকেল করে বেরিয়ে গেছেন। সেদিন রবিবার।

কনখল মাকে সব খুলে বলে। মা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিবারণের ভাই রাখুর রটনা তিনি কিছু শোনেননি আগে, তবে জাফরের কথা ত নিজকানেই শুনেছেন।

—নিবারণ কি করে রে ?

আমাদের স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ওরা খুব গরীব কিনা, তাই ওর ভাই কলেজে পাখা টানে। নিবারণ পড়াশুনায় খুব ভালো, ওর মাইনে লাগে না। সংস্কৃত নাকি খুব ভালো জানে, পণ্ডিতমশায়ের মতো সংস্কৃতে কথা বলতে পারে। অমৃত বলে, যে ও সুর করে ওদের সভায় "গীতা" বলে একটা বই পড়ে যায়, শুনতে খুব মিষ্টি লাগে।

—ওদের আবার সভা কিরে ?

—ঐ যে প্রকাশদার গীতা সোসাইটি।

—হুঁ। বলে মা চুপ করে যান। ছেলে ধীরে ধীরে এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে, একটুও ভালো লাগে না তাঁর। দিনকাল

ভালো নয়, স্বামী চাকুরে। ভয় পান না নিভাননী, ভাবিতা হন। মুখে বলেন,—প্রকাশকে বলবার মতো কি খবর তুই জানিস্, যে বলতে চাস্?

—ঠিক যা শুনেছি। আর মা, বিপিনবাবুর কথাও বলব ত?

—বলতে চাস, বলিস। কিন্তু কংখ, তুই ওদের সাথে বেশী মেলামেশা করিস নি, বাবা খুশী হবেন না।

বাবা যাতে অ-খুশী হবেন, এমন কাজ কনখল করবে না, এ বিশ্বাস আছে নিভাননীর। ছেলেকে চিনছেন তিনি রোজ নতুন করে। জোর করে, অবুঝের মতো বাধা দিয়ে কি ভয় দেখিয়ে, থামানো যাবেও না তাকে, উচিতও হবে না। তাই বুঝেছেন, বোকা নিষেধের নিগড় দিয়ে বাঁধতে গেলে শিশুমন তলে তলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। উঠতি মনের ছেলের সাহচর্য গোঁয়ারতুমি আর গুরুগিরি দিয়ে বজায় রাখা যাবে না, ভাবেন তিনি। তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

—হাসপাতালে যাবি ত প্রকাশকে দেখতে? তখন কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে যাস্। আহা বেচারা, কত কষ্ট পাচ্ছে খাওয়াদাওয়ার। কি বিশ্রী খেতে দেয় ঐ হাসপাতালগুলোতে।

আনন্দে কনখল লাফাতে থাকে। বলে,—তুমি কি ভালো মা! কি খুশীই হবেন প্রকাশ দা। আর দেখ, ফলমিষ্টি কিন্তু আমিই হাতে করে নেব—হারুণকে নিয়ে যাব না। বুঝলে? বীর প্রকাশকে ফল উপহার দেবার গৌরবে ভাগীদার চায় না ওর মন।

—বুঝেচি। নিস্। আজ ত রবিবার, হাসপাতালে যাওয়া সেই বিকেলে। ভাবছি দুপুরে যাব গণিমিঞার বাড়ী। ওঁর স্ত্রী, আর মেয়ে ইভা, একদিন দুপুরে এসে গেছেন। যাবি তুই?

—যাবই ত। ইকবাল ত আমাদের সাথে পড়ে। খুব নিরীহ, মিনমিনে ছেলেটা। খালি পড়ে—একটুও খেলতে চায় না।

গণিমিঞারা পাশের বাড়ীর বড়লোক। গোঁড়া মুসলমান।

মস্ত সিংদরজাওয়ালা বাড়ী, সামনের দিকে ফুলবাগান। আসল বাড়ীর বাইরে বিলিতী কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা, ভেতরের দিকটা হারেমের মতো নিশ্ছিদ্র। খুব ছোট ছোট জানলা প্রায় ছাদ ঘেঁসা, বাইরে থেকে এই শুধু দেখা যায়। তখনকার জমানায় সাহেবসুবোর সাথে মিলমিশ করবার রেওয়াজ পড়ে গেছে, তাই বাড়ীর মেয়েরা ভরদুপুরে আপাদমস্তক বোরখা ঢেকে পাশের বাড়ী আসতে সাহস পাচ্ছেন। তবু, হাজারো আবরু রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিন্দুকের জিভ্ ঠাণ্ডা নেই। সব তাতেই তারা মানে খুঁজে বার করে। গণিমিঞার বাড়ীর জেনানা, পাশের প্যারীবাবুর বাসায় জন্মেও পা দেন নি, কিন্তু বাগ্চি যে হাকিম,—সাহেব লোক—তাই তার ওখানে আসতে কসুর করেনি! এ নিন্দায় যে সত্য আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

সে যা হোক, তখনকার মতো কনখলের কাজ হাঁসিল হয়েছে—সে ফুর্তির সাথে ফেরে নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ বসে বই নাড়াচাড়া করে, ভালো লাগে না। কখন বিকেল হবে, হাসপাতালে যাওয়া যাবে তারই জল্পনায় মেতে থাকে। খানিক পরে উঠে বাবুর্চিখানার দিকে যায়।

রহমৎ একরাশ ছুরি, কাঁটা, চামচ ছাই রংয়ের কি যেন মেখে গাদা করে রেখেছে। একটা রোগা-পট্কা ছোঁড়া, গায়ে ভূষো উড়ছে, কপালের একদিকে কাটা দাগ—বসে বসে চাম্চে, কাঁটা, ঝাড়ন দিয়ে ঘসে রূপোর মতো ঝক্ঝকে করছে। রহমৎ বাবার ক্ষুর ধারদেবার জিনিষটার মতো একটা সরু পাটায় সাঁ সাঁ করে ছুরিগুলো বুলোচ্ছে। তারপর ওই ছোঁড়াটার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে সাফ্ করবার জন্যে। ছোট্ট বাঁশের মোড়া একটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলে,

—বইঠ্ যাও কনাবাবা। বোসো। দেখ, কেমন হাতিয়ার সাফ্ হচ্ছে।

তা, হাতিয়ার ত বটেই। হাত দিয়ে ঐ ছুরি ধরে মাংসের

কাট্‌লেট কেটে কাঁটা বিঁধিয়ে মুখে তুলে দেওয়া—গ্র্যাণ্ড। তলোয়ার দিয়ে কাটা' হয় জ্যান্ত মানুষ যুদ্ধের সময়, আর এই ছুরিতে রান্না মাংস,—খাবার সময়।

ছোঁড়াটাকে ভালো করে দেখছে কনখল। জানে, ও বাড়ীর পেছনেই পুকুরের ওপারে থাকে ওর মার সাথে। ওর নাম ব্যাঙা। কিন্তু ভাব হয়নি এখনো। ও পারতপক্ষে সামনেই আসে না। ওর মাকেও দেখেছে কাঠকুটো কুড়োতে, শুনেছে মেমের আর বাচ্চাদের কবরে রোজ চেরাগ জ্বালা ওর কাজ, মিশন থেকে তার জন্যে পয়সা পায়। খবর সরবরাহক হয় রহমৎ, নয় হারুণ।

ব্যাঙার কাজ শেষ হয়ে যেতে, ও যাবার জন্য ওঠে। কনখলও সাথে সাথে উঠে আসে। ব্যাঙার কুণ্ঠিত ভাব কাটাতে বড় জোর দশ মিনিট লাগে ওর। তার পর দু'জনে দুজনার গলায় হাত দিয়ে বাড়ীর পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা যায়, দুজনে পুকুর ঘাটে সিমেণ্টের বেঞ্চির ওপর বসে পরম আনন্দে পেয়ারা চিবুচ্ছে। ওর অনেক খবর নিয়ে নিয়েছে কনখল। ওর বাবার কথা শুনে ত মোহিত হয়ে গেছে।

ওর বাবা এখন বাড়ীতে নেই, জেলে আছে। মাঝে মাঝেই যায়, আবার ফিরে আসে। এজন্যে ওরা কেউ কিছু ভাবে না। গেরস্ত বাড়ীর এটা, ওটা, প্রায়ই খাবার জিনিষ, কি ছেঁড়া জামা কাপড়, না বলে নিয়ে নেয় ওর বাবা। সেও খুব অভাবে পড়লে। চোর বলে ধরা পড়লে হেসে বলে, আরে আমার নেই, ঠেকা,—ওদের ঢের আছে। নিয়েছি ত, কি হয়েছে? ওরা কি গরীব হয়ে যাবে, না আমি বড়লোক হব? ব্যাঙা, ব্যাঙার মাকে নিয়ে আজ আমার ঘরে খাবার কিছু নেই, তাই ত নিয়েছি। না হক্ চোর বলছ কেন? কাজকর্ম দাও, খেতে দাও, পরতে দাও,—নেব না কিছু।

কিন্তু কাজ কেউ দ্যায় না, খেতেও ছায় না। ধরে পুলিশে

দ্যায়। ব্যাঙার বাবা কাটিয়ে আসে সরকারী অতিথশালে দিন-কতক। মিছে কথা কয় না। ফিরে এসে আবার কাজ খোঁজে। জেল ফেরৎ দাগী চোরকে কে দেবে কাজ ? কেউ ছায় না। ছায় বকুনী, আর সদুপদেশ। দুটোর একটাতেও পেট-ভরে না।

ব্যাঙার কাছে আরও শোনে কনখল, ডাক্তার সাহেবের মেম এই তলাওয়ে ঝাঁপ দেবার পর, জাল না আসা পর্যন্ত ওর বাবা ডুব সাঁতার দিয়ে ঝাড়া দুঘণ্টা খুকী দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। পারেনি, শুধু মেমসাহেবের ঘাগরা ধরে পাড়ে টেনে এনেছিল। তবুও ডাক্তার সাহেব ওকে বকশিস করেছিলেন। কাজও দিয়েছিলেন আস্তাবল সাফ্ করবার, টম্‌টম্ ধোওয়া মোছার। মাইনে অল্প ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না তখন। খিদ্‌মৎগারের সাথে ভাব করে বাবুর্চি-খানা থেকে ঝরতি পরতি এটা সেটা খাবার জিনিষ সংগ্রহ করত। বেশ সুখে ছিল ব্যাঙারা তখন। এর ওর জিনিষ না বলে নেবার দরকার হয়নি ওর বাবার। তার পর, ডাক্তার সাহেব চলে যেতে ওর কাজও গেল, আবার অভাবে পড়ল। আবার সুরু হোলো হাতটানের কসরৎ।

কনখল ভেবে ঠিক করে, ওর বাবার কিছু দোষ নেই। সব দোষ লোকেদের। কেন ওকে কাজ দেবে না, খেতে দেবে না ? কাজ চাইলে বলবে দাগীকে বিশ্বাস কি, আর ক্ষিদের জ্বালায় কিছু নিলেই বলবে, চুরী করল ! ও মনস্থির করে ফেলে, ব্যাঙার বাবা ফিরলেই নিভাননীকে বলে একটা কাজ দেবার ব্যবস্থা করবে। ওদের টম্‌টম্ নেই বটে, কিন্তু ঘোড়া আছে, আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ বাইরের জমাদার করে, সেই কাজ করবে ব্যাঙার বাবা।

হঠাৎ ব্যাঙা কনখলের মুখে হাত চাপা দিয়ে ঝাঁকড়া আম-গাছটার মগডালের দিকে আঙুল দেখায়। কানে কানে ফিস্‌ফিস করে বলে;—চু-উ-প।

মগডালে কি যেন পাখীর ঝট্‌পটানি শোনা যায়। ঘন পাতার আড়াল বলে দেখা যায় না। তাকিয়ে দেখে, ব্যাঙা কাঠবেড়ালীর

মতো স্বচ্ছন্দে তরতর করে গাছে উঠ্ছে। বড়ো বড়ো চোখ করে কনখল তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নেমে আসে ব্যাঙা। আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরেছে দুটো পাখীর চার পা, পাখী দুটো উল্টে, বেঁকিয়ে ঠুক্রে দিচ্ছে ওর হাতখানা। ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হাতে গাছের গা জড়িয়ে ধরে ধরে নেমে ধুপ্ করে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে। ছুটে যায় কনখল মহা উল্লাসে। ও কিছু প্রশ্ন করার আগেই ব্যাঙা বলে,—দুটো কোকিল। এই কুচ্কুচে কালোটা মদ্দা—কী মিষ্টি আওয়াজ করে 'কু' 'কু' করে, আর দ্যাখ, বোকার মত চোখ করে তাকিয়ে আছে খালি। আর ওই ফুট্‌ফুট্ দাগ গায়ে—এটা মাদী। এর গলায় গান নেই, কিন্তু ঠোক্‌রাতে ওস্তাদ। দেখ্লি ত, এই দুমিনিটের মধ্যে আমার হাতটা কি করে দিল কামড়ে?

বলে ব্যাঙা কালো পাখীটার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। আর মাদীটার পিঠে আস্তে আস্তে চড় মারে। বলে,—আজ দুদিন আগে থেকে আঠা করে রেখেছিলাম মগডালে। কদিন থেকে দেখছি রোজ দুটিতে এসে বসে। বর্ষার কোকিল ত, বাসা বাঁধার ফিকিরে ঘোরে, বেশী উড়ে বেড়াতে পছন্দ করে না। পর পর দুদিন আসা দেখেই ধরে নিলাম এই জায়গাটা ওদের পছন্দ হয়েছে। তার পর, অনেকটা কাঁঠালের আঠা ওদের বসবার জায়গা দিয়ে পুরু করে মেখে রাখলাম। আজ বাছাধনেরা ধরা পড়েছে।

—ব্যাঙা ভাই, চল্, মাকে দেখিয়ে আসি।

ব্যাঙার সরল মুখে বিষাদের ছায়া নামে। বলে,—যদি রাগ করেন?

—রাগ করবেন কেন রে? খুশী হবেন পাখী দেখে।

না পাখী দেখে নয়—এই, এই,—তোর সাথে আমার ভাব হয়েছে দেখে যদি বকেন? আমার বাবা চোর কিনা—তাই—

কনখল খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে,—তুই মাকে চিনিস্

না।. আর খিদের জন্যে খাবার জিনিষ নিলে বুঝি চোর হয়?

—সবাই যে বলে, না বলে নিলে হয়।

—তাহলে ত আমিও চোর। কতদিন মাকে না বলে টিন থেকে বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। তুই বড় বাজে বকিস্ ব্যাঙা, চল্ চল্—

ব্যাঙার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাড়ীতে ঝড়ের মতো ঢোকে কনখল।

—মা, মা, দেখবে এস—

নিভাননী রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্যাঙার হাতে পাখী, আর কনখলের হাতে ব্যাঙার আর এক হাত ধরা. দুজনে এসে মার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। অনর্গল বকবক করে যায় কনখল,—সে তুমি বুঝবে না মা, হেই—ওই উঁচুতে।. কাঠবেড়ালীর মতো উঠে গেল, নেমে এল পাখী হাতে। কি সাহস —ঠুক্‌রে হাত রক্তারক্তি করে দিয়েছে মাদীপাখীটা, তাই কি ছেড়েছে ও? কালোটা পুরুষ—খুব ভালো গান করে মা; কোকিল পাখী খুব ভালো পাখী—না মা?

নিভাননী মুখ টিপে হাসেন। বলেন,

—কিন্তু ছেলেটার হাত যে খুব জখম হয়েছে। ঠাকুর, দুটো গাঁদা পাতা এনে ধুয়ে থেঁৎলে দাও ত শিলে। ধুয়ে নাও শিলটা, মরীচবাঁটা না থাকে যেন—তোকে ত আমি চিনিরে। কি নাম যেন তোর—ব্যাঙা, না? জটিবুড়ির ছেলে তুই?

ব্যাঙা ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। ওর মার নাম জটিলা, জটিবুড়ি বলে পাড়ার লোক। নিভাননী জানেন ওদের ইতিহাস। কিন্তু ওরাও কোনদিন সাহস করে তাঁর কাছে আসেনি, ওঁরও ডাকবার দরকার হয়নি। পাখীধরার ওস্তাদিতে ও যে ছেলের মন জয় করেছে, বুঝতে দেরী হয় না বুদ্ধিমতী নিভাননীর। ছ্যাঁচা গাঁদাপাতা সস্নেহে ব্যাঙার হাতে লাগিয়ে ফর্সা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন। উঠোনে পলোচাপা দেওয়া থাক পাখী দুটো। বলেন, —দাঁড়া ব্যাঙা, যাস্‌নে। কিছু খেয়ে যাবি, বোস্।

ব্যাঙার চোখ ভরে যায় জলে। কোথায় বকুনী খাবে, ভয় পেয়েছে, পাচ্ছে খাবার জিনিষ। হাতের ব্যথা ও থোড়াই কেয়ার করে, কিন্তু আর যেন কোথায় খচ্ করে ব্যথা লাগে ওর। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে।

কনখল বলে,—খুব লাগছে হাতে, নারে ? ভাবিস না গাঁদাপাতা খুব ভালো জিনিষ—চট্ করে সেরে যাবে। আমার ত কেটে গেলেই লাগাই।

ব্যাঙা সামলে নিয়ে হাসে। জানায়, যে হাতের ব্যথায় ওর কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না।

নিভাননী বাটিতে করে মুড়ি নারকোল দেন খেতে। যদিও স্নান খাবারদাবার সময়—তবুও কনখল ছাড়ে না। ওকেও দিতে হয় ছোট এক বাটি। দুজনে দাওয়ায় বসে মুড়ি খায়, নিভাননী পাশে বসেন। বলেন,—পাখী দুটোর গতি কি হবে, বল এখন।

—কেন, পুষব।

—বনের পাখী, খাঁচায় পুষে কদ্দিন বাঁচিয়ে রাখবি ? দুদিনে মনমরা হয়ে মরে যাবে। তার চেয়ে আমি বলি কি, ওদের ছেড়ে দিই। আবার উড়ে গাছে গিয়ে বসুক, গান করুক,—সেই ভালো, নারে ?

কনখল রাজী হতে চায় না, কিন্তু ব্যাঙার আপত্তি নেই। ও ত ধরবার আনন্দ ষোল আনা পেয়েছে, পোষবার ঝকমারীতে গিয়ে কি হবে।

কনখলকে বোঝান নিভাননী। কত হরেক রকম পাখী গাছে গাছে। কত নানা সুরে গান করে, শীষ দেয়। মানুষ কি পারে সব ধরে ধরে খাঁচায় পুরে পুষতে ? তার চেয়ে পাখার যেখানে নিজের জায়গা, আকাশের কোল, গাছের ডাল,—সেইখানেই ওদের ছেড়ে দেওয়া ভালো।

কনখলের মন নরম হয়ে আসে। বুঝুক, না বুঝুক, মার কথায় আর আপত্তি করে না। শিশুমনে আর এক দুষ্টবুদ্ধি উঁকি দেয়।

মাকে যদি পাখী ছাড়তে রাজী হয়ে খুসী করে দেওয়া যায়, তবে জেল থেকে ফিরলে ব্যাঙার বাবাকে কাজ দিতে রাজী করানো সহজ হবে। না পুষে পাখী ছেড়ে দেওয়া তার ইচ্ছে নয়, অথচ অন্য কাজ হাসিল করবার জন্য তাতে রাজী হতে হবে, এ মতলবের কপটতার দিক তার মনে আসেনি, সে শুধু ভেবেছে, মাকে খুশী রাখতে হবে। মা খুশী থাকলে ও যা চাইবে, তাই পাবে। কাজেই ঘাড় নাড়ে কনখল।

—তবে দাও মা ছেড়ে, কিন্তু,—

উসখুস করে কনখল। নিভাননী ছেলের ধাত জানেন। বদলে একটা কিছু চায় সে, বুঝতে দেরী হয় না তাঁর।

—কিন্তু কিরে? পাখী ছেড়ে দেব, তাতে আর কিন্তু কি? ঠাকুর, তেলের বাটিটা দাও তো।

পলোর ভেতর থেকে একটা করে পাখী ধরে পায়ের কাঁঠালের আঠা তেল দিয়ে তুলে দেন। তারপর হুস করে উড়িয়ে দেন পাখী দুটোকে। ব্যাঙা, কনখল, দুজনে চেয়ে থাকে উড়ন্ত পাখীর দিকে। কনখল বলে,—যদি আবার ঐ আঠামাখানো ডালে বসে, তবে তো আটকে থাকবে।

—তাই কখনো বসে? একবার যেখানে ধরা পড়েছে, মরলেও ওরা আর ওখানে যাবে না। আমি কত পাখী ধরেছি, এসব আমি খুব জানি। ওরা এবারে অনেক দূরে, আর এক গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে।

ব্যাঙার মুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিভাননী এক ফালি কুমড়ো আর দুটো বেগুন, আর ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে চারটি মুসুরী ডাল, ব্যাঙার হাতে দিয়ে বলেন,—তোর মাকে দিস।

সাহেব ডাক্তারের সময় এই রান্নাবাড়ীটার এক ঘরে মিসি-বাবাদের আয়া থাকত, সেটা এখন ভাঁড়ার ঘর হয়েছে। আর যে ঘরটায় খালি তোরঙ্গ, প্যাক বাক্স, এইসব দিয়ে জাঁতিয়ে রাখা হয়েছিল, সেইটেতে উনুন ফুটিয়ে হেঁসেল বানানো হয়েছে। সামনে

টানা বারান্দা, বেশ রোদ পড়ে। পিছন দিকে পুকুর।

খিড়কি দিয়ে পুকুরে যাবার রাস্তায় ছুটো জোয়ান ছাগল বাচ্চা মুখোমুখী হয়ে সামনের ছু-পা তুলে তালঠুকে শিং গুঁতোগুঁতির খেলা খেলছিল। একটারও শিং ওঠেনি—কপালে কপাল লাগিয়ে মাঝে মাঝে বেশ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকছে। কনখল বেশ কিছুক্ষণ দেখে, আপন মনেই বলে,—ধ্যেৎ, এতো আপোষে লড়াই। এই কেলেটা, দেনা ওটাকে গুঁতিয়ে বেড়াঠাসা করে।

বাচ্চা ছুটোর মা একটু দূরে নিবিষ্ট মনে ঘাস খেয়ে যাচ্ছিল, ওদের খেলার দিকে মোটেই নজর দেবার দরকার মনে করে নি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে ঘাস চিবোতে চিবোতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে, যেন বাড়াবাড়ি কিছু না হয়, খেয়াল রাখবার জন্যে। ওখানকার ঘাসের স্বাদ আর হয়তো ভালো লাগল না, এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে। বাচ্চা ছুটোও লড়াই বন্ধ করে ছুট দিল মায়ের পিছে।

ব্যাঙা চলে গেছে। কনখল উঠে মায়ের হাত ধরে বলে,—ঘরে চলো।

নিভাননী ঘরেই যাচ্ছিলেন। কনখলের হাত ধরে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেন,—কি যেন বলবি মনে হচ্ছে, কংখ?

—আচ্ছা মা, ওই ব্যাঙার বাবার তো খুব সাহস, তবে লোকে ওকে চোর বলে কেন? সাহেব ডাক্তারের মেমকে ছুঘণ্টা ডুব সাঁতার দিয়ে তুলেছে, ও তো বীরেরই কাজ করেছে; না, মা?

—তা করেছে বৈ কি।

—ওদের খাবার থাকে না, তাই অন্যেরটা নিয়ে খায়। কাজ থাকলেই খাবার থাকে, তবে ওর কাজ নেই কেন মা?

—ও যে চুরি করে, তাই ওকে কেউ কাজ দেয় না।

—কাজ না থাকলে খাবার জন্যে চুরি করতে হয়, আবার চুরি করলে কেউ কাজ দেবে না, তবে কি ব্যাঙার বাবা শুধুই জেলে যাবে আর চুরি করবে, ভেবে কিনারা করে উঠতে পারে না কনখল।

বলে,—ডাক্তার সাহেব ওকে আস্তাবল সাফ্ করবার কাজ দিয়েছিলেন, তখন ও চুরি করেনি। এবার জেল থেকে ফিরলে ওকে ওই কাজ দিও মা, তাহলে ও আর চুরি করবে না। ওর বাবা চোর বলে ব্যাঙা প্রথমে আমার সাথে আসতেই চায় না। কাজ হলে ব্যাঙার আর লজ্জা করবে না। ব্যাঙা খুব ভালো ছেলে মা।

নিভাননীর মায়ের মন। ছোট ছেলে ভালো ছাড়া আর কিছু হবে ভাবতে চান না তিনি। বলেন,—আমার তো বেশ ভালো লাগল ছেলেটাকে। চালাকচতুর, চটপটে। চামচে, পীরিচ সাফ করার কাজে ওকে নিতে রহমতকে বলে দিয়েছি তো সেদিন। ওর মার হাতে মাসে দুটাকা দেব, বলেও দিয়েছি। করছে না সে কাজ?

—করছেই তো! মা, তুমি কি লক্ষ্মী। তবে ওর বাবা এলে তাকেও একটা কাজ দিও—তখন আর কেউ চোর বলতে পারবে না ওদের। খুব মজা হবে তাহলে, ও মন খুলে খেলতে পারবে আমার সাথে। কেউ কিচ্ছু বোঝে না! খিদে পেলে খাবার জিনিষ নিলে কেউ নাকি চোর হয়! তাহলে তো আমিও চোর—

বলেই জিভ কাটে। মার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। তারপর লাফাতে লাফাতে সরে পড়ে।

বিকেল হবার আগেই অস্বস্তি সুরু হয়।

—এখনো হল না, মা? ঐ তো দুটি ফল, আর কিছু খাবার—দাও না চট করে গুছিয়ে। আবার ঢের লোক এসে গেলে আমার লজ্জা করবে, দিতে পারব না তখন।

—উতলা হোসনি কংখ—অমৃতই তো এখনো আসেনি। এই হলো বলে—

মা একটি ছোট বিস্কুটের টিনে কমল পিঠে পাটিসাপটা আর চিনিতে জ্বাল দেওয়া টিকলি গুছিয়ে দেন। ঝাড়নে বেঁধে দেন গুটিকয় আপেল আঙুর বেদানা। আরো খানিকক্ষণ দাফাদাফি করবার পর অমৃত এলে দুজনে বীরপূজার ভোগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিভাননী ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে গৃহকর্মে মন দেন।

রোগীর সাথে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছয় ওরা। কনখল ডাক্তারের চেনা বলে ছাড় পেয়ে যায়। প্রকাশকে খাবার জিনিষ খুলে সাজিয়ে দিতে আনন্দে মুখ তার ভরে ওঠে। কনখলকে যেন আজ আবার নতুন করে দেখে।

—করছিস কি রে তোরা! এত সব ভালো ভালো খাবার।

—মা নিজে দুপুরে বানালেন প্রকাশদা। বললেন হাসপাতালের কি বিশ্রী খাবার। আমরা এর আগে পুলিশ হাসপাতালের টিলায় ছিলাম কিনা, তাই দেখেছি।

—তা সত্যি। কিন্তু এইসব ভালো জিনিষ খেলে এখানকারগুলো আরো অনেক বেশী খারাপ লাগবে। তা লাগুক—দে তো অমৃত, একটা একটা করে আমার মুখে ফেলে।

চোখ বুজে প্রকাশ পরম পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে যায়। তারপর জল খেয়ে বলে,—খবর কি, বল।

খবর বলতেই তো আসা, মনে মনে তালিম দেয় কনখল। তারপর বলে যায় সব শোনা কথা। কেমন করে বলতে হয়, কেউ ওকে শেখায়নি, কিন্তু রীতিমতো গুপ্তচরের ধরনে কখনো ফিসফিস করে, কখনো উত্তেজিত হয়ে—বলে যায় আনুপূর্বিক যতটুকু জানে ও।

প্রকাশ সব শোনে। কিছুক্ষণ একটি কথাও না বলে চুপ করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে শুয়ে থাকে। যখন কথা বলে, গলার আওয়াজ চাপা, কিন্তু তীব্র।

—প্যারীবাবু নিজে বলেছেন ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার পাট ছিল গুদামে?

—হ্যাঁ।

ওঁর স্ত্রী বলেছেন, গুদাম খালি ছিল? আগুন লাগবার পরদিন?

—আমি শুনিনি, মাকে বলেছেন। মা বাবাকে বলছিলেন, সেটা আমি শুনেছি।

—ও একই কথা। রাখহরি যা রটাচ্ছে, সেটা কে শুনেছে ?

—তা বলতে পারব না প্রকাশদা। অমূল্য বলছিল স্কুলে যাবার পথে কালকে—কিন্তু তারও শোনা কথা।

—হুঁ।

প্রকাশ শুয়ে শুয়ে ভাবে। এবার যখন কথা বলে, ওর মুখ ম্লান দেখায়। গলার আওয়াজ বিষণ্ণ ঠেকে।

—কনখল, ভাই—তুমি আর কখ্খনো আমায় দেখতে এসো না। অমৃত, তুইও আসিস নে। আর এক কাজ করবি তুই—এখ্খুনি চলে যা, গিয়ে নিবারণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। বলবি, যদি পারে, রাখুকে যেন সাথে নিয়ে আসে। আর শোন,—না, থাক, নিবারণ এলেই হবে।

আহত হয় কনখল প্রকাশের কথা শুনে। নিরাশার ছাপ পড়ে মুখে। প্রকাশ বুঝতে পারে। হেসে, সস্নেহে বলে,—এবার আর তুমি নয়, তুই করেই বলে,—মন খারাপ করিসনে কনখল। তুই জানিস না তুই আজ আমার কত উপকার করলি। তোকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি রে, তোর মাকেও। কিন্তু তোর বাবা যে হাকিম, আমার সাথে মেলামেশা করলে তাঁর বদনাম হবে। কেন, তা তুই বুঝতে চাস নে, পরে আপনিই বুঝবি। আর ছ্যাখ, এই বিস্কুটের টিন, ঝাড়ন, আর বাকী ফল কটা, সব নিয়ে যা—তোদের আনা খাবারের যেন কোন চিহ্ন না থাকে। আমি তো পেট ভরে খেয়েছি। মাকে আমার অনেক প্রণাম দিস। এখন যা।

শেষ কথা কটায় এমন প্রভুত্বের সুর ফোটে, যে ওরা একটি কথাও বলতে পারে না। অমৃত ওর গায়ে হাত দিয়ে যাবার ইশারা করে। বাইরে বেরিয়ে এলে বলে,—প্রকাশদা অনেক বোঝে রে, যা বলে শুনতে হয়।

মনমরা কনখলকে নিয়ে অমৃত যখন হাসপাতালের সদর দরজা পেরিয়ে দক্ষিণের গলিতে বাঁক নিয়েছে, পুলিশ সাহেবের টমটম এসে হাসপাতালে ঢোকে। টমটমে পুলিশ সাহেবের সাথে আর

একজন বাঙালী পুলিশ আর বিপিন কার্লাইল। অমৃত বলে—ভাগ্যিস আমাদের দেখেনি। আর দেখলেই বা কি, চেনে না তো—

হ্যাসেটের 'ইয়ং ম্যান'-কে পুলিশ সাহেব বিলক্ষণ চেনেন। সে বলে, চিনলেই বা। আমরা কি করেছি যে ভয় পাব? আর নর্টন তো ভালো সাহেব, আমাকে একটা দো-ফলা ছুরি দিয়েছিল।

অমৃত বেশী বড় না হলেও প্রকাশদাদের গীতা সোসাইটি যে সরকারের পেয়ারের নয়, এমন কানাঘুসা শুনেছে। সময়টা পূজার আগে,—বিলিতি নূন, বিলিতি কাপড়—কাজীর বাজারে আগুন—সব জড়িয়ে প্রকাশদাদের ঘিরে যে একটা বিপদের মেঘ ঘনাচ্ছে, আভাসে বোঝে। কনখলকে সব বোঝাতে যায় না। ছিটে ফোঁটা যা জানে, এক আধটু বলে—জানিস, ঐ বিপিন মাষ্টারকে সেদিন গোপালবাবু বলছিলেন স্পাই। ও নাকি ছেলেদের স্বদেশীতে ধরিয়ে দেয়, তার জন্যে সাহেবদের কাছে নাকি বকসিস পায়। যাকগে ওসব কথা, তুই বাড়ী পালা। আমি ঐ দিক ঘুরে যাব—নিবারণকে খবর দিতে হবে। বাড়ী থেকে বেরোস নি,—যদি পারি, আসব খেলতে।

একা বাড়ী ফেরে কনখল। ফেরবার রাস্তায় মনে হয়, যেন অনেক কথা বলবার আর জানবার আছে ওর। সেগুলো কি,—তার সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। মন খুলে কথা বলার লোকই বা কে আছে এক মা ছাড়া,—আর, আর আয়েষা ছাড়া? ওর অস্পষ্ট মানসে দুটি মুখ ফুটে ওঠে—পরম নির্ভর, পরম নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর দিকে এগোয়, কিন্তু বুকের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

১১

নিভাননীর কাজ নেই, তাই কাজের অন্ত নেই। সর্বসাকুল্যে তিনটি প্রাণীর খিদ্‌মতে রহমৎ, হারুণ, ঠাকুর, চাকর—চারটি তো আছেই, ফাউ হিসেবে ব্যাঙাও জুটে গেছে। নিরুপদ্রব সংসার। এ বাড়ীতে আসবার পর থেকে হৃষিকেশেরও যেন বাইরের কাজ বেড়ে গেছে। এক সন্ধ্যার পর, আর ছুটিছাটার দিনে ছাড়া তাঁর সঙ্গ প্রায় পাওয়া যায় না। পুলিশ হাসপাতালের টিলার প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন ছেড়ে এখন জুটে গেছে পাড়াপড়শী গিন্নীবান্নি ছুঁড়ি বুড়ির দল। গৃহকর্মের অবসর দুপুরে বিকেলে এ ও যে আসে, গল্পে গুজবে, পান খেয়ে, ঘর গেরস্তালীর কথা বলে সময় কেটে যায়।

প্রায় নিত্যকার এক কাজ জুটেছে বিকেলে মেয়েদের চুল বাঁধা। ও কাজটা নিভাননী পারেন ভালো, হালফ্যাশনের অনেক নকসা জানা আছে ওঁর। খদ্দের বেশী নেই। যুবতীদের মধ্যে উষা, আর বিদ্যাভূষণের মেয়ে মায়া। মায়ারও বিয়ে হয়ে গেছে, এখন বাপের বাড়ী এসেছে। কনখল যখন এসে পৌছয়, তখন বিকেলে গা ধুতে যাবার আগেকার কেশবন্ধন পালা সুরু হয়েছে। অমূল্যর মা একধারে বসে চুনখয়ের লেপা খোলা পানের ওপর জাঁতি ধরে সুপুরী কুচোচ্ছেন। আর মা, চুল বাঁধা সবে শেষ করে মায়াকে ছেড়ে, উষাকে নিয়ে পড়েছেন।

মায়া উর্ধ্ববাহু হয়ে তেল চপচপে আঁট বিনুনীর ওপর হাতের তেলো দিয়ে খোঁপায় গোঁজা চুলের কাঁটা শিজিল করছে। আদুল গায়ে খালি শাড়ির তলায় ধবধবে বুক দুটো থরথর করে কাঁপছে—ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে কনখল, চোখ ফেরাতে পারে না। চোখে

চোখ পড়তে মায়া সিঁদুরগোলা মুখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আঁচল টেনে গা ঢাকে।

মায়ের দল ওর উপস্থিতি আমলেই আনেন না। কিন্তু মুটকি উষার ঠোঁট ধারালো হাসিতে ঝিকমিক করে। যেন ঠোঁটকাটি বলতে চায়,—আ মর। হ্যাংলার মতো গিলছে দেখ না।

বলে না উষা কিছু। আলগোছে গা থেকে আঁচল যেন অন্যমনস্কভাবেই পড়ে যায়, তুলে দেওয়া দরকার মনে করে না।

এ দৃশ্য কনখলের অ-দেখা নয়। আর আর দিন ভ্রূক্ষেপও করে না। আজ মন চঞ্চল, কী যেন আলোড়ন উঠেছে প্রকাশ-বিপিন-পুলিশ সাহেব সব জড়িয়ে। ও ছুটে পালায় ওখান থেকে, শিরায় শিরায় কিসের যেন জ্বালা ধরে—বুক দপদপ করতে থাকে। মাকে কত কি বলবার আছে, সমসাময়িকভাবে ভুলে যায় ও।

চুল বেঁধে মেয়েরা যখন পুকুর ঘাটে গা ধুতে যায়, ছাদের চিলে কোঠার জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে ওর। উষার না বলা মন্তব্যের মতোই দেখতে থাকে—যেন গিলছে। ওরা কেউ ছাদের দিকে তাকালে খামখা লজ্জায় জানালা থেকে সরে আসে, ওর উপস্থিতি যে ওরা কেউ টেরও পায়নি, সে কথা আদৌ মাথায় আসে না। একটা নিষিদ্ধ সুখের লোভনীয় আকর্ষণ ওকে চুম্বকের মতো টানে।

ওদের গা ধোয়া শেষ হতে একটা হতাশার অবসাদ বুকে নিয়ে নীচে নেমে আসে। বাইরে অমৃতদের কলরব শোনা যায়—সবাই খেলতে এসেছে। ও গিয়ে ভিড়ে যায় তাদের দলে।

কিন্তু এই সর্বপ্রথম ওর মনে উদয় হয় যে আজকের ছাদে ওঠা, চুরি করে ওদের দেখা, সর্বাঙ্গে পুলকশিহরণ,—এ সবই যেন একান্ত গোপন ব্যাপার, কাউকে বলা চলবে না এসব কথা। কোথায় যেন দোষের দিক আছে এতে। সেদিন উষার স্পর্শের উন্মাদনা ওকে বিরূপ করেছিল, তাই আয়েষাকে সব খুলে বলতে পেরেছিল। আজ সেই স্পর্শের জন্য মন উন্মুখ হল কেন, বোঝে

না ও, কিন্তু মাকে, আয়েষাকে কিছুতেই বলতে পারবে না আজকের সুখানুভূতির কথা।

আধ ঘণ্টার ওপর পুরোদমে গোল্লাছুট খেলে ঘেমে নেয়ে—মন শান্ত হয়ে যায়। ভুলে যায় বিকেলের মনশ্চাঞ্চল্য। যথারীতি মা সিরাপজল দেন, ছেলেরা খেয়ে বিদেয় হয়। যাবার সময় অমৃত ওর কাণে বলে যায় যে পুলিশ নাকি নিবারণকে নিয়ে গেছে কাজীর বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে। প্রকাশদার ঘরে, হাসপাতালে নাকি পাহারা বসেছে, কেউ ওর কাছে না যায় আসে—দেখবার জন্যে। অমৃত বলে যায় যে কনখল যেন একা ছুট করে ওখানে গিয়ে না উপস্থিত হয়।

তা যাবে না কনখল। পুলিশ পাহারার ভয়ে নয়—প্রকাশদা বারণ করেছেন বলে। বাবার বদনাম হবে বলে। বদনাম হবার যুক্তির দিকটা তলিয়ে দেখতে যায় না, প্রকাশদাই বলেছেন। মার কাছে সব না বলা পর্যন্ত ছটফট করে ওর মন। ফাঁক পেতেই মাকে গিয়ে ধরে। হাসপাতালের কথা, অমৃতর কথা,—সব খুলে বলে।

নিভাননী ঘটনার ভালোমন্দ সম্বন্ধে হুঁ না কিছু বলেন না, শুধু, বলেন,—প্রকাশ তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। ঠিকই বলেছে। বেশী মেলামেশা, না করাই ভালো—দিনকাল ভালো নয়।

—আজকে বাইরের বারান্দায় বিপিনবাবু এসেছেন দেখলাম। জানো মা, ঐ বিপিনবাবু স্পাই। অমৃত বলেছে—উনি নাকি ছেলেদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে বকৃসিস পান।

—তোর অত কথায় থাকার দরকার কিরে কংখ্? ও ভদ্রলোক তো আর তোদের ক্লাসে পড়ান না।

—নাই বা পড়ালেন। এই যে নিবারণকে পুলিশে নিয়ে গেছে, সে তো ওঁর ক্লাসেরই ছাত্র। আর নিবারণ কেমন ভালোছেলে—বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। উনি যদি তাকে ধরিয়ে দিয়ে থাকেন?

—তা তুই করবি কি? উনি অন্যায় করলে শাস্তি পাবেনই পাবেন। ভগবান কখনো অন্যায় সহ্য করেন না।

একটা নিষ্ফল আক্রোশের ভাব কনখলের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়। তাই তো, সে কি করবে? মার কথা ঠিক হোক—ভগবান ওকে শাস্তি দিন। নিবারণকে পুলিশে নেবার মূলে যে উনি, এ বিষয়ে কনখল নিঃসন্দেহ। কেমন চোরের মতো চেহারা লোকটার—ইদিক উদিক তাকায়, আর জিভের ডগা বার করে গোঁফে বুলোয়। দেখলেই ঘেন্না হয়। হাতজোড় করেই আছে—কখনও চড়া গলায় কথা কয় না। নিভাননী বলেন—ওসব ভাবনাচিন্তা রেখে এখন পড়তে বোস তো কংখ্। রং-পেন্সিল আনা হোলো কি কাজে-রে? কি আঁকতে হবে?

—ম্যাপে দিতে হবে মা—তবে সে তো সকালে দেব। রাত্তিরে রং সব বোঝা যায় না।

বলে কনখল ঘরের দিকে যায়। পড়ার টেবিল ওর মোটামুটি গোছগাছ করাই থাকে, তবু দু-বেলা পড়তে বসবার আগে আর একবার করে গুছিয়ে নেয়।

ঘর থেকে শুনতে পায় বাইরের বারান্দায় বেশ জোর গলায় কথাবার্তা চলছে। হরেনবাবুর গলাই বেশী জোরদার, বিদ্যাভূষণ-মশাই সাময়িক ফোড়ন দেন। প্যারীবাবু সাফাই জবাব দিতে ব্যস্ত। আর কারো গলা বড় শোনা যায় না। হৃষীকেশ এদের সান্নিধ্যে কথা কম বলেন। বিপিনবাবু তো আজই এ বাড়ীতে প্রথম এলেন। কনখল বই খুলে বিদ্যাসাগরের 'মা' 'মা' বলে বর্ষার নদী পার হয়ে যাবার গল্পটা পড়ে। ওটা ভালো লাগে বলে পড়ে—কালকের পড়া বলে নয়। হঠাৎ হরেন চাকীর উচ্চগ্রামে আওয়াজ শোনা যায়,—মশায়, প্যারীবাবুর না হয় লোকসানের ব্যাপার, প্রচুর টাকার পাট পুড়ে গেছে, আফশোষ হবারই কথা। কিন্তু আপনার কি মশায়? আপনি করেন স্কুল মাষ্টারি, আর আগুনের

সময়ও আপনি ওখানে ছিলেন না। আপনি কি করে জানলেন কে বা কারা আগুন লাগানোর মূলে ?

বিপিনবাবুর হেঁ হেঁ হাসি মেশানো তেলতেলে গলায় জবাব আসে,—মুবারক সওদাগর আর ইসমাইল ব্যাপারীর ঘরে কাপড়ের স্টকটা ছিল লাখ টাকার। সব পূজার সওদা—খাস ম্যাঞ্চেস্টার। এ আর বুঝলেন না হরেনবাবু, পাটটা হোল কাকতালীয়, আসল লক্ষ্য ছিল ঐ বিলিতী কাপড়ের গাঁটগুলো। শিউশরণের ঘরে নূনও কম টাকার ছিল না। বাকীটুকু তো ছুয়ে ছুয়ে চার। গীতা সোসাইটি মুখে যত ধর্ম প্রচার করুক, আর কাজে দীন দুঃখীর সেবাই করুক, ওদের আসল কাজ বিলিতী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা। আগুন লাগল, বিলিতী কাপড় পুড়ল, এবং আগুন লাগার খানিক আগে গীতা সোসাইটির নিবারণকে দেখা গেল বাজারের দিক থেকে আসতে। এর পরও কি বলে দিতে হবে, কারা আগুন লাগিয়েছে ?

—কে দেখেছে নিবারণকে ? কখন দেখেছে ?

জবাব দেন প্যারীবাবু—আমি, মানে আমার গুদামের কয়ালী-সর্দার রমজান দেখেছে। ঠিক আগেই যে, তা নয়। আগুন লেগেছে, তখন নিবারণ দৌড়ে বাজারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই দেখেছে।

বিদ্যাভূষণ মশায় তামাক টানতে টানতে বলেন,—আমার মনে আছে বটে। নিবারণ রাত গোটা বারোর সময় আমার বাড়ীর পেছনের গলি দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে প্রকাশদের বাড়ীর দিকে গেল—সে বলতে বলতে যাচ্ছিল,—অমূল্য, তোরা উঠে বাজারে যা, আগুন লেগেছে, আমি প্রকাশদাকে খবর দিতে যাচ্ছি—বলতে বলতে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। আমার তো মনে হোলো সাহায্যের জন্য খবর দিতেই গেল।

—অত রাত্রে নিবারণ প্রথম জানল কি করে আগুনের খবর ?

—আরে তাও জানো না ? ও যে রাত পাহারা থাকে ব্রাহ্ম-

মন্দিরে। মন্দিরটা বাজারের পশ্চিমে তো, আর বেশ একটু উঁচু জায়গায়। ওখান থেকে পরিষ্কার প্যারীবাবুদের গুদাম আর বাজারের এক অংশ দেখা যায়। ডাক শুনে অমূল্য এক লাফে বেরিয়ে গেল। আমি ডাকলাম পেছন থেকে, শুনতেও পেল না। খানিক পরেই, সেই যে ফনোগ্রাফের চোঙ-এর মতো একটা জিনিষ —তার মধ্যে থেকে প্রকাশের গলার আওয়াজ পেলাম—কোনো বাড়ীর ছাদে উঠে হাঁক ছাড়ছে—'গুরুজী কি জয়—স্বামীজী কি জয় —সেবাদল—কাজীর বাজার—আগুন—'। তার একটু বাদে খড়মটড়ম খুঁজে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি দলে দলে ওদের ছেলেরা ছুটছে বাজারের দিকে। কারও হাতে বালতী, কারও হাতে শাবল, দা, এইসব। অমৃত, প্রকাশ, ওদেরও দেখলাম।

হৃষীকেশ বলেন—হ্যাঁ, নেভানোর ব্যাপারে ওরাই অগ্রণী—সরকারী সাহায্য পৌঁছেচে পরে। আরে, আমারও ত ঘুম ভাঙল ঐ চোঙের আওয়াজে।

হরেনবাবু বলেন—তা হলে ত ওরা সাহায্যের কাজেই এগিয়ে এসেছে মনে হয়। নিজেরাই আগুন ধরিয়ে, নিজেরাই প্রাণ তুচ্ছ করে নেভাতে আসবে, লোক বাঁচাবে—এটা কেমন কেমন ঠেকছে না? আগুন লাগাটা নিছক অসাবধানতাও হতে পারে। শুনেছি নিবারণ স্টেটমেণ্ট দিয়েছে পুলিশে। সে বলেছে, মন্দিরের বারান্দায় বসে সে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ছিল। আগুন প্রথম দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে প্যারীবাবুর গুদামে—সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে বাজারের মধ্যে।

প্যারীবাবু লাফিয়ে ওঠেন। হুঙ্কার ছেড়ে বলেন,—বলেছে? এই কথা বলেছে? মিথ্যেবাদী স্কাউড্রেল কোথাকার। ওর নামে; ওদের দলের নামে আমি মামলা করব। উচ্ছেদ করব ওদের শিলেট থেকে।

প্যারীবাবুর হঠাৎ এরকম আক্রোশ-হুহুঙ্কারের কারণ বোঝা যায় না। বিয়ের ব্যাপারে বাধা, সে তো সীতেনাথ পণ্ডিতের

মধ্যস্থতায় মিটেই গেছে। আসরের সবাই হকচকিয়ে যান। হরেনবাবু শান্তিদূতের মতো বলেন,—আরে মশাই, আপনি চটেন কেন? হতে পারে কুলি কয়ালদের কেউ তামাক খেয়ে কল্কে উপুড় করেছিল—টিকে ছিটকে শুকনো পাটের গাঁটে পড়েছে—

—পাটের গাঁটে? পাট কোথায় আমার গুদামে? গুদাম ত—

বলতে বলতে সামলে যান প্যারীবাবু। কি সর্বনাশ! কি বলতে কি বলে ফেলছিলেন এখ্খুনি। বলতে যাচ্ছিলেন 'গুদাম তো খালি', কিন্তু সামলে নিয়ে শেষ করলেন,—গুদাম ত ভিজে পাটে ভর্তি ছিল। নৌকোর পাট। গাঁট বাঁধা আদপেই হয়নি। তাতে আগুন লাগার কথাই উঠে না।

শেষ দিকের কথার স্থুর অনেক নরম লাগল শুনতে। বিদ্যাভূষণ কিছু না বুঝলেও হৃষীকেশ ও হরেনবাবু চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। হৃষীকেশ প্যারীবাবুর স্ত্রীর জবানী নিভাননী মারফত যা শুনেছেন, তাই ভেবে, আর হরেনবাবু দু চার নৌকো ভিজে পাটের দরুন পঞ্চাশ হাজার টাকার লোকসানের আফশোষের কথা ভেবে। বিশেষ করে গাঁট ভর্তি গুদামের পুরো ইনসিওরেন্স যেখানে ত্রিশ হাজার টাকার।

যাতে প্রসঙ্গ অপ্রীতিকর না হয়ে ওঠে, সেই ভেবে হৃষীকেশ বলেন,—ও নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামানোর দরকার কি হরেনবাবু? পুলিশ ব্যাপারটা হাতে নিয়েছে, তদারক করবে, হয়তো মামলাও উঠবে। হতে পারে আমার এজলাসেই এল কেসটা। তা হোলে, আমার এখানে এসব আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

এ কথার যুক্তি সকলেই অনুমোদন করলেন মনে হোলো। হরেনবাবু পাকা উকিল, তখ্খুনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, আরে বাগচী সাহেব, বুঝলেন না, প্যারীবাবু যে বুড়িয়ে যাননি, এখনো তরুণ আছেন, সেইটে পরখ হয়ে গেল। দেখলেন না, কেমন দপ করে ছোকরাদের মতো জ্বলে উঠলেন? হ্যাঁ, যৌবন

ধরে রেখেছেন বটে। বুড়ো হাবড়া হোলে মাথা নেড়ে, ধীর গলায় বিচার বিবেচনা করে কথা কইতেন। রক্ত গরম না থাকলে কি মেজাজ গরম করতে পারে কেউ?

উল্লেখটা তৃতীয়পক্ষে বিয়ের, কিন্তু রসিকতা খুব জমে না। প্যারীবাবু সাধারণত স্বল্পভাষী, আজ আলগামুখ হয়ে মনে মনে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন। মিনমিনে গলায় বলেন,—না, মানে আমার গুদাম থেকে আগুন প্রথম লাগাটা সম্ভব নয়, সেইটে বলতে চাই-ছিলুম আর কি। আগুন লেগেছে অন্যত্র, যে বা যারাই লাগাক। তবে আমার বহু টাকার মাল গেছে, এইটে জেনে রাখুন সবাই।

সাক্ষী তৈরীর ফন্দি দেখে হরেনবাবু মনে মনে চটেন, কিন্তু উকিল মানুষ, হাকিমের বাসায় বসে চটাচটি করতে চান না।—চিপটেন কাটতেও ছাড়েন না,—পঞ্চাশ হাজার টাকার ভিজে খোলা পাট আপনার গুদামে আঁটে, একথা মামলা উঠলে কোর্টেই প্রমাণ করবেন প্যারীবাবু, আমরা আপনার গুদাম কত বড় তাও জানিনে, পাটের দরও জানিনে। সাক্ষী সাবুদ হবার মতো জ্ঞান এখানে কারও নেই আশা করি। তবে জানিনে, বিপিনবাবু ত সর্বজ্ঞ মনে হচ্ছে —উনি হয়ত—

—আঃ হরেনবাবু, ওঁকে আবার কেন?

—না মানে, নিজের ঘরে শুয়ে উনি হাতগুণে নিবারণটা আগুন ধরিয়েছে এত্তেলা দিয়ে এলেন পুলিশে কিনা, তাই হয়ত পাটের বাজার বিষয়েও ওঁর দৈবাধিকার থাকতে পারে।

সাপের মত ক্রুর চোখে তাকান বিপিনবাবু হরেনের দিকে। পুরু ঠোঁটে বাঁকা হাসি কিলবিল করে ওঠে কেঁচোর গতিভঙ্গীতে। কিন্তু কথা বলেন ঠাণ্ডা শান্ত গলায়,—কি যে বলেন চাকী মশাই, আমরা আর কতটুকু জানি। প্যারীবাবুই আমায় খুঁজে বের করে বললেন সব। স্কুলের ছেলেদের কিছু কিছু খোঁজ খবর আমাদের রাখতে হয় বৈ কি। তাই যতটুকু জানি বলবার জন্য প্যারীবাবু পরশু নিয়ে গেলেন ধরে পুলিশ সাহেবের ডেরায়। ইস্কুলে চাকরি

করি মশাই, সরকারের কাছে যা জানি কবুল না করলে অপরাধ হবে যে!

হৃষীকেশ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন বোঝা যায়। একটু অধৈর্যের সাথেই বলেন,—থাক না এ প্রসঙ্গ। অন্য কিছু আলাপ-চারি চলুক না! আপনারা আমার রুজি মারবেন দেখছি!

বলেন বটে ঠাট্টার সুরে, কিন্তু হুকুমের আমেজ পাওয়া যায় বলার ধরনে। থেমে যায় ওসব আলোচনা।

তারপর আর বেশীক্ষণ জমে না। যে যার মতো উঠতে আরম্ভ করেন একে একে। প্যারীবাবু সব শেষে ওঠেন।

হৃষীকেশ অতি ভদ্র। অভ্যাগতরা উঠলে সাধারণত গেট পর্যন্ত নিজে সঙ্গে যান। আজ তা করেন না। প্যারীবাবুর যাবার প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে ওঠেন,—রহমৎ, ওঠাও চেয়ার টেবিল।

আপিস কামরায় বাতি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেইখানে গিয়ে বসেন বাগচী। অন্দরে তখনো প্রতিবেশিনী মহিলাদের কেউ কেউ আছেন—নিভাননীর সাথে কথা বলার জন্যে ছটফট করেন বাবা—বুঝতে পারে কনখল।

বড়দের কথাবার্তা যথাযথ কনখল বোঝে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না। এটুকু খালি বোঝে, আগুন লাগানোর ব্যাপারে নিবারণকে জড়ানো, আর নিবারণকে মানেই দলপতি প্রকাশকে জড়ানো, এতে প্যারীবাবুর স্বার্থ আছে, আর তাতে সাহায্য করছে বিপিন কাল´াইল। ঐ স্পাইটা। দাঁত কিড়মিড় করে কনখল।

রাতে খাবার টেবলে মা বাবার কথার আঁচে বোঝে বাবা অসম্ভব চটে আছেন। তাঁর কাছে বিচারের জন্যে এলে প্যারীবাবুর সাজা হবে শোনে ও; বাজারে আগুন লাগানোর জন্যে আর মিথ্যে টাকার দাবী করে বিলিতী কোম্পানীকে ঠকানোর জন্যে। বিপিন সম্বন্ধে বাবা কোন উল্লেখ করেন না দেখে ক্ষুণ্ণ হয়। প্যারীবাবুর কিছু হোক না হোক, ওটার শাস্তি হওয়া উচিত। মা তো বলেইছেন, ভগবান ওদের শাস্তি দেন। আচ্ছা রইল তবে ওর জন্যে তোলা

কঠিন সাজা। দেরী হয়ত হবে, কিন্তু ভগবান ভোলেন না। দেবেনই শাস্তি ঠিক সময়ে।

প্যারীবাবু ঠক, প্যারীবাবু আগুনবাজ, এসব শুনে দুঃখিত হয় না একটুও। উল্টে ঐ সব অপরাধে প্যারীবাবু শাস্তি পেলে খুব খুশী হত দুদিন আগে ; কিন্তু ঐ অপরাধীরই স্ত্রী উষা, এই কথা মনে হতে বুকটা খচখচ করে আজ।

কনখলের মনের সদরের খোলা কপাট দিয়ে ভিড় করে আসে একটির পর একটি নতুন দিন। প্রতিটি প্রাতঃকাল ওর কাছে বিস্ময়কর আবির্ভাব। পূবে জলপাইবনের মাথায় মাথায় কে যেন সোনায় সবুজে গোলা কচি রোদ্দুরের পিচকিরি ছুটিয়ে দেয়, নাম না জানা একরাশ পাখির কলকাকলি শিশির ভেজা সদ্যচোখমেলা দিনটিকে শশব্যস্ত করে তোলে, ওর ঘুমের জড়তা পলকে কেটে যায়। বিছানা থেকে ওঠে, আড়মোড়া ভেঙ্গে নয়, তড়াক করে লাফ দিয়ে। চোখেমুখে জল দিতে ছোটে, ধীর পদক্ষেপে নয়, প্রায় দৌড়ে। দক্ষিণে, কয়েকখানা বাড়ীর পরেই ব্রাহ্মমন্দির। সেখান থেকে সমাজের আচার্য পরেশবাবুর স্তবগম্ভীর সুর ভেসে আসে,

—তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর, তুমি তাই এসেছ নিচে,—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

মানে বোঝে না কনখল, কিন্তু সুরে সুর মিলিয়ে আপন মনে ঐ দুটি লাইন গাইতে থাকে। বুকের ভিতর একটা দিক যেন ফাঁকা ছিল, কথাগুলো আউড়ে গেলেই সে দিকটা যেন ভরে ওঠে।

ও জানে, মা আরো আগে উঠে ভাঁড়ার ঘরের যে কোনটায় পিতলের ছোট্ট পালঙ্কে যে ছোট্ট নাড়ুগোপাল মূর্তিটি আছে, সেইখানে প্রণাম করতে গেছেন। রোজ করেন। সন্ধ্যেবেলা আবার তেলের পিদিম দেন, ওখানেও, তুলসী তলায়ও। টিলার বাড়ীতে তুলসীতলা ছিল না, কিন্তু মার শোবার ঘরের এক কোণে নাড়ুগোপাল ছিল।

মুখধোবার পর নিত্যকর্মের প্রথম দফা, আস্তাবলে হাজিরা।

ঘোড়ায় চড়ে রোজ টহল দিতে বেরোনর সুবিধে হয় না, তা না হোক। হারুণ কাঞ্চনকে দলাই মলাই করে, পুরু শক্ত বুরুশ দিয়ে ঘাড় গর্দান ঝেড়ে দেয়। প্রত্যেকটি পা ভাঁজ করে ধরে নাল ঠুকে দেখে ঢিলেঢালা হয়ে গেল কিনা। সন্দেহ হলে পুরোনো পেরেক বার করে নতুন পেরেক লাগায়। কনখলের ভয় হয় বুঝি পায়ের মাংসে ঢুকে যাবে। তা যায় না। হারুণের হাত খুব দোরস্ত, পেরেক লাগানোর পর বাটালি দিয়ে পায়ের খুর চেঁচে সমান করে দেয়। কাঞ্চন কনখলকে দেখামাত্র ঘাড় বেঁকিয়ে তলার ঠোঁট কাঁপিয়ে একপাশের দাঁত বার করে আদর সম্ভাষণ জানায়,---যেন মুচকি হেসে বলতে চায়,---ভাবছ লাগছে বুঝি? একটুও না। আমরা ঘোড়ারা এসব পেরেক বাটালির ঠুকঠাক কেয়ারই করি না। কনখল গিয়ে মুখের কাছে দাঁড়ায়। কাঞ্চন ওর মাথায় গাল ঘসে দোস্তি জানায়। দু হাত দিয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রাখে কনখল।

বাড়ীর দিকে ফিরতে খানাকামরার জানলায় উর্দিপরা রহমতের চেহারা নজরে পড়ে। বুড়ো কেমন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে দেখে তাক লাগে কনখলের। এই মেজের ওপর পিরীচপেয়ালা সাজাচ্ছে, আবার একটু পরেই কোমরবন্ধে আঁটা ঝাড়ন দিয়ে কাঁটা চামচ সাফ করছে। টুক করে বাবুর্চিখানা থেকে ধোঁওয়া ওঠা ডিমের ডিস নিয়ে আসছে---আবার একটু পরেই, একহাতে আংটা আঁটা টোষ্টদান, আরেক হাতে প্লেট বসানো ঘেরাটোপ ঢাকা চায়ের কেৎলী আনছে। পা ফেলছে আলগোছে যেন সার্কাসের তারের ওপর দিয়ে হাঁটবার খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু মজা হল, বাবা এসে টেবিলে বসলেই বুড়ো এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে, যেন সেও একটা ঘরের আসবাব। এটা ওটা খাবার তুলে দেওয়া এগিয়ে দেওয়া এসব মা করবেন। কেবল বাবা ঘাড় ফেরালে ও এসে নিঃশব্দে বাঁ পাশে দাঁড়াবে, হুকুম শুনে আবার তেমনি নিঃশব্দে তামিল করতে ছুটবে। এসব আদবকেতার ওর আর নড়চড় নেই।

ভাব হয়ে যাবার পর ব্যাঙা আজকাল উঁকিঝুঁকি দেয় রোজ

বিছানে। ও গিয়ে ব্যাঙার মাথায় চাটি কসিয়ে দেয়, বলে,---এখন পড়ব। পরে আসিস। ব্যাঙাও ইচ্ছে করলে চাঁটি ফিরিয়ে দিতে পারে, কেন যে দেয় না, সেই জানে। দিলে কনখল অসুখী হত না, পারত লাগাতে একটা চুলোচুলি। দেখিয়ে দিত ওকে অমৃত-র কাছে শেখা জুলপীর চুল উলটো টান দেবার কসরতটা---যা লাগা লাগে। নিজে কিন্তু গুরুবাক্য ভোলে নি,---প্র্যাকটিস মেকস ম্যান পারফেক্ট। নিজের জুলপী উলটো টেনেও না-লাগা---নেহাৎ লাগলেও কম লাগা---অভ্যাস করে নিয়েছে। বলা ত যায় না---কখনো কোন মাষ্টার আচমকা যদি টেনেই দেয়!

চাঁটি হজম করে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাঙা ছুট দেয় আস্তাবল মুখো। জেল থেকে ওর বাবা না ফেরা পর্যন্ত ওকে আস্তাবল ঝাঁটপাট করবার কাজ দিয়েছেন নিভাননী। সে কাজ সুরু করবার পর থেকেই ব্যাঙা ওর সাথে সমানে সমানে হাতাহাতি করা কমিয়ে এনেছে। ইস্কুলে যায় না কিনা, তাই গাধাটার ইঁট খেলে পাটকেল ছোঁড়ার বিদ্যে রপ্ত হয়নি আদপে। মাকে বলে ওকে ভর্তি করাতে হবে স্কুলে, তা হলেই টিট্ হয়ে যাবে বাছাধন।

একটু পরেই মার ডাক শোনা যায়। হাসিমুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ান তিনি।

--কংখ, খাবি আয়।

দরকার নেই, তবু মা ডাকেন। জানাই আছে এখন খেতে হবে, কোনদিন ভুল হয় না। তবুও রোজ ডাকবেন মা। ছুট দেয় কনখল। মার গায়ে মাথামুখ ঘসে শাড়ীর আঁচল তুলিয়ে দিয়ে খাবার টেবিলে এসে শিষ্টশান্ত হয়ে বসে। বাবা আগেই এসে বসে গেছেন।

ডিম, টোষ্ট, রাতের বাসি রোষ্টের টুকরো, এসবে কনখলের যতটা আসক্তি, গেলাস ভর্তি দুধে চুমুক দিতে সেই পরিমাণ বিরাগ। এ সব মুখস্ত নিভাননীর, তাকিয়ে থাকেন তিনি সকৌতুক অভিনিবেশে যতক্ষণ না গেলাস খালি হয়। খানিকটা তলানি রেখে গেলাস নামাতে পারলে জয়গর্ব বোধ করতে পারে কনখল, কিন্তু

তুষ্টু, মা-টার জ্বালায় তার কি উপায় আছে? শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে মার চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলে কনখল। দুধটুকু নিঃশেষ করে গেলাস নামায়।

আমলকী, আর বেলের মোরব্বার দুটি বোয়ম পাশাপাশি রাখা। দেখতে হুবহু একরকম, কিন্তু কোনটায় কি আছে জানা আছে ওর। মা যেই বাবার সাথে কথা বলতে সুরু করেন, ঢাকা খুলে একটা বোয়মে হাত ঢুকিয়ে দেয়। মা ওর দিকে তাকান না, শুধু বলেন---উঁহু, খালি আমলকী নয়, বেলও খেতে হবে একটুকরো। আর হাত ঢুকিয়ে কেন, পাশে চাম্‌চে নেই?

চট করে হাত সরিয়ে নিয়ে মার কথামতো মোরব্বা প্লেটে তোলে কনখল। চারটে আমলকী---একটুকরো বেল। মাথা গুঁজে খেয়ে নেয়। তারপর উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যাবার সময় মার কানে কানে বলে যায়—তুষ্টু! আর পিঠে ছোট্ট একটি কিল মেরে যায়।

নিভাননী হাসেন।

পড়ার টেবিলে বসে রুটিন দেখে কনখল। বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল ইতিহাস---ওসব কাল রাতেই তৈরী হয়ে গেছে পড়া। ড্রইং আছে। রাতে আঁকা নিভাননীর বারণ, চোখে বেশী চাপ পড়ে। ম্যাপ, এম্‌নি ড্রইং, সকালে করতে হয়। আজকের টাস্ক আছে গাছের ছবি, সার্‌ বলেন অবজেক্ট ড্রয়িং। বইয়ের ছবি দেখে আঁকা চলবে না, চোখের সামনে যে কোনো গাছ দেখবে, আঁকতে হবে। জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে অমূল্যদের বাড়ীর পেছনের ডোবা, তার ধারে একটা নারকেল গাছ আড় হয়ে উঠেছে, অনেক ডাব ধরে আছে তাতে। গাছটা অন্য নারকেল গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে নেই, যেন পা টান করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝাঁকড়াচুলো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতে কৌতুক অনুভব করে কনখল। ভাবে, দেবে না কি ঝাঁকড়া চুলের তলায় একটা মুখ এঁকে ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট বসিয়ে—একটু একটু ধোঁয়া

উড়ছে? চুরুটের কল্পনায় বাবার কথা মনে এসে যায়, আপন মনে হেসে ওঠে ও। এঁকে ফ্যালে শেষপর্যন্ত শুধু গাছটাই, আঁকবার হাত ভালো ওর। যা ছাখে, তাই আঁকে। ইচ্ছে করলে দু এক কাঁদি ডাব বাড়িয়ে দেওয়া যায়—সত্যি হলে অমূল্যর বাবা বিদ্যাভূষণ মশাই কি খুশীই হবেন—নাঃ, দরকার নেই। যে কটি আছে ঠিক, সেই ক'টিই আঁকে।

রৌদ্রছায়ার লুকোচুরিতে গাছের এ-জায়গা ও-জায়গা গাঢ় ফিকে দেখায় সফ্‌ট্‌ পেন্সিলের শীষ্‌ জিভে ঠেকিয়ে গাঢ় জায়গাগুলোয় আর একবার বুলিয়ে দেয়। রবার ব্যবহার ও প্রায়ই করে না—হাতের কাছে থাকে যদিও। মা বলেন, রবার বোলো না, বোলো ইরেজার কিন্তু স্কুলে সবাই রবার বলে, এমন কি ড্রয়িংসার পর্য্যন্ত। ড্রয়িংসারদের বিদ্যার দৌড় বেশী দূর হয় না জেনে নিয়েছে ও—অন্য সারদের মতো অনেক পাশ দেন না তাঁরা। তাই শুধু আঁকতেই শেখান, পড়তে আর শেখান না। বাপরে,—মা কতো পড়েন। মার মতো অতো জানবেনই বা কি করে ড্রয়িংসার।

কিন্তু, ইরেজার জিনিষটা দেখতে বেশ। লাল কাঠের বুক, দুধারে পেন্সিল আর কালির দাগ ওঠানোর জন্যে রবার লাগানো। ইংরেজিতে লেখাও আছে কোন্‌ দিকে কি, কিন্তু বলে দিতে হয় না—রং দেখেই বোঝা যায়। জিনিষটা ওজনদারও বটে। সেদিন স্কুলে যাবার সময় ধাঁ করে ছুঁড়ে একটা দয়েল পাখীকে ঘায়েল করেছিল আর কি।

ছবি আঁকা শেষ করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ছাখে—নিজের খারাপ লাগে না। এবার মাকে দেখাতে হবে। জানা আছে যে মার মুখ থেকে শুনবে,—খাসা হয়েছে। প্রথম প্রথম এঁকেছে, কমলালেবু, হাঁসের ডিম, বেগুন এইসব। তারপর পেয়ালা, ফুলদান। মা সবতাতেই বলেছেন 'খাসা হয়েছে'। গাছপালা আজকে সুরু হোলো। কিন্তু আয়েষার সর্দারীর শেষ নেই। বেগুন দেখে বলেছে, 'পোকায় খাওয়া নাকি রে?' ডিম দেখে বলেছে, হাঁসের না

ঘোড়ার?' ফুলদানি দেখে বলেছে, 'ধর্ ধর্—পড়ে ভাঙল বুঝি!' নিজে ত ছাই আঁকতে পারে। তবুও কনখল জানে মার পরই আয়েষাকে দেখাতে হবে।

কোন্ নিকষ আছে এই দুই জহুরীর হাতে ওর গুণাগুণ যাচাই করবার, এসব তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো দিব্যজ্ঞান নেই ওর, কিন্তু মন যে ওদেরই ভালো লাগা-না-লাগার কাঙালী, পুঁথিকেতাব না হাঁটকেও এ সত্য ওর মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

আর একবার আসল গাছটার সাথে ছবিটা মেলাতে গিয়ে ডোবার ধারে গাছতলায় মায়াদিকে দেখা যায়। মায়াদি জলভরা দুটো বালতি দু'হাতে ধরে' আঁটকাপড়ে খালি মাথায় ঘাট থেকে বাড়ীর দিকে চলেছে। সূর্যের আলো মুখে পড়েছে, চোখ পিট্পিট করছে মায়াদি—হাত জোড়া, তাই ভুরুর ওপর হাতের তেলো ঢেকে আড়াল করতে পারছে না। কনখল ভাবে, কি বোকা, একটা বালতি ঘাটপাড়ে রেখে বাঁ হাতেরটা বাড়ীতে পৌঁছে, ফিরে এসে আর একটা নিয়ে গেলেই ত হয়—চোখ ধাঁধিয়ে আছাড় খাওয়ার ভয় থাকে না। তা' না, দুটোই একসাথে নিতে হবে! মেয়েগুলো আসলে বোকা। বলবে নাকি চেঁচিয়ে মায়াদিকে ডেকে—

হঠাৎ মনে পড়ে যায় সন্ধ্যেয় চিলেকোঠা থেকে ওদের স্নান করা দেখার কথা। আকর্ণ লাল হয়ে ওঠে ওর। কার যেন অনুক্ত নিষেধাজ্ঞা বাজতে থাকে কানে, চল্‌বে না, চল্‌বে না—অমন করে মায়াদিদের দিকে তাকানো চল্‌বে না, সহজভাবে তাদের ডেকে কথা বলাও চল্‌বে না।

এ কী হোলো কনখলের? অকারণে অসহায় বোধ করে নিজেকে, বিবর্ণ হয়ে যায় ওর মুখ। চেয়ারে বসে ড্রয়িংবুকের ছবিটার দিকে ঝাপ্সা চোখে তাকিয়ে থাকে, তালগোল পাকিয়ে ছবির পেন্সিলের আঁকগুলো একবার মায়া একবার ঊষার রূপ নেয়, বিকৃত প্রলোভনের রূপ, ভয় লাগে দেখে। দুহাতে মাথা টিপে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

পরদা ফাঁক করে দরজার ওপাশ থেকে নিভাননী ডাকেন,—ও কি কংখ্—মাথায় হাত দিয়ে বসে যে? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি? দেখি, দেখি,—

এগিয়ে আসেন তিনি। একলাফে মার বুকে গিয়ে মুখ লুকোয় কনখল। আধ মিনিট। তারপর সহজ হাসি হেসে বলে,—কিচ্ছু না মা, কেমন যেন ঘুরছিল মাথাটা।

—সে কি রে—জ্বরটর হয়নি ত! কপাল ত গরম ঠেক্‌ছে—কানের পাশের শিরা দপ্ দপ্ করছে! চল ত দেখি থার্মোমিটার লাগিয়ে—

টেম্পরেচার ওঠে না—জ্বর নেই। তবু নিভাননী বলেন,—থাক্ আজ স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। মাথা যখন ঘুরে উঠেছে একবার,—

—না মা, কিচ্ছু হয় নি। ও কখন সেরে গেছে। খুব ভালো আছি আমি। স্কুলে যেতে বারণ কোরো না মা—

—তবে চল্। পিঠে বুকে ভালো করে তেল মেখে দিই, ভালো করে নেয়ে নিবি চল্—

মার ত তেলমাখানো নয়, তেলকুস্তি। ঘষে, রগড়ে, চাপড় মেরে সর্বাঙ্গে তেল বসিয়ে, তবে ছাড়বেন মা। আধঘণ্টার ব্যাপার। তা ছাড়া, বড় হয়েছে এখন, মার কাছে উদোম হয়ে তেল মাখতে,—ধেৎ, লজ্জা করে। বলে না কিছু, কিন্তু ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।

যাচ্ছি নাইতে, আমি নিজেই তেল মাখতে পারি।

—তবে চল্, পিঠে শিরদাঁড়ায় আমি ঘষে দিগে। আর শোনো,—কানে, নাকে তেল দেবে।

গম্ভীর হয়ে বলেন নিভাননী। মনে মনে ছেলের লজ্জার কারণ বুঝে হাসেন। "শোনো" "দেবে"—শুনে কনখল বোঝে আজ এই ঝাঁজালো সর্ষের তেল নাক দিয়ে হুস্ হুস্ করে টেনে নাকের জলে চোখের জলে এক হতেই হবে, উদ্ধার নেই।

এতটা কষ্টসওয়া আর আত্মত্যাগ বিফল হতে দিতে চায় না

কনখল। মাকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিতে চায়, পরিবর্তে কিছু পাবার। বলে,—বেশ, অনেক তেল টানব নাক দিয়ে। কিন্তু স্কুল থেকে এসে পার্শেল খুলব আমি। তুমি আগে ভাগে খুলে রেখো না।

—আচ্ছা, বলে মা হেসে রাজী হন।

পার্শেল মানে গুরুদাসের বইয়ের প্যাকেট। কলকাতা থেকে এসেছে, শুনেছে কনখল চায়ের টেবিলে। দুপুরে ইউসুফ টাকা নিয়ে গিয়ে ভি-পি ছাড় করে আনবে, জানা আছে ওর। আগেও করেছে। কিন্তু মা আগেভাগে কেটেকুটে বই বার করে রাখেন বরাবর। প্যাকেটের সুতো, বাদামী কাগজ, আর বইমোড়া ভেতর-কার নানান রকম লেখাওয়ালা কাগজ—এইগুলোর ওপর ওর বইয়ের চাইতে কম লোভ নয়। আর প্রথম প্যাকেট খুলে একত্রে বাঁধা পাঁচসাতখানা বইয়ের গন্ধ শুকতেও খুব ভালো লাগে ওর, ভালো লাগে বইয়ের পাতা ওলটানোর আগে মলাটের এপিঠে-ওপিঠে হাত বুলোতে। সোনার জল রূপোর জলে লেখা মলাটে বইয়ের আর লেখকের নামগুলোর দিকে সগর্বে তাকিয়ে থাকতে। ওগুলো না করতে পেলে যেন বই পড়ার আনন্দ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এই সহজ কথাটা কেন সব্বাই বোঝে না? যে কোন প্রথম নতুন বই কনখলের কাছে সর্বদা লেখকের প্রতিমূর্তির মতো লাগে, সশ্রদ্ধ আগ্রহে উলটে-পালটে দেখে।

তা ছাড়া, এবারে আকর্ষণের বস্তু আছে। ছেলেদের রূপকথা, ছোট গল্প, ভ্রমণকাহিনী, জঙ্গলের গল্প, এ ধরনের বই অনেক পড়া। এবারে আছে ছেলেদের উপন্যাস—"চারু ও হারু"। সেই "ঠাকুরমার ঝুলি"র লোকটার লেখা। অদ্ভুত লেখা, আর তেমনি আশ্চর্য সব ছবি। ঝুলি বইটার একটা ছবি, আর তার তলার দু লাইন লেখা, ওর মনোহরণ করে রয়েছে আজও। সেই যে, একটা মেয়ে—না না, বনদেবী—তবে দেখ্‌তে ঠিক, আয়েষার মতো,—নেমে আসছে পাহাড় থেকে, আর দু পাশ থেকে গাছ লতা পাতা পশু পক্ষী—যারা একদিন পাথর হয়ে গিয়েছিল রাক্ষসীর জাদুতে, সব জেগে উঠে

বলছে,—নাও নাও, ফুল নাও, ফল নাও, আমাকে নাও—কিরণ-মালা না কার যেন গল্প। পায়ের নীচে কত পাথর গলে গেল, কত পাথর টলে গেল।

ও দেখেছে কোনো মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনে, "চারু ও হারু"তে ছবিও থাকবে ঢের। থাকতেও পারে অমনি ছবি একটা।

ঔৎসুক্য-অধীর মনকে শান্ত করবার জন্যে দুমাদ্দুম করে কয়েক লাফ ভালুক নাচ নেচে নাইতে যায় কনখল।

স্নান শেষ করে জামাকাপড় পরবার পরে আরেক দফা মায়ের হাতে আত্মসমর্পণ। চুল আঁচড়ানো। হাত দিয়ে মাথা পালিশ করে কপালের চুল চিরুনী ঠেকিয়ে এপাশে-ওপাশে সরিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, তা না, মা করবেন কি, দাঁত বিঁধিঁয়ে চিরুনী চালাবেন, মাথার মাঝখানে দাগ কেটে তবে চুল দুদিকে দেবেন। ওর কপালের ওপর একটা পাক আছে, সেখানকার চুল চিরুনীতে বশ মানে না। বাবার কড়া বুরুশ চালিয়ে দেন মা। চুলের ওপর লাগে না, কিন্তু খালি কপালে কাঁটার মতো বেঁধে।

প্রসাধন পর্বের পর খাওয়া। এ বেলা রান্নাঘরের দাওয়ায়, আসনে বসে। তেতো আর সুক্তো বাদ দিলে বাকী যাই রান্না হোক্, খেতে ভালোই লাগে ওর। বাড়ীতেই দই পাতেন নিভাননী। গুড়-কলা দিয়ে চটকে দইমাখা ভাত খুব ভালো লাগে খেতে, কিন্তু রসিয়ে খাওয়ার সময় দেয় না ছেলের দল। বাইরে থেকে ডাক পড়ে,—খাওয়া হল রে কনখল? হাতমুখ ধুয়ে ছুটতে হয়। নিভাননী চেঁচান,—ওরে, একটু বসে যা,—ঢের সময় আছে। মার কথা অমান্য করা ওর ধাতে নেই। বসে গিয়ে পড়ার ঘরে, ঐ বই গুছিয়ে নিতে যতটুকু সময় লাগে। তার পর মার কাছে এসে, একমুখ হেসে, বলে,—যাই মা?

—আয়। বলেন নিভাননী। গনিমিঞার বাড়ীর বাঁকে যতক্ষণ না ছেলেরা মোড় ঘোরে, তাকিয়ে দেখেন। তারপর যান প্রথমেই কনখলের ঘর গোছগাছ করতে। যা ছুটতরাসে ছেলেটা,—ঐ

দেখ, ইরেজারটা ভুলে ফেলে গেছে। দিয়ে দেবেন হারুণের সাথে, যখন টিফিন নিয়ে যাবে। রুটিন উল্‌টে দেখেন, হ্যাঁ, টিফিনের পরে ড্রয়িং ক্লাস।

কাজীর বাজারের আগুন নিভেছে, তবে বাজার নতুন করে জেঁকে ওঠেনি এখনো। ঝগ্‌ড়ুর খাজার দোকান খুলেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে শুকনো মুখে বেচাকেনা করছে সে। পাশ দিয়ে যেতে অমৃতর সাথে চোখোচোখি হয় কনখলের। অমৃত একরকম গায়ের জোরেই হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে যায় খানিকটা। টাউন ক্লাব পড়ে রাস্তায়। অমৃত আড়চোখে তাকায় কনখলের দিকে। হুঁ। যা ভয় করেছিল তাই। জল ভরে টস্‌ টস্‌ করছে কনখলের চোখ। ভোলাতে চায়। বলে,—জানিস, এই টাউন ক্লাবে একটা খুব ভালো লাইব্রেরী আছে। কত রকমের বই—বড় বড় আলমারী ভরা। আর কত ছবির কাগজ আসে, সব মস্ত একটা টেবিলে পাতা থাকে, সরু শিক্‌লি দিয়ে টেবিলের সাথে আঁটা। ওগুলো যত ইচ্ছে দেখো, আর পড়ো, কিন্তু তুলে নিয়ে যাবার জো নেই।

—আর আলমারীর বই? সেগুলো?

—সেগুলো নেওয়া যায় মেম্বর হলে। ছোট্‌কা ত' আমাদের বাড়ীতে দুখানা করে বই নেন একেকবারে। মা, দিদি, কাকীমা সবাই পড়ে।

কনখল কুতূহলী হয়ে ওঠে। বইয়ের প্রসঙ্গে রুক্‌মানিয়ার স্মৃতি চাপা পড়ে। উৎসাহে বলে,—আর তুই? তুই পড়িস্‌ না?

—ধুত্তোর বই! আমি ইস্কুলের বই-ই ছুঁতে ভালোবাসি না, তার আবার লাইব্রেরীর বই। আর পড়ব কখন বল—এই ত' ইস্কুল আর খেলা, তারপর একটু ডনবৈঠক, আর সোসাইটিতে সন্ধ্যের পর শোলোক শোনা। গীতা বলে একটা সংস্কৃত বই আছে জানিস্‌,—খালি ভীষণ সংস্কৃত নয়, খুব কঠিনও। তাতে 'পশ্যামি দেবাং স্তবদেবদেহে বলে' ছড়া আছে। সেইটে স্বামীজী বই থেকে

পড়েন—আর প্রকাশদা, কিম্বা আর কেউ বাংলায় মানে করে বলে।

—মানে করে দিলে আবার কঠিন থাকল কোথায় ?

—সে তুই বুঝবি নে। 'গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কত্রে' শুনলে হাসি পায় আমার—আবার মানে শুনলে ভয় হয়। কেষ্টঠাকুর অর্জুনকে মুখ হাঁ করে ভয় দেখাচ্চে, তারই গল্প। হাঁ-মুখের ভেতর নাকি তুলকালাম কাণ্ড চলেছে—লোক জন্মাচ্চে, খুন হয়ে যাচ্চে, এই সব। যতো সব আজগুবি ব্যাপার—

—তবে যাস কেন ? না গেলেই ত হয়।

—সে হয় না, আমাদের যেতেই হয়। এই ত বছর কয়েক আগে, বাবা, কাকা—বাড়ীর সবাই হাতে হল্‌দে সুতো বেঁধে বলল, আজ রাখীবন্ধন। বাড়ীতে নো রান্না। বলল, 'ভাই-ভাই, এক ঠাই'। মন্ত্র নিল 'বন্দে মাতরম'। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর একটা দিনে সবাই রাখী বাঁধে। সোসাইটির মন্ত্রও 'বন্দে মাতরম' কিনা, তাই আমাদের যেতে হয়।

গীতা সোসাইটির তথ্যপূর্ণ বর্ণনায় আকৃষ্ট হয় না কনখলের মন। শুধু কেষ্টঠাকুরের হাঁ-মুখের গল্পটা ভালো লাগে ওর। শুনতে হবে মার কাছ থেকে। অমৃতটা বলে আজগুবী! আরে, কত অদ্ভুত কাণ্ড রোজ হচ্ছে, আর এই হোলো আজগুবী ? অমৃতটা পড়াশুনা করে না কিনা তাই কিছু জানে না। পড়ত কঙ্কাবতী আর ঠাকুমার ঝুলি, হ্যাঁ, তবে টের পেত, কত কি যে হয় যা চোখ দিয়ে সব সময় দেখাই যায় না, বোকার মতো বোঝাও যায় না।

ইস্কুলে ওর নারকোল গাছের ছবি তারিফ পায়—ইংরেজিতে এক্‌সেলেণ্ট লিখে দেন ড্রয়িংসার্। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভোলেন না,—নিজে এঁকেছ ত ?

—হ্যাঁ সার্।

—বেশ, বেশ। ছেলেরা, সব দেখে রাখ। ইক্‌বাল, তুমি যে ফণী মনসার গাছ এঁকেছ, ওটা উইয়ের ঢিবি, না গাছ, বোঝা

যাচ্ছে না। আর সনাতন, তোমার কলাগাছে গাছের থেকে কলাই বেশী। অত ফল হলে গাছ খাড়া থাকে কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি—বলতে হবে না। তুমি কলা খেতে খুব ভালোবাসো। আর বাসে কারা? জানো ত? বাঁদর। অতএব তুমি একটি—

চাপা হাসির খুস্‌খাস্‌ ওঠে। সনাতন অপ্রতিভ হয়ে আমতা আমতা করে। মাতব্বর বলে একটি বয়স্ক ছেলে সুরমা নদীর ওপার থেকে নৌকো করে রোজ স্কুলে আসে। চাষীগেরস্তের ছেলে, অবস্থাপন্নও বটে। গোঁফদাড়ি উঠে গেছে। দাঁতের রং দেখে বোঝা যায় নিয়মিত পান খাওয়ার অভ্যেস আছে—যদিও ক্লাসে খায় না। তার দিকে তাকিয়ে সার্‌ বলেন,—মাতব্বর মিঞা, তোমার আমগাছে বাংলা পাঁচের মতো আম ত ঢের ফলিয়েছ, কিন্তু আমপাতাগুলো সব পান হয়ে গেল কেন? ফল ত নিজেরাই খাব, পাতাগুলো কেন আর গরুতে খায়, তাই না? কি করবে বাবা, ভগবানের নিয়ম,—আম ফলাতে গেলে সে গাছে পানের বরজ বসানো চলবে না, খোদার ওপর খোদকারী না হয় নাই করলে।

মাতব্বর একটু হাবাগোবা ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। ঘাড় নেড়ে মেনে নেয় সারের কথা। ড্রয়িংসার্‌ বোর্ডে একটা আনারস অাঁকেন—বোঁটার কাছে একগোছা পাতাসুদ্ধ। বলেন,—অাঁকো সবাই। বারো মিনিট সময়। জলঢুবীর আনারস, ভারী মিষ্টি—চটপট এঁকে ফেলো।

অাঁকতে মনোনিবেশ করে ছেলেরা। মাষ্টারমশাই আস্কে পিঠের মতো ইয়া বড় জেবঘড়ি বার করে সময় দেখেন। পাঁচ মিনিটে ছবি শেষ করে পেন্সিলের শীষ্‌ জিভে ঠেকিয়ে আনারসের গাঁটে গাঁটে চোখ আঁকে কনখল। হয়ে যায় বারো মিনিটের আগেই।

—টাইম্‌ আপ্‌ বলেন সার। সনাতনের খাতা দেখে আবার মন্তব্য করেন,—আরে, এ যে ড্রিলমাষ্টার মশায়ের চেহারা এঁকে

ফেলেছো সনাতন! পাতার জায়গায় একটা চাদর দু ভাঁজ করে এঁকে দিলেই হয়।

ড্রিলমাষ্টার নগেনবাবুর রিলিফ ম্যাপের মত মুখভরা আঁচিল—তাঁর সাথে ড্রয়িংসারের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। আর সবাই হাসলেও এ মন্তব্যে সুখী হয় না কনখল। কোথায় যেন রুচিতে বাধে। তিনিও ত সার্! আর ড্রিল করান কি ফার্ষ্টক্লাস। লেফ্‌ট রাইট, অ্যাবাউট ঠার্ন—বলেন, যেন পুলিশের কুচকাওয়াজের মতো।

সামনের দিনের ড্রয়িংয়ের টাস্ক বলে দেন ড্রয়িংসার্। হাঁস, কি মোরগ। যার যা খুশী। তবে আসল পাখী দেখে—ছবি থেকে নকল করে নয়। ছুটি পায় ছেলেরা।

উঁচু ক্লাসের ছুটি হওয়া পর্যন্ত সামনের মাঠে খেলে ছেলেরা। খেলার মাঠের ওধারে পুকুরে—পুকুর নয়, দীঘিই বলা চলে, পানিফলের জঙ্গল হয়ে আছে। পেরিয়ে পদ্মবন। খুব ফুল ফুটেছে,, কিন্তু আনা শক্ত, সিঙ্গাড়ার কাঁটাজাল ভেদ করে যাবে কে? পানিফলকে সিঙ্গাড়াও বলে, জেনেছে কনখল।

ছেলেরা পার্টি করে কাবাডি খেলায় মাতে। কনখলের মন নেই খেলায়। প্রকাশ বারণ করে দিয়েছে হাসপাতালে যেতে—বিকেলটা ফাঁকা লাগে। বাড়ী ফিরে আবার খেলা—কিন্তু মন টানে না ওর। জিমন্যাসিয়ামের প্যারালেল বারে অমৃতের কাছে শেখা দু-একটা কস্‌রৎ করে—প্রাথমিকগুলো—শক্তগুলো পেরে ওঠে না।

সকালটা মেলে ধরে সম্ভাবনার অনন্ত জগৎ। বিকেলের পড়ন্ত রোদ যেন সমাপ্তির আঁচল বিছিয়ে চলে। বিছোনো শেষ হলে আর এক রাজ্যের দরজা খুলে যাবে, সেখানে দিনের এসব সাথীদের মধ্যে কেউ থাকবে না। থাকবে যারা, তারা দিনের হৈ-হল্লায় হুল্লোড় করে আসে না। আত্মগোপন করে অগোচরে সারাদিনমান শুধু প্রহর গোনে রাতের রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করবার প্রতীক্ষায়।

ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজতে ছেলেরা পাড়াওয়ারী দল বাঁধে

যারা যে পাড়ার, সেই সেই পথ ধরে। অমৃত বলে—বাজার দিয়ে যাব না, চল হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাই। ঢুকব না, প্রকাশদার বারণ। খালি দেখতে দেখতে যাব।

কনখল এক কথায় রাজী। বলে,—চল্, চল্।

অমৃতর মনের কথা কনখল জানে না, জানতে চায়ও না। রোজকার ফেরবার চেনা সড়ক ছেড়ে আজ হাসপাতালের রাস্তায় বাড়ী ফেরার কথায় উল্লসিত হয় ওর মন, ওই প্রকাশদা যে ঘরে থাকে সেইটে একটু দেখতে পাওয়া যাবে, এইটেই যেন মস্ত লাভ, এই মনে করে। হৃষ্টচিত্তে অমৃতর সাথ ধরে।

সেই সেদিন পুলিশ দেখে যে গলির মোড়ে ওরা বাঁক নিয়েছিল, সেই দিক থেকে বেরোয় দুজন লোক। অমৃত বলে,—ওইটে বেণী টিক্‌টিকি, সঙ্গের ওটাও পুলিশ—সাদা পোশাকে।

—টিক্‌টিকি কেন বলছিস্, বেশ ত জাঁদ্‌রেল গুঁপো চেহারা।

—আরে টিক্‌টিকি মানে সি আই ডি। স্বদেশী পুলিশ আর কি। ওরা বিলিতি নুন কাপড় পোড়ালে আর বন্দেমাতরম বললেই ধরে জেলে দেয়। বেণীটা ওদের দারোগা—ভারী শয়তান।

মা বলেছেন, ডাকাতি করতে যাবার সময় 'জয় মা কালী' বললে দোষ, আর দল বেঁধে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় 'বন্দেমাতরম' বললে। এখন ত দুজনে একা একা যাচ্ছে—এখন দোষের কি আছে ?

লোক দুজন ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না—সোজা হাসপাতালের দিকে এগোয়। গলির মোড় ঘুরে, যখন চোখের আড়াল হয়েছে, কনখল জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—'বন্দে মাতরম'।

অমৃত হকচকিয়ে ওঠে, বলে,—করছিস্ কি রে—দৌড়ো, দৌড়ো—পালা, পালা—

সানুচর বেণী দারোগা ফিরে এসে খোঁজ করে। কাউকে দেখতে পায় না। টাউনের ডেঁপো ছেলেরা ওই ধ্বনি তুলে যখন-তখন

খেপায়। কিন্তু এ ছেলেছুটো কে, নজর করে দেখাও হয়নি। এক লহমা যা চোখে পড়েছে ডানপিটে বদ্‌মাস নয় বলেই মনে হয়েছে।

সঙ্গের ছোপধরা-দাঁত ট্যারা কনষ্টেবলটা বলে,—পোলাগুলিন কর্তার ল্যাজ মলে, আর কি!

ল্যাজে মোচড় খাওয়া বলদের মতোই ভুঁড়ি দুলিয়ে লাফায় বেণী দারোগা। ঢাকাই সিপাই বাঙ্গালসুলভ সরস কৌতুকে টিপ্পনি কাটে,—ঘুঙুর বান্ধ্‌লেই লুৎফা তরফাওয়ালী! থামেন, কর্তা, থামেন! বিনা টিকিটে দেইখা ফালাইবো মাইন্‌ষে!

থাম্ ব্যাটা বঙ্গচন্দ্র! এ তোর প্রকাশের চেলা না হয়ে যায় না, বুঝলি? আচ্ছা, পালের গোদা ত কুপোকাৎ। সময় আসুক, শোধবোধ হবে'খন।

পদ্মাপার বিহারী বলে,—একখান জবর দামী কথা কইছেন কর্তা! হময় আহুক, কাঠল পাকুক—অহন কিলাইয়া লাভ কি!

ফিরে, হাসপাতালে গিয়ে ঢোকে ওরা।

বাড়ী গিয়েই কনখল বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে নিভাননীকে খুঁজে বার করে। জড়িয়ে ধরে' 'বন্দে মাতরম্' বলার গল্পটা রুদ্ধনিশ্বাসে করে তাঁর কাছে। নিভাননী কৌতুকবোধ করেন না, বকেনও না। একটু চিন্তার রেখা পড়ে চোখের কোণে। তারপর সহজ সুরে বলেন,—অমন বলতে নেই। পূজোর মন্ত্র কি যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে বলতে আছে রে।

অপ্রতিভ বোধ করে কনখল। মার মুখে পূজোর উল্লেখে সম্ভ্রমের সুর ফোটে। পূজো বলতে ও যতটুকু বোঝে, সে ত অবিমিশ্র উল্লাস ও আনন্দ! নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়, সেখানে ঈষৎ হাসি ফুটেছে তখন। নম্র গলায় বলে,—আর বলব না মা।

তার পরই অন্য কথা মনে পড়ে যায়। চঞ্চলচরণে নাচতে থাকে।

—পার্শেল ? বইয়ের পার্শেল ? খোলো নি ত মা ? দাঁড়াও, দো-ফলা ছুরিটা আনি—

ছুট্ দেয় ছুরি আনতে। নিভাননী যান ভি-পি'র প্যাকেট বার করতে।

ছেলের হাতে বইয়ের প্যাকেট দিয়ে ভেতরবাড়ী যান নিভাননী। চুলবাঁধুনির দল আসতে শুরু করবে এখুনি। তার আগে ছেলেকে খেতে দিতে হবে। রহমৎই দেয়—তবে তিনি থাকেন সামনে। বলতে বলতে যান,—সুত্‌লী কেটেই এসে খেয়ে নিবি কংখ্। বই বার করবি পরে।

খাওয়া, এবং বই বার করা, ছুটোর প্রলোভনই জোরদার। ভেবেচিন্তে প্যাকেট বগলে কনখল বলে,—তবে আগে খেয়েই নি মা, চলো, দেবে চলো।

খাওয়া সেরে পার্শেল হাতে খোলা বারান্দার এক টেরে এসে বসে। ব্যাঙা গুটি গুটি এসে পাশে দাঁড়ায়। অনেক ডাকটিকিট মারা এই বিচিত্র পুলিন্দার উন্মোচন অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুরি দিয়ে কুট্ কুট্ করে সুতো কাটে কনখল। বাদামী কাগজের ভাঁজ খোলবার সময় আর তর সয় না ব্যাঙার। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে,—ভেতরে কি রে ?

—বই।

নিজের গলার সুরে নিজেই চমকে ওঠে কনখল। পূজোর কথা বলতে গিয়ে মার গলায়ও এমনি সুর বেজেছিল, মনে পড়ে ওর। একমুহূর্ত হাত থেমে যায়, তার পর সন্তর্পণে বইয়ের মোড়ক খুলে একখানার পর একখানা বই বা'র করে কোলে রাখে।

প্রত্যাশিত "চারু ও হারু" এসেছে। আর সব নতুন বইয়ের মধ্যেও এ যেন নতুনতম, চট্ করে ওটাকে নিজের কোলেই আরেক দিকে সরিয়ে রাখে। তরতাজা নতুন বইগুলোর স্পর্শ কি সুখের, গন্ধ কি মনভোলানো,—নেড়ে, শুঁকে, বুকের কাছে নিয়েও সাধ মেটে না ওর। মিলনমন্দির, গোরা, পোষ্যপুত্র। এসব মায়ের বই।

কৌতুককাহিনী, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, এগুলো ওর। সবচেয়ে তলায় একখানা বইয়ের ক্যাটালগ। ভারী মজার পড়তে। কত লোক, কত সব বই লিখেছে, তার ফিরিস্তি। মুখস্থ হয়ে যাবে দুদিনে। কার লেখা কোন্ বই ঠিক বলে দিতে পারবে ও। সেদিন নতুনমাসী উষার খাটের ওপর একটা বই দেখেছিল, "মডেল ভগিনী"। কে লিখেছে জানে না ও, বইটাও পড়া নয়। দেখতে হবে ক্যাটালগে নাম আছে কি না। তবে জাল মোহান্ত আর জালিয়াৎ ক্লাইভ একজনের লেখা নয়, আর কোন্টা কার লেখা ঠিক জানা আছে। শেষের বইটা মা আবার গয়নার বাক্সের তলায় রাখেন, কাউকে পড়তে দেন না। বড়দেরও না। ছাপা বই, কেন লুকিয়ে রাখতে হয়, বোঝে না ও। মা যেন জানতেও দিতে চান না ও বই বাড়ীতে আছে।

বাণ্ডিল ধরে বই নিয়ে মার হাতে আগে দিতে হবে। মা ওর বইগুলোতে উপহারের পৃষ্ঠায় লিখে দেবেন—'কংখ্, প্রাণাধিকেষু।' তলায় লিখবেন,—'মা জননী'। তারপর ও ইচ্ছেমত বইয়ের যেখানে-সেখানে লিখবে—'শ্রীকনখল বাগ্চী', আর তাক্ মতো জায়গামাফিক জলছবি সাঁটবে। এম্নিই হয়ে আসছে বরাবর।

বইয়ের জল্পনায় ব্যাঙার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ব্যাঙা ওর ঘোড়ায় চড়ার এলেম দেখেই সমীহ করতে শুরু করেছিল। এখন বইয়ের রাশে তন্ময় হয়ে যাওয়া দেখে ওকে যেন অন্য জগতের জীব বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাঙার মুখে কথা ফোটে,—এই সব বই তুই পড়বি নাকি রে?

—পড়বই ত। সব পড়ব। তবে এই তিনটে আমার একেবারে নিজের। বাকী মা'র। তোকে ত আমার সব বই দেখাই-ই নি। ঢের বই আছে আমার। দেখাব একদিন। আর দ্যাখ্,—

বলতে গিয়ে থেমে যায়। মনে পড়ে যায় মাকে বলে ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করার কথা। পড়তে শিখলে ওর সাথে কত বইয়ের গল্প মজা করে করা যাবে।

বইয়ের মোট বগলদাবা করে উঠতে উঠতে বলে,—স্কুলে পড়বি ব্যাঙা?

ব্যাঙা নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, পড়বে। কনখলের সাথে পাংক্তেয় হবার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায় অজানিতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মন। ঢোক চিপে বলে,—তুই শিখিয়ে দিস পড়তে আর লিখতে। তা না হলে ইস্কুলে নেবে কেন? তবে কিন্তু—কি মনে করে বিষণ্ণ হয়ে যায় ব্যাঙা। স্কুলে ভর্তি হবার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। আম্‌তা আম্‌তা করে বলে,—আজ বাবা আসবে রে—ছাড়া পাবে আজকে। যদি না দেয় ইস্কুলে যেতে—

—কি বললি? দেবে না? আলবৎ দেবে। মা বললে না দিয়ে পারে কখনো? আরে, বাবা আসবে তোর—সে ত খুব মজা হবে। আমার খুব ইচ্ছে করে দেখতে। দু ঘণ্টা ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—অ্যাঁ, সে ত মস্ত বীর রে! চল চল মাকে বই দিয়ে আসি, আর খবরটাও দিই গে।

ব্যাঙা দোমনা ভাবে কাপড়ের খুঁট বুড়ো আঙুলে জড়াতে খুলতে থাকে। কিন্তু পাছু ধরে কনখলের।

একদমে নতুন বই, ব্যাঙার স্কুলে ভর্তি হওয়া, ব্যাঙার বাবার জেলখালাস হয়ে বাড়ি ফেরা, সে যে কাজ পেলে আর কারুর বাড়ী থেকে না বলে খাবার জিনিস নেবার মতো অপরাধ করবে না,—অতএব তাকে আসামাত্র কাজ দিতেই হবে,—ফিরিস্তি শুনে নিভাননী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলেন,—হবে, হবে, শুনব, শুনব। বই রাখ, এখন খেলগে যা, পরে ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা হবে। বাবারে বাবা, ছেলে নয়ত বর্গী! হারে রে রে করে এসে পড়ল একেবারে!

ছেলের আবদার আর আকুতির ঐকান্তিকতায় স্নেহসজল হয় নিভাননীর মন। জগদ্ধাত্রীর মতো হাসেন কনখলের মাথায় হাত রেখে। বলেন,—খেলাধুলোর পর আসিস তোরা দুটিতে, ঠাণ্ডা হয়ে শুনব সব কথা। এখন দেখছিস না তোর মায়াদি, নতুন মাসি,

সবাই চুল বাঁধতে এসেছে ? আর এঁকে প্রণাম কর—ইনি তোর প্রকাশদার মা।

পাতলা চেপা ঠোঁট, খাঁড়ার মতো নাক, জ্বলজ্বলে চোখ, কদম-ছাঁটা চুল—সুগৌর গায়ের রং। এই বর্ষিয়সী বিধবা মহিলার দিকে তাকিয়ে যতটা শ্রদ্ধাবনত হওয়া উচিত ছিল ততটা হোলো না কনখলের মন। প্রণাম করল। কিসের যেন অভাব আছে ঐ সুন্দর মহিলার চেহারায়—ধরতে পারে না ও। শুধু বোঝে, ওর মায়ের মুখে যে স্নেহ ঢলঢল সুষমা আছে, এ'র তা নেই। চোখের দৃষ্টি যেন তীব্র আগুনের শিখা, ঝলসে, পুড়িয়ে দেয় বুক পর্যন্ত। মাকে বলে,—তাই হবে মা। খেলার পরে সব শুনো। যা বলেছি সব করে দিতে হবে, হবে,—হবে। এই বলে যাচ্ছি।

ব্যাঙার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে রওনা দেয়।

উষা ভঙ্গী করে মুখ ভেঙায়, মায়া উষার পিঠে মুখ গুঁজে হাসি চাপে। দেখেও দেখে না কনখল। যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে উষার নির্লজ্জ বেহায়াপনা। অথচ, গুরুজন সম্পর্ক। গুরুজন! মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে কনখল। ধুম্‌সি মুট্‌কি কোথাকার। আচ্ছা, দিন আসুক, দেখা যাবে।

১৩

সে রাত্তিরে আকাশ-ভরা মেঘবাহিনীর কুচকাওয়াজে চাঁদ নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে। ভরা শরতের একাদশী কি দ্বাদশীর রাত। পেঁজা তুলোর মতো ফাঁপা, গাঢ় ফিকে সাদা মেঘের অবিরল হামলা চলেছে হিমক্ষরা আকাশের বুকে চাঁদ, আমলেই আনছে না। মেতেছে লুকোচুরি খেলায়। ক্ষণেকের মুখলুকানো কাটিয়ে উঠছে পরক্ষণে হাসিমুখে উঁকি দিয়ে।

আধখোলা জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে কনখল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছে একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে—ছুটছে কারা? মেঘেরা? না চাঁদ? থেমে নেই কেউ, মনে হয়েছে ওর। চলা, চলা, চলা। সঞ্চরণের অবিরাম রোমাঞ্চ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে চেতনাকে, সচল সুপ্তির বুকে ঢলে পড়েছে একসময়—ঘুম যেন পরম সুখকর তরল ধারা, গা ঢেলে দিয়েছে তাতে।

—আয়েষা, তুই? ভাবছিস খুব চমকে দিয়েছিস? ওই কামিনী গাছের তলা দিয়ে, ভিজে দুর্বোর ডগায় ডগায় টিপে টিপে পা ফেলে, চুপিসারে এসে হকচকিয়ে দিবি ভেবেছিলি বুঝি? আলো-আঁধারিতে কতো আগেই তোকে দেখে ফেলেছি, টেরও পাস নি। ও কি পরেছিস রে! হাঁটুর ওপর ঘাগরা—খালি পা—হাতকাটা জামা—শীত লাগে না তোর? আমার ভাই গা শিরশির করছে। পা দুটো কি জমানো মাখন দিয়ে তৈরী না কি রে তোর? পা ফেলছিস, শব্দ হচ্ছে না একটুও। হাত দুটো কি হাতির দাঁতের? কি ধবধবে লাগছে! দেখি, দেখি, ঠাণ্ডায় গালে ফাট

ধরেছে—টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটোয় পাকা তেলাকুচোর রং ধরেছে। একমাথা ফুরফুরে সোনালী চুল পেলি কোথা? মিশন ইস্কুলে অমনি করে ছুপিয়ে দেয় বুঝি?

জানলায় দাঁড়িয়ে কেন রে? ভেতরে আসবি না? আমি আসব? আসছি দাঁড়া। গোসলখানার দরজা খুলে আসছি। চল, কোথায় যাবি। অত জোরে হাত ঝাঁকাস নে। লাফাচ্ছিস কেন? উঃ, তোর হাত কি ঠাণ্ডা রে।

থেকে থেকে অমন বুকফাটা নিঃশ্বাস কে ফেলছে রে? একটানা গুমরে কাঁদছে যেন। কিছু না,—ঝাউয়ের শন শন? হোক গে—আমার ভালো লাগছে না। তুই হাত ছাড়িস নে। তোর হাতে হাত ধরা থাকলে সব ভালো লাগে আমার। আর কিছু চাই নে। তুই,—তুই—তোকে ছাড়া আর কিছু চাই নে।

আগুনচোখো একটা ডাইনি আসছে দেখ। চুলগুলো সাপের কুণ্ডলী, হাঁ মুখটা লাকাতুরার হাওরের মতো—আলেয়ার মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে দাঁত ক'পাটি—বুক যেন শাহজলালের দরগার বড়ো গম্বুজ দুটো—আমাকে পিষে মারতে আসছে—আয়েষা, আয়েষা—বাঁচা, বাঁচা—

গেছে। কি করে তাড়ালি রে? খালি একটু হেসে? অমন করে সাপটে ধরেছিস কেন বুকের মধ্যে আমাকে? দেখ, কেমন ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবু ভালো লাগছে। আমাকে ছাড়িস নে আয়েষা। ঐ, ঐ—দেখ—আরেকটা, আরেকটা—,শাঁকচুন্নী—কি মিষ্টি হাসি—দু হাত জোড়া। কিসের ভারে—পাচ্ছে না নিতে,—টস টস করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে—বিড়ে বাঁধা চুল—দেখতে সুন্দর, তবু ওটা পেত্নী! তোকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল রে আয়েষা! তোকে দেখে ওরা ভয় পায়, আমি ত পাই নে।

ওই ছোট্ট মেয়ে দুটো কে রে? তুই চিনিস নে? ওরা ভালো—দেখ তো কেমন খেলছে দুটিতে। ওদের গা থেকে নীল আভা বেরোচ্ছে—ঠিক যেন জোনাকী। আয় একটু বসি। তুই বোস ঐ খানটায়, ঐ

পাথর বাঁধানো ঢিবিতে, আমি তোর কোলে মাথা রেখে শুই। এখানে এত মোমবাতি কে জ্বেলে রেখে গেল রে? একটা, দুটো—তিনটে—না, হ্যাঁ, তাই তো, তিনটে ঢিবিতে তিনটে। আঃ, কি আরাম রে।

মাছ ধরবি? চল যাই। মা যদি বকেন? তুই সাথে থাকলে বকবেন না, নারে? মা তোকে ভীষণ ভালোবাসেন। আমার মতো। আরে, ঐ পুঁচকে মেয়ে দুটোও যাচ্ছে রে! যাগগে। ওদের আর আমাদের মতো মাছ ধরতে হয় না। গামছা টান টান করে ধরে দুদিকে দুজনা ধরব, তারপর একটু ঢিলে দিয়ে—হুস্।

কি মজারে। আমার হাঁটু অবধি—তোর ত পায়ের পাতা ডুবেছে খালি। ওকি রে—আর যাসনে—কোমর ডুবল, বুক ডুবল, আয়েষা—ধর ধর এই গামছার কোণাটা ধর—আমি শক্ত করে ধরে আছি। আস্তে আস্তে উঠে আয়—যা ভয় পাইয়ে দিস তুই। ও, তুই ত জলের পোকা—সাঁতার জানিস। আমাকে শিখিয়ে দিবি বলেছিলি? দিয়েছিস? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। তোকে দেখলে আর সব ভুলে যাই ভাই।

দেখ, দেখ, মেয়ে দুটো কি বোকা! জলে নেমেছে। এগিয়ে যাচ্ছে দেখ, যেন ডাঙায় হাঁটছে। ওরে, যাসনে, যাসনে—ডুববি যে, গেল, গেল—ডুবল ঐ। দাঁড়া তুই আয়েষা, আমি তুলে আনছি ও দুটোকে। আরে, তুই-ই ত বললি আমি সাঁতার শিখে গেছি, তবে আর ভয় কি রে। এক ডুব সাঁতারে চুলের মুঠি পাকড়ে নিয়ে আসছি ওদের। তুই আমার কপালে হাত বুলিয়ে দে, এই দ্যাখ, দুশো হাতীর জোর এসে গেছে আমার গায়ে। দিলুম তোর নাম করে ঝাঁপ আয়েষা—আয়েষা—

পুকুরের ওপারের অন্ধকার ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে একটা লোক—মুখভরা দাড়ি, উস্ক খুস্ক চুল। সাঁই জোয়ান।

—হেই খোকা বাবা—ওকি, ওকি, জলে ডুববে যে, থামো, থামো—এই দ্যাখো—ডুবল,—

পেটকোমরে কাপড় বেঁধে জলে ঝাঁপ দেয় লোকটা, ঝপাং। বেশী দূর যায়নি কনখল—তু এক ঢোক ছাড়া বেশী জলও পেটে ঢোকে নি। পায়ের তলায় ঘাড়ের নীচে তুহাত দিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে আনে। ব্যাঙা, ব্যাঙার মা এসে দাঁড়িয়েছে পুকুর পারে। 'খোকা বাবা, জলে ডুববে'—শব্দ বোধ হয় কানে গিয়েছিল, পাগলের মতো ছুটে আসেন নিভাননী। কনাকে বুকে জড়িয়ে বসে পড়েন বাঁধা ঘাটে। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেন নিঃশ্বাস পড়ছে। বুক ঠেলে কান্না উঠলেও ফেটে পড়েন না।

ব্যাঙার বাবা জোর করে ছিনিয়ে নেয় কনাকে নিভাননীর কোল থেকে। ওর তু' পা ধরে সাঁই সাঁই করে ঘোরায় চক্কর দিয়ে। যেটুকু জল পেটে ছিল, বেরিয়ে যায় নাক মুখ দিয়ে। বিধ্বস্ত কনখলকে আর একবার শুইয়ে দেয় নিভাননীর কোলে। বলে,—আর ভয় নেই মা। তুধ গরম করে একটু খাইয়ে দিন, হাতে পায়ে গরম সেক আর লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দিন এবারে। ভোর ত হয়ে এল,—দিনের আলো হলে ডাক্তার ডেকে পাঠাবেন।

ব্যাঙার বাবার চীৎকারে এ বাড়ীতে ঘুম ভেঙেছিল সব প্রথম নিভাননীর। এখন সবাই উঠে গেছে। পাশের বাড়ীর উষা জীবনও এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারীবাবু বুড়ো মানুষ, ঘুমের ওষুধ খান, তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হৃষীকেশ, রহমৎ, হারুণ, ব্যাঙা, ব্যাঙার মা, হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। রহমৎ ভিড় ঠেলে বলে,—তফাৎ, তফাৎ। বলে, পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কনা বাবাকে।

নিভাননীকে হাত ধরে তোলেন হৃষীকেশ। থরথর করে কাঁপছেন নিভাননী। হৃষীকেশের বলিষ্ঠ বুকের সান্নিধ্য পেতেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। হৃষীকেশ কোমরে হাত জড়িয়ে খাড়া করে রাখেন তাঁকে, মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে বলেন, —ভয় কি ভালো হয়ে উঠবে। চলো, ঘরে চলো।

ব্যাঙার বাবার দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশ বলেন,—তোমায় দেখিনি আগে। জানি তুমি কে। শুনেছি তোমার সব কথা। তুমি

আমার ছেলের প্রাণদাতা, আর সব ভুলে এইটেই জেনে রাখলাম। কুঠিতে এসো সকালে। কিন্তু বলো ত, কি করে টের পেলে তুমি?

—হুজুর, ভোর হয়ে যেতে মাঠে যাব বলে বেরিয়েছি, হঠাৎ কচি গলার আওয়াজ শুনলাম। হায়সা, যায়সা, না কি বলে চেঁচিয়ে উঠল যেন কে, তার পরই ঝপাং। তাকিয়ে দেখি খোকা বাবা, জলে হাবু ডুবু খাচ্ছে। খোকা বাবাকে আগে চোখে দেখিনি হুজুর, কিন্তু আজই বাসায় ফিরে ব্যাঙার কাছে শুনেছি। চিনতে এক লহমাও লাগেনি হুজুর।

উষা একমাথা ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসে নিভাননীকে ছাড়িয়ে নেয় হৃষীকেশের বাহুপাশ থেকে। বলে,—চলুন, দিদি—কনার কাছে যাই।

ওঁরা দুজনে চলে যান। হৃষীকেশ বলেন,—হারুণ, চিঠি নিয়ে জাফর সাহেবের ওখানে যাও—এখখুনি। তিনি এসে দেখে যেমন বলবেন,—দরকার হলে ডাক্তার সাহেবের কুঠিতেও যেতে হবে। কাঞ্চনকে নিয়ে যাও—ফেরবার সময় ঘোড়া ডাক্তারকে দিয়ে, পায়দল ফিরবে।

হারুণ মাথা চুলকে বলে,—হুজুর ডাগ্‌দর সাহেব বাইক চড়া শিখে গেছেন। ফিরতি রাস্তায় আমি পিনে দাঁড়িয়ে আসব—তাহলে হুজুর শীগগির হবে। আবার যদি সাহেব ডাক্তারের কোঠিতে যেতে হয়—

—শিখেছেন নাকি? তাহলে খুব ভালোই হ'ল। জলদি যাও।

হারুণকে রওনা করে দিয়ে বাসায় ফেরেন হৃষীকেশ। আর যে যার নিজের বাড়ি ফিরে যায়।

কনখলকে শুইয়ে দিয়ে লেপ কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। মালসায় আগুন জ্বেলে হাতে পায়ে সেঁক দিচ্ছে উষা। নিভাননী ঠায় বসে আছেন মাথার কাছে, ডান হাতের নাড়ী ধরে। রহমৎ দুধ গরম করতে গেছে। ব্রাণ্ডি আছে বাড়িতে—ডাক্তার এসে বললে তারপর দেবেন, ঠিক করেছেন নিভাননী। কনখলের নিশ্বাস স্বাভাবিক

—কিন্তু ঠিক ঘুম নয়, আচ্ছন্ন মতো হয়ে পড়ে আছে। হৃষীকেশ অস্থির পায়ে চুরোট মুখে সামনের বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করছেন।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টির আওয়াজ। অপূর্ব দৃশ্য। জাফর ডাক্তার গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন সাইকেলে—পেছনে পিনে দাঁড়ানো আয়েষা। ভোরের হাওয়ায় চুল উড়ছে। সাইকেল থামতে এক লাফ দিয়ে আয়েষা নেমে দৌড়ে কনখলের খাটের কাছে হাজির।

আয়েষা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। এসেই হ্যাঁচকা টানে উষাকে সরিয়ে দেয়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব নিভাননী হাত ছেড়ে দেন ছেলের। মা যেমন ঘুমন্ত শিশুকে সর্বাঙ্গ দিয়ে নিজের বুকে টেনে নেন, হুমড়ি খেয়ে তেমনি করে কনখলকে জড়িয়ে ধরে আয়েষা। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না—গালে গাল লাগায়, মাথায় কপালে হাত দেয়, হাতের তেলো পায়ের তেলো বুকে মুখে ঘসে। চোখের জলে ভেসে যায় দুগাল। কনখল অচৈতন্য—তবু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে অবিরাম ডেকে যায়—কংখ্, কন্নু কনা ভাই! নিভাননীর চোখে আবার বান ডাকে—হাত বুলোন আয়েষার মাথায়, পিঠে। ধরা গলায় বলেন, –ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ—পাগলী মেয়ে! ভালো আছে, নিঃশ্বাস পড়ছে—

জাফর ডাক্তার এসে নাড়ী ধরে বসেন। পেটে টোকা দিয়ে দেখেন জল আছে কিনা। জিভ দেখেন—চোখের নীচ টেনে রক্ত-হীন হয়েছে কিনা পরখ করেন। ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষার পর বলেন,—কিছু ভয় নেই। একটু সাড় হলে চায়ের চাম্চের দু চাম্চে ব্রাণ্ডি আর এককাপ গরম দুধ, মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। সবটুকু পেটে গেলে, গায়ে জোর পাবে। হার্ট সাউণ্ড, অ্যাস্ফিক্সিয়ার ভয় নেই। তার পর, যদি দরকার হয়, ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। একজ্‌স্সন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এক-দিনেই ভাল হয়ে উঠবে।

মাথায় আঁচল টেনে উষা পাশের ঘরে যায়। নিভাননী যান

দুধ ব্রাণ্ডির তদারকে। জাফর ডাক্তার, হৃষীকেশ বাইরে গিয়ে বসেন। আয়েষা ঘর ছাড়ে না। দুহাতে কনখলের মাথা ধরে বসে থাকে ঠায় একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখের জলের ধারা শুকোয় না, পাতলা দুখানি ঠোঁট যেন কি না-বলা কথা বলতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

বন্ধ শোবার ঘর থেকে ছেলে গিয়ে বাড়ীর পেছনের পুকুরে কি করে পড়ল বুঝে ওঠেন না নিভাননী। তাঁর সামনেই হারুণকে জেরা করে রহমৎ,—তুই শেষ রাত্তিরে কি বলছিলি কবরের কথা?

বাবুর্চিখানার ছাদে চিলে কোঠার মতো খুপরি আছে একটা। রহমৎ আর হারুণ সেখানটায় শোয়। ওখান থেকে মেমসাহেব আর বাচ্চাদের কবর তিনটে দেখা যায় ঝাউগাছের ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। হারুণ বলে,—বিহান হতে কতো দেরী দেখবার জন্য শেষরাতে জানালাটা খুলেছিলাম মা। সামনের কবরের ওপর কে যেন শুয়েছিল, মরাচাঁদের আলোয় দেখলাম উঠে হাঁটতে শুরু করল তলাওয়ের দিকে। মঙ্গলবার কিনা, তাই ভয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম, গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। হাঁটার ধরনটাও জ্যান্ত মানুষের মতো না, ঘুমচোখে হাঁটতে গেলে যেমন এলিয়ে পা পড়ে, তেমনি করে যাচ্ছে মনে হল। খোকা বাবা হতে পারে, আমার একবারও মনে হয় নি মা,—

মঙ্গলবার? নিজেকে শত ধিক্কার দেন নিভাননী। কেন ছেলেকে জোর করে কাছে নিয়ে শুলেন না? প্রথম প্রথম শুতেন। হালে কনখল নিজেই আপত্তি জানিয়ে নিজের ঘরে একা শুত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ান তিনি।

হারুণ বলে চলে,—রহমৎকে বললাম। রহমৎ আরও ভয় লাগিয়ে দিল। বলল, তুই একঠো মরদানা দেখিস নি, দেখেছিস দুটো খুকী। শুনে 'বিসমিল্লা' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম হুজুর। ভয় বেড়ে গেল।

কিন্তু মঙ্গলবার ত আরও গিয়েছে। এমন হয়নি কখনো।

গোসলখানার দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে কনখল নিশির ডাকে ঘুমের মধ্যে, এ ছাড়া আর কি হতে পারে বুঝে উঠেন না নিভাননী। কিন্তু ঘুমের মধ্যে হাঁটা চলা, এ রোগ ত ছিল না কনখলের। সব প্রথম এ সর্বনেশে বাড়ী ছাড়বার কথা বলতে হবে হৃষীকেশকে— সামনের মঙ্গলবার পর্যন্ত আর এ বাড়ীতে নয়। ছেলের অর্ধেক জীবন কাটে কল্পনার জগতে, জানেন তিনি। স্বপ্ন দেখে উঠে গেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার ডাকে? কার ডাক ফেলতে পারে না, কনখল? ব্যাঙার বাবার বর্ণনা মনে পড়ে। জলে ঝাঁপ দেবার আগে 'হায় সা, যায় সা', এমনি কি যেন শুনেছিল সে। শিশির ভেজা গোলাপকুঁড়ির মতো আয়েষার কান্নারাঙা অশ্রুসজল ফুটফুটে মুখখানি মনে পড়ে যায়। সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না কার ডাকে ঘর ছেড়েছিল কনখল। হতাশ আক্রোশে মন গজরায়—তুই কি ওকে প্রাণে মারবি পোড়ারমুখি!

দুধ ব্রাণ্ডিতে এক চামচ মধু দিয়ে নাড়তে নাড়তে পেয়ালা নিয়ে ঘরে যান নিভাননী। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মতো আয়েষা বসে আছে কনখলের মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখে পলক নেই। দুটি হাত দু'হাতে ধরা। নিস্পন্দ কনখলের মুদিত চোখের পাতা একটু কাঁপছে—জাগরণের সাড় ফিরে আসছে বোঝেন নিভাননী।

পেয়ালা টেবিলে নামিয়ে রেখে আয়েষার কানের কাছে মুখ নিয়ে যান। মনের পর্দা আজ নিঃসংশয়ে সরে গেছে—যত ছোটই হোক না কেন, আয়েষা আজ যেন তাঁর সমান সমান। অন্তরঙ্গ সখীত্বের পরমনির্ভর সুর বাজে তাঁর গলায়। মৃদু গলায় বলেন এই দুধটুকু ওকে খাইয়ে দিতে হবে যে এষা।

যেন বিদ্যুৎ-ছোঁওয়া চমকে শিউরে ওঠে আয়েষা। নিভাননীর ওই ছোট্ট কথাটুকুর একাত্মবোধ সঞ্চারিত হয় ওর মনে। এষা? আয়েষা নয়! নিভাননীর বুকের ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে যায় ওর চোখে। দাঁড়িতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—জাগলেই খাইয়ে দিচ্ছি মাসি।

আয়েষা হঠাৎ যেন অনেক বেশী বয়েসী হয়ে গিয়েছে। মাথায়ও ওঁর থেকে বড়ো, আবিষ্কার করেন নিভাননী। নিশ্চিন্ত গলায় বলেন,—তাহলে আমি ওদিক দেখিগে, তুই থাক এখানে।

—পাড়ার কাউকে এঘরে ভিড় করতে বারণ করে দিও মাসি। আর মেশোমশাইকে বলো বাবাকে বলতে, আমি আজ বাড়ি ফিরব না।

—তাই বলতেই আমি যাচ্ছিলুম রে পাগলি,—আজ তোর যাওয়া হয় কি করে ?

শুধু আজ কেন, কোন দিনই যাতে আর না যেতে হয়, এই ব্যবস্থা করতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হতেন নিভাননী। কিন্তু পাগল হলেন নাকি,—মনে হঠাৎ তীব্র বেদনা অনুভব করেন তিনি। হরিণ কখনো সোনার হয় ? তবু রামের ভুল হয়েছিল। ভুলের সুখটুকুও যতক্ষণ সত্যি, ততক্ষণ তার স্বাদ গ্রহণে বিরত থাকতে চায় না তাঁর মন। আজ কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন তিনি ? ভুলের ডাকেই ছেলে প্রাণ দিতে বসেছিল, চকিতে পড়ে যায় তাঁর মনে। কিন্তু সত্যিই কি ভুল ? এত ভালোবাসা, ভালো লাগা, সব যদি ভুল, তবে বিশ্বসংসার চলছে কিসের ওপরে ?

এত বুঝেও কেন ঈর্ষার ভাব উঁকি দেয় মনের আনাচে-কানাচে, আজ সত্যিই বিব্রত বোধ করেন নিজেকে। ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে যেতে যেতে বলেন,—ভালো হয়ে উঠুক, সব শুনিস লোকজনের কাছে। আমার কেমন যেন মাথার ঠিক নেই।

—কিচ্ছু শোনার দরকার নেই আমার। আমি এসেছি, ও ভালো হয়ে উঠবেই।

কার কাছে পেল এই মেয়েটা এমন নিশ্চিত আশ্বাস—যে ও এসেছে, অতএব কনখল ভালো হয়ে উঠবেই ? হিংসা হয় নিভাননীর। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার স্নেহধারায় মন ভিজে যায়। আবার ভুলে যান, যে আয়েষা উদ্ভিন্নযৌবনা পরমরূপবতী রমণী-রত্নই শুধু নয়,—ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনো দ্বেষের ভাব রাখেন না মনে। শুধু বলেন, গলায় মধু ঢেলে বলেন,—জানি।

বলে আয়েষার মাথায় হাত দিয়ে, একটু থেমে, ভেতরে চলে যান, যেন নিঃশব্দে আশীর্বাদ বর্ষণ করে যান বুক উজাড় করে।

কনখলকে চোখ মেলতে দেখে বুক থেকে একটা ভারী জিনিস যেন গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চায় আয়েষার, কষ্টে আত্মদমন করে। প্রায় স্বাভাবিক সুরেই বলে,—কংখ, কনা ভাই—জেগেছিস ?

চোখ মেলেছে, কিন্তু জাগে নি কনখল। মানে, ঠিক জাগে নি। দৃষ্টি তখনো স্বপ্নালু। আয়েষাকে চিনতে পারে। যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে, এমনি করে বলে,—মেয়ে দুটো ভালো আছে ত রে ? বেঁচেছে ? বলে আবার চোখ বোজে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে যায়,—ভাগ্যিস সাঁতারটা শিখিয়ে দিয়েছিলি তুই। তা না হলে কি পারতুম ওদের তুলতে। তুই গামছা টানটান করে ধরার কথা বলতে যেই তাকিয়েছি তোর দিকে, ওই ফাঁকে কখন জলে নেমে পড়েছে দুষ্টু মেয়ে দুটো।

একটি বর্ণও বোঝে না আয়েষা। ভয় পেয়ে যায়। বেশী অসুখে আবোলতাবোল বকে লোকে, তাকে বিকার বলে। তাই হোলো না ত কনার ? কিন্তু জ্বরজ্বালা ত নেই, ভালো আছে—বলে গেছেন বাবা। তবে ? আত্মবিশ্বাসে আর আস্থা আসে না আয়েষার, ভাবে মাসিকে ডাকি এইবার।

নিভাননী যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখে নি। তিনি গিয়ে কনখলের মাথা কোলে নিয়ে বসেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলেন আয়েষাকে। কনখল বিড় বিড় করে বকে যায়,—তবু ভাগ্যিস তুই ডেকেছিলি, তাই না যাওয়া হোলো। না গেলে ত মেয়ে দুটো জলে ডুবেই মরে যেত। কিন্তু তোর হাত কি ঠাণ্ডা রে আয়েষা, জলে মাছ ধরতে নেমেছিলি, তাই। না রে ?

আয়েষা তাকায় নিভাননীর দিকে, চোখের ইঙ্গিতে কথা বলতে বারণ করেন তিনি। আয়েষা নিভাননীর গালে পর পর দুটি হাতই ছুঁইয়ে দেখায় যে ওর হাত আদৌ ঠাণ্ডা নয়। একটু হাসির আভাস ঝিলিক দেয় নিভাননীর ঠোঁটে।

এবার কনখল সত্যিই জেগে ওঠে। খালি জাগা নয়, উঠে বসে একেবারে। ছোট ছেলের মতো মার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল, টের পেয়ে ভাবে, কি হোলো রে বাবা! আয়েষাটা অমন করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন? ওকি সাত রাজার ধন মাণিক, যে দেখে দেখে আশ মিটছে না? হাসতে যায়, একটা ক্লিষ্ট মুখভঙ্গি করা হয় মাত্র। লাফ দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, নিভাননী বারণ করবার আগেই আয়েষা ফেটে পড়ে,—হয়েছে হয়েছে। বসে থাক। নড়বি না। বীরপুরুষ! বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে দাঁতকপাটি খাইয়ে দিয়ে মজা করে ধিঙ্গিপনার মৎলব হচ্ছে! ওকে শক্ত করে ধরে রাখো মাসি, আমি দুধটা দিই।

আয়েষার একী কথার ধরন? মাকেও ধমকাচ্ছে? ওই কি বাড়ীর গিন্নি নাকি? মাও ত ছোট্ট খুকীটির মতন পিট্‌পিট্ করে হাসছেন। আয়েষাটা এলোই বা কখন, আর এসেই সবার ওপর তম্বী করা শুরু করে দিল কেন, বুঝে উঠতে পারে না ও। দুধের কাপ কাছে আনতে মা বলেন,—খেয়ে নে কংখ।

—বা রে--বিছানায় শুয়ে খাই কখনো? উঠি, হাত মুখ ধুই, তারপর চলো খাবার ঘরে—

—ঐ দুধটুকু এইখানেই খেয়ে নে।

—ওতে বিশ্রী গন্ধ—ও আমি খাব না মা।

—গন্ধ ত একটু হবেই কংখ, ওতে যে ওষুধ মেশানো আছে। কাল রাতে তোর শরীর খুব খারাপ হয়েছিল কিনা, তাই ভোরবেলা ডাক্তার সাহেব আর আয়েষা এসেছেন। ঐটুকু খেয়ে তুই এখানেই আয়েষার সাথে গল্প কর, আমি দেখিগে খাওয়া দাওয়ার যোগাড়।

মাথার ঝিম্‌ঝিম্ এখনো আছে। হাল ছেড়ে দিয়ে দুধটুকু একচুমুকে খেয়ে নেয়। ঝাঁজ লাগে খেতে, এত মিষ্টি, তবুও। কিন্তু চট্ করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে যেন। বুকের কাছটায় একটুক্ষণের জন্য সামান্য জ্বালা করে।

কাপ ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আয়েষা এসে পাশে বসে। কনখলের

তুহাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলে,—আমার হাত বুঝি ভীষণ ঠাণ্ডা ?

—কৈ, না ত।

—তবে এতক্ষণ বকছিলি কি ? আমি তোকে ডাকলাম কখন কাল রাতে ? কোন মেয়ে তুটো মরে যেত তুই জল থেকে না তুললে ? সাঁতার শেখালাম কবে আমি তোকে ? সব কথা শুনে তবে আমি ছাড়ব তোকে, বুঝলি বাঁদর ? থাক, থাক, চনমন করতে হবে না যাত্নর। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন ত বাছাধন—

ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে মাথায় চুমো খায় আয়েষা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কনখলের মুখে। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বসে থাকে। এ মেয়েটা কেন যে একসাথে বকাঝকি করে, আবার ফুঁপিয়ে কাঁদে।

নিজের চোখ মুছে সরে আসে আয়েষা। বেশ জাঁতিয়ে বসে, পায়ের ওপর দোসুতি টেনে নিয়ে। বলে,—কনা ভাই, বকেছি বলে কিছু মনে করিস না। আজ আমি এখানে থাকব, মাসি বাবাকে বলে দিয়েছে। এখন একটু ঘুমো তুই, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। তারপর যখন যেমন মনে পড়ে, সব খুলে বলিস আমায়, কেমন ? ঘুমো এখন নিশ্চিন্তি হয়ে—

রাতে একটা বিপর্যয় হয়েছে, সেই তার নায়ক, এই বোধ ধীরে ধীরে জাগে কনখলের মনে। পরিষ্কার কিছু মনে নেই। যতটুকুও বা মনে পড়ে—সেও কাটাছেঁড়া একটানা নয়। আশ্চর্য, হুকুম পাবার সাথে সাথে ঘুমও পায় কনখলের। আয়েষাকে ত্যাখে খানিকক্ষণ চোখ ভরে, তারপর বালিশে মুখ গোঁজে। বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখে আয়েষার কোমর।

নিভাননী এলে তাঁর কানে কানে বলে আয়েষা,—ঘুমোতে বলেছি। ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোনো ভালো, না মাসি ?

—হ্যাঁ মা, ঘুমই ত ওষুধ এখন, তোর বাবাও তাই বলেছেন। তুই পাশ থেকে উঠিস নে, তাহলে আবার জেগে যাবে। কুলসমকে

বলতে বলে দিয়েছি তুই আজ এখানে থাকবি। নড়ছিস কেন—ওঃ, মায়া, মায়ার মা, উষা ওরা এসেছে? তা আসুক। কংখ এখনো আমার কাছে শুলে অমনি করে জাপ্‌টে ধরে শোয়। এই যে দিদি, চলুন ও ঘরে যাই আমরা। একটু জেগেছিল, এক ফোঁটা দুধ খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়েষা থাকুক, কথা বলিগে চলুন। আয়েষা অন্ত প্রাণ, যেন আয়েষাই ওর সব, আমি কেউ না!

রক্ত খাওয়া পেটফুলো জোঁকের মতো উষার দুখানি পুরুষ্টু ঠোঁটের বাঁকা হাসি লক্ষ্য করেন না নিভাননী, কিন্তু আগুনঝরা চোখে আয়েষা তাকিয়ে দেখে, যেন পারলে ভস্ম করে দেবে ওই অশুচি, অমঙ্গলময়ীকে। কনখলের গায়ের চাদর গোছ করে দিতে গিয়ে আড়াল করে তাকে, আগলে রাখতে চায় পাপের অশুভস্পর্শ থেকে।

নাকের ডগা ফুলে উঠছে, সোজাপিঠ, বাঁকাগ্রীবা,—যেন জীবন্ত একখানা শাণিত বাঁকা তলোয়ার। অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেন নিভাননী। যেন সিংহিনী। না সিংহবাহিণী? তেমনি দৃপ্তা, তেমনি মহিমময়ী। আর সবাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনে হয় যেন দিব্য আবির্ভাবের মতো একা আয়েষাই ঘর আলো করে রয়েছে।

১৪

ক্লান্ত, দুর্বল হয়ে গেছে কনখল। সেরে উঠেছে, তবে গায়ে জোর পায়নি। দুদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি, আরো বেশ কিছুদিন হবে না। ছেলের দল, পাড়াপড়শী, প্রথম দিন থেকে আনাগোনা করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে, পারতপক্ষে ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না নিভাননী। আয়েষার বাড়ি ফেরা হয়নি। ওর মা আপত্তি করেননি, এক বাড়ির মতোই ত ছিলো সেদিন পর্যন্ত। দরগার ইমাম সাহেব এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে কনখলকে দোয়া করে গেছেন।

আয়েষা পাহারাদারনীর মতো অষ্টপ্রহর ও ঘরে। নিভাননীকে সুদ্ধ শাসন করছে। ওষুধ পথ্য ওর হাতে খাচ্ছে কনখল। নিভাননীর এক এক সময় মনে হয়েছে বুঝি উনি নিজেই আয়েষার রূপ ধরে ছেলের পরিচর্যা করছেন। মজা লাগছে আয়েষার মাগিরি দেখে।

টুক্‌রো টুক্‌রো কথা আর খবরে ভর করে নিশির ডাকে কনখলের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কাহিনী একটি সামগ্রিক রূপ নিয়েছে। খবর পরিবেশক কনখল নিজেই প্রধান। কিছুটা জাগরণে, কিছুটা আধঘুমে, একটু একটু করে অনেক কথা বলেছে ও। বাকী কিছু বলেছে, হারুণ, রহমৎ ও ব্যাঙার বাবা। গোসলখানার দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার চাক্ষুষ সাক্ষী আশ্চর্যভাবে দাঁড়িয়ে গেছে মায়া। গোল্লাছুটের ময়দানের পর প্রাচীর, তারপর রাস্তা, তার ওপারেই বিদ্যাভূষণের বাড়ি। মায়া ভোর রাতে শোবার ঘরের খোলা জানালা বন্ধ করতে উঠেছিল হাওয়া হিমেল হয়ে উঠেছে বলে। দেখেছে কনখলকে বেরোতে, ঘুমের মধ্যে যদি কেউ হাঁটতে যায়, তেমনি

অবিন্যস্ত পায়ে। যাচ্ছিল বাবুর্চিখানার দিকে, তাই মনে কোনো খটকা লাগেনি। ওর পরেই তিনটে কবর যদিও। উষাকে আড়ালে বলেছে, একটুও সন্দেহ হলে ও নিশ্চয় এগিয়ে আসত লজ্জাসরমের মাথা খুইয়ে। শুনে উষা ঠোঁট উলটে বলেছে, ওসব ছেঁদো লজ্জাহারার ধার সে ধারে না,—ঘুমের মধ্যে হাঁটছে মনে হলে সব ফেলে সে ছুটে আসত কনখলকে রুখ্‌তে।

আয়েষাই স্বপ্নবিহারের নায়িকা, এ তথ্য উদ্ঘাটন করে নিভাননী আদৌ অবাক হন নি, ছেলের মনোজগতের সাথে তাঁর অপরিচয় নেই। কিন্তু আকর্ষণের আকুল প্রকাশে ভাবিতা হয়েছেন। কনা শিশু না হলেও এখনো সাবালক হতে ঢের দেরী। মুখে কিছু ভাঙেন নি তিনি এমন কি হৃষীকেশের কাছেও না। শুধু সবার অগোচরে তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ মেলে আছেন আয়েষার বুকের দিকে। সেখানে কি কোনো তোলপাড় উঠছে? সব কথা শুনেছে আয়েষাও, বোঝবার বয়স তার হয়ে গেছে। আয়েষা কনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা কী রূপ নেবে এসব কথা জানবার পর? সৌহার্দ্যের নিঃশঙ্ক দস্যিপনার সাথে অনাবিল মাতৃস্নেহের মিলন সকৌতুকে দেখেছেন নিভাননী। এবার?

আগে ভাগে কোনো পাত্তা না দিয়ে কে যেন এসে আয়েষাকে ব্রীড়াময়ী করে দিয়েছে। কনার সাথে চোটপাট করে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলার বদলে কে যেন ওর মুখ দিয়ে মিষ্টি কোমল কথা বলিয়ে নিচ্ছে। ঘুমন্ত কনখলের দিকে তাকিয়ে আয়েষা ভাবে, একি দুদিন আগেকার কনাভাই, না বড়ো একজন কেউ। পথ্য দিতে গিয়ে গায়ে ঠেকে গেলে গা শির-শির করে উঠছে, আগে ত কখনো হয়নি। এইত সেদিন এক ঘর লোকের সামনে ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়েছিলো, কেঁদে ভাসিয়েছিলো,—সে কথা মনে পড়তে আকর্ণ লাল হয়ে উঠছে আয়েষার।

বিব্রত বোধ করছে দেহটাকে নিয়ে। খাটো ফ্রক ইজের ছেড়ে নিভাননীর সাড়ী জামা পরেও যেন আবরু সামাল দেওয়া যাচ্ছে না,

মনে হচ্ছে। অথচ দিনের মধ্যে অনেক বার লুকিয়ে মাসির ঘরে বড়ো আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আসতে ভালো লাগছে। শুধু অবাধ্য অঙ্গসৌষ্ঠবেই যে বিকাশ সীমিত ছিল, কনখলের নৈশ অভিযানে কল্পনাসঙ্গিনী হওয়ার গুপ্তকথা জেনে ফেলার পর যেন তার সাথে মনেও রং লেগে, সুরভিসঞ্চার হয়ে, পুরন্ত বসরাই গোলাপের মতো পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আয়েষা।

অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে মন ভরে উঠেছে। সান্নিধ্য অবান্তর, অনাবশ্যক ঠেকছে। যেন জেনে নিয়েছে, মনের বিচিত্র নিগূঢ় কয়েদশাল থেকে মনোচোরের মুক্তির আর কোনো পথ খোলা নেই। কনখলের চৌকী থেকে বেশ দূরে, চেয়ারে বসে ওর ঘুমজড়ানো কচি মুখটির দিকে তাকিয়ে আছে অপলক চোখে। মনের ওপরপাতে বোনা হয়ে যাচ্ছে ছলনাময়ী ললনার কলাকৌশলের ফন্দী-ফাঁদ। নিভাননীর সজাগ চোখের প্রহরা এড়ানোর ফিকির। টানাপোড়েনের মেঘ ও রৌদ্র লুকোচুরি খেলছে মনের মধ্যে।

এতদিনকার স্বচ্ছন্দ সহজ দিনগুলোর আঙিনায় যেন সঙ্গোপনে কে একজনা দেয়ালের আড়াল তুলে কোঠা ভাগ করছে। সে, আর ও, যে একই মানুষ,—এ কথা কি দুদিন আগে নিজেই জানত আয়েষা?

নিভাননী এসে ডাকেন,—ওঠ, নাওয়া খাওয়া করবি চল। ওসব পাট চুকিয়ে আবার এসে বসিস খন। কংখ ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

আয়েষা যে বিছানা থেকে বেশ তফাতে আলাদা চেয়ারে বসে আছে, দেখতে ভুল হয়নি নিভাননীর। ওঁর ডাক যেন মুক্তির হাঁফ ছাড়তে দেয় আয়েষাকে। সে বলে,—চলো মাসি। কিন্তু চেঁচিয়ো না, আস্তে কথা বলো। দেখছ না, সবে ঘুমিয়েছে। উঠে পড়বে আবার।

—আয়ি বুড়ি একেবারে—না কি যে বলে, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, যেন কতো ছেলে মানুষ করে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন! বলে হেসে ফেলেন নিভাননী।

তা তো হয়েইছে,—অনেক ছেলে মানুষ নাই বা করল!

কথার জবাব দেয় না আয়েষা। ধীর পায়ে মাসির সাথে চলে আসে। আগের মতো চাপল্য, কি রঙ্গপ্রিয়তার কোন পরিচয় পান নি নিভাননী। এ যেন আর এক মেয়ে। যেন উপল বাহিনী ক্ষীণ উচ্ছল ঝরনাধারা গভীর দহে আত্মনিমজ্জনের পর গতিবেগ সংহত করে ভরা নদীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে, বেলাপ্লাবিনী আজ অন্তঃসলিলা।

কনখল বিছানায় পড়ে থেকে আর দুটি প্রাণীর অভ্যস্ত জীবন যাত্রায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে। একজন কাঞ্চন। প্রথম দিন সকালে দানার বালতিতে মুখ ডোবাতে গিয়ে সতৃষ্ণ চোখে শুধু এদিক ওদিক তাকায়। চামরের মতো ল্যাজ দুলিয়ে, ঘাড়ের কেশর কাঁপিয়ে, সামনের দু'পা দিয়ে খটাখট শব্দ করে, হারুণকে জানিয়ে দিতে চায় যে পেট ভরলেই খাওয়ার তৃপ্তি হয় না, খাওয়ার সময়কার প্রাত্যহিক সাথীর উপাস্থিতিও একান্ত আবশ্যক। পরের দিন দানার বালতিতে মুখ ছোঁয়াতেই চায় না। লম্বা গলা কাঁপিয়ে 'চিঁ হি হি' শব্দে আবেদন জানায় অনুপস্থিত নিত্যসঙ্গীর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায়।

ওর মনের কথা হারুণ বোঝে না। ভাবে ঘোড়ার তবিয়ৎ ঠিক নেই, সাহেবকে বলতে হবে জানোয়ারের ডাংদর ডাকিয়ে ইলাজ করাতে। জলভরা কুচানো খড়চানার বালতি ঘুরিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করে খাওয়াতে, কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন হারুণের বোকামিতে দিক্‌দারী বোধ করে, খোকাবাবা এসে গায়ে হাত না বুলিয়ে দিলে, চোখের সামনে না দাঁড়ালে, ওর যে খেতে একটুও ইচ্ছে করছে না, এই সহজ কথাটা বান্দার মাথায় কেন ঢুকছে না ভেবে অশান্ত হয়।

আর একজন ব্যাঙা। শুকনো মুখে কনখলের শোবার ঘরের বাইরে জানালার নীচু আলসেয় হেলান দিয়ে বসে চোরকাঁটার শীষ চিবোয়। একটি একটি করে নিপুণভাবে ছোট্ট চালের মতো শাঁস বার করে; দাঁতে কেটে আবার থু থু করে ফেলে দেয়। ভেতরে গিয়ে খোঁজ খবর নেবার সাহস ওর নেই। ওর খোঁজও কেউ

করে না। আপন মনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনো কাজ পায় না। মনে মনে অনেক কিছু করার ফর্দ বানায়—সেগুলো কনখল ভালো হয়ে উঠলে একটির পর একটি করে যেতে হবে সংকল্প করে। তার মধ্যে প্রথমটি অতি সাধু—মানে, কনখলকে সাঁতার শেখানো। সাঁতার জানে না বলেই ডুবতে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে খটকাও আছে, এই কাণ্ডের পর ওর মা কি ওকে জলে নামতে দেবেন! মাকে রাজী করাতে পারে এক আয়েষা দিদি। তার কথা মা, কি সাহেব, কেউ ঠেলতে পারবে না, স্থির জেনেছে ব্যাঙা। তাই করতে হবে; আয়েষাদিদিকেই মুরুব্বী পাকড়াতে হবে। কিন্তু নিজে বলবে কি করে? আয়েষার সাথে ত ওর তেমন ভাব নেই। ঠিক হয়েছে, রহমৎকে দিয়ে বলাবে আয়েষাকে,—চাচা বলে ডাকে, শুনেছে ব্যাঙা। বাকী কাজগুলো এমন কিছু নয়, সে ধীরে সুস্থে করলেও হবে।

ব্যাঙার বাবাকে কাজ দিয়েছেন বাগচি। সুপারিশের দরকার হয়নি সে রাত্রে কনখলকে বাঁচানোর পর। আবেগপ্রবণ মানুষ, তখুনি দশটাকা বক্‌শিশ করতে যাচ্ছিলেন, নিভাননী থামিয়েছেন। চেনেন স্বামীকে। বলেছেন যাতে পরিবারটার স্থায়ী উপকার হয় এমন কিছু করতে। টাকা দুদিনেই ফুরোবে, তারপর ব্যাঙার বাবা আবার চুরি ধরবে। তার চেয়ে মাসব্যবস্থায় কাজ দিলে সৎপথে চলবার উপায় করে দেওয়া হবে। এ সুযুক্তি মেনেছেন বাগচি। আস্তাবল সাফ্ করবার কাজে বহাল হয়েছে নন্দলাল। বিদ্যাভূষণ, হরেনবাবু,—শুনে আপত্তি তুলেছিলেন। প্যারীবাবু ইদানীং আসা কমিয়েছেন, তবে তাঁর তৃতীয়পক্ষ মারফত নিভাননীও প্রতিকূল মন্তব্যই শুনেছেন। কিন্তু গায়ে মাখেননি।

হরেনবাবুর সাথে বাগচির হৃদ্যতা হয়েছে। 'আপনি', থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছেন দুজনে। বাগচি বলেন,—দেখ হরেন, জন্মচোর হয়ে কেউ আসে না পৃথিবীতে, অভাববোধের সাথে সামাজিক নিষ্ঠুরতা মিশে অপরাধীর সৃষ্টি হতে থাকে। ধর নন্দলাল

লোকটা। মোটামুটি সৎগুণ সবই আছে। স্ত্রী ছেলের জন্যে ভাবে, সাহসী, পরিশ্রমী। শুনেছি যখন আগে কাজ করত, চুরি করত না। সাহেব ডাক্তার চলে যেতে কাজ গেল, অপর কেউ দাগী বলে ওকে কাজ দিল না। আবার চুরি ধরল। ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, সে কথা না হয় ছেড়েই দাও। শুধু মানুষ হিসেবেই ওকে একটা সুবিধে দেওয়া উচিত মনে হয়, যাতে আর পাঁচজনের মতো বেঁচে থাকতে পারে।

হরেনবাবু মাথা চুলকোন। দু একবার ঘাড় দুলিয়ে বলেন,—হ্যাঁ, তা কথাটা অযথার্থ বলোনি। ফরিয়াদীর উকীলের সওয়ালের জবাবে বিবাদীপক্ষের গুছানো উত্তর হয়েছে। জজে মানবে একথা। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমরা নিজেরাই হীনমনা হয়ে যাচ্ছি। যে কোনো কারণেই হোক, নন্দ যদি আবার চুরি করে, অথবা, ধরো, ও কিছু নাই করলো—দৈবাৎ পাড়ায় একটা চুরি হয়ে গেল—সেক্ষেত্রেও আমরা বন্ধুরাই হয়ত বলব, যে বাগচি হিতকথা না শুনে একটা চোর পুষেছে।

বাধা পেলে উত্তেজিত হয়ে ওঠা বাগচির স্বভাব। ঝাঁজালো গলায় বলেন,—বলে বলুক আর ঘরের ভাত বেশী করে খাক। অভাবে পড়ে একটা লোক সমাজের বার হয়ে যাবে, আর ক্ষমতা থাকতেও আমরা কিছু করব না, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় মনোভাব।

বিদ্যাভূষণ রসসঞ্চার করে বলেন,—অর্থাৎ প্রাকৃতকে কিঞ্চিৎ সাধু-ভাষার প্রলেপ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমাজবাসীরা মোটামুটি 'ভাত দেবার ভর্তা নন্, কিল মারবার গোস্বামী'। কেউ নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে চায় না, বুঝলে হরেন,—সবাই নির্ঝঞ্ঝাটে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়। যুগের হাওয়া এই দিকেই বইছে। বাগচির সুস্থ সবল মনে এখনো আদর্শভঙ্গের জরা আক্রমণ করেনি। করতে দাও ওকে যা চায় তাই।

সর্বান্তঃকরণে বাগচির মতের সমর্থন হরেনবাবুর মনে। কিন্তু মুখে বলেন,—যা বলেছেন দাদা। যা মতলব করেছো তাই করো

হে সাহেব, ঘা খেতে খেতে তবে ত আমাদের মতো ঝুনো হয়ে উঠবে। তবে অন্দরে ঢুকতে দিয়ো না, ঐ বাইরে বাইরে যা করবার, করুক।

—ভেতর বাড়ির কাজ ত দেব না, নন্দ খালি আস্তাবলের কাজ করবে।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেন হরেনবাবু। বলেন,—বাড়ি বদলের মতলব আছে নাকি এখনো?

—থাকলেই বা পাচ্ছি কোথায়। হ্যাসেটকে বলেছিলুম নিরাপদ জায়গায় একটা বাংলোর জন্যে। তেমন বাড়িই নেই বর্তমানে। তবে বলেছে যে পুজোর পর জয়েণ্ট ছুটো কোথায় যেন সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যাবে, ঐ পুলিশ হাসপাতালের টিলার বাসাটাই আবার পেতে পারি।

ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে কনখল যথারীতি মজলিসের গল্পগুজবে কান খাড়া করে রেখেছিল—বিশেষ করে প্রকাশদার সম্বন্ধে কোন কথা হয় কিনা শুনবার ইচ্ছেয়। শরীর দুর্বল—ওঠা এখনো বারণ। কিন্তু বাবার শেষ কথাটুকু শুনে ওর সমস্ত দৌর্বল্য গেল উবে—এক লাফে নেমে অন্দরে ছুট—

—মা, মা,—আয়েষা শোন্—মা গো, কোথায় তুমি—

বিকেলের চুলবাঁধার আসর দুদিন বসেনি। মা রান্নাঘরের দাওয়ায় চা জলখাবার সাজাচ্ছেন—ঠাকুর দিয়ে আসবে বাইরে। আয়েষা উঠোনে গাঁদাগাছগুলোর পাশে মোড়ায় বসে আছে। কনখলকে পাগলের মতো ছুট্তে, আর 'মা, মা' করে আর্তনাদ করতে দেখে ধড়মড়িয়ে দাঁড়ান নিভাননী।

—কি, কি হয়েছে কংখ—কাঁপছিস যে—

সাপটে ধরেন ছেলেকে। নিজে বসেন, ওকে বসান। আয়েষা উঠে দাঁড়ায়—একটি কথাও বলে না; শুধু ঠোঁটদুটো হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায়—অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—না কাঁপিনি। শোনো মা, ভীষণ ভালো খবর। বুঝলি মুখপুড়ি—কি দিবি বল। বাবা নিজে বলেছেন। মা গো—পুজোর পর হবে কবে? কদ্দিন আছে আর পুজোর?

স্বাভাবিক রং ফিরে আসে আয়েষার মুখে। নিভাননী বোঝেন, ছেলের কোনো দুঃসংবাদ নয়। বলেন,—বোস ত ঠাণ্ডা হয়ে। হ্যাঁরে, তোর না ওঠা বারণ? আজ খাবি আয়েষার কানমলা। কিন্তু খবরটা কি শুনি?

—পুজোর পর—বুঝলে মা—আমরা যাব আবার সেই বাড়ী—সেই বাড়ী—সেই বাড়ী—নাচ তে নাচ তে প্রায় গানের সুরে বলে কনখল।

—অত দাপাস্ নে—মাথা ঘুরবে। বোস চুপ করে। কিসের বাড়ী, কোন বাড়ী, খোলসা না করে বললে বুঝব কি করে?

—পূজোর পর আমরা আবার পুরোনো বাড়ীতে যাব—আয়েষা-দের পাশের বাড়ী। বুঝলে?

ছেলের আনন্দের কারণ আঁচে বুঝেছিলেন নিভাননী, তবু বলেন,—সে ত এখন জয়েণ্ট সাহেবদের বাংলা। তারা যাবে কোথায়?

—সে জানিনে—ক্যাম্পে না কোথায় যেন যাবে পুজোর পর। হ্যাসেট সাহেব বাবাকে বলেছে, সে ত আর মিথ্যে বলবে না? তুই যে একদম চুপ আয়েষা, তোর মজা লাগছে না?

আয়েষা সত্যিই নির্বাক হয়ে আছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলছে চোখে, মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু চট করে বলে না কিচ্ছু। বেশ ধীর স্থির গলায় জবাব দেয়,—লাগছে বৈকি। এখানে ছিল পুকুর, ডুবে মরতে গিয়েছিলি। ওখানে গেলে শুরু হবে পোলো, ঘোড়া থেকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবি। আমার হয়েছে জ্বালা, কোনদিক যে সামলাব—

বলে ধীরে সুস্থে উঠে রওনা দেয় ঘরের দিকে। নিভাননী আয়েষার পাকাপাকা কথা বলার ধরনে হেসে ফেললেও ভানটুকু তাঁর চোখ এড়ায় না। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। কনখল তড়াক করে উঠে আয়েষার এক হাত ধরে ঝাঁকি দেয়, টানতে টানতে ঘরে নিয়ে দুহাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে বলে,—এমন খবর শুনেও মুখ গোমড়া করে রইলি তুই।

এইবার আয়েষা কনখলের কপালের চুল আঙুল দিয়ে নেড়ে দিতে দিতে বলে—তুই কি ছেলেমানুষ রে! একদম পাগলা! ভালো লাগছে না? তুই বুঝতেই পারবি না আমার কত ভালো লাগছে। তাই বলে মা মাসীর সামনে লাফাবো নাকি তোর মতো? আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি না?

—এক দু দিনে কেউ বুঝি বড় হয়ে যায়? ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে আমাকে। আসলে তুই আর খুশী নোস আমরা ফিরে যাব শুনে। তাই না রে?

আয়েষার চোখ দিয়ে জল পড়ো পড়ো দেখে হতবাক হয় কনখল। আয়েষা চোখে আঁচল ঢেকে নিভাননীর কাছে ফিরে গিয়ে কোলে মাথা লুকিয়ে কাঁদে। পেছন পেছন গিয়ে কনখল দাঁড়ায়। মা বলেন,—কি হোলো আবার দুজনে? ভালো হয়ে উঠলেই খুনসুড়ি আর ঝগড়া ঝাঁটি—

—শুনছো মা—ঝগড়া টগড়া কিচ্ছু হয়নি। আয়েষা বলে কি, যে আমরা ফিরে ঐ বাসায় যাব জেনেও আগেকার মতো খুশী হতে পারছে না ও, এখন নাকি বড় হয়ে গিয়েছে—তাই আমি বললুম—

কনখলের পায়ে ছোট্ট করে লাথি কসিয়ে দেয় আয়েষা। কনখল তিড়বিড় করে ওঠে—দেখলে, দেখলে তোমার আহ্লাদীর কাণ্ড? দাঁড়া তবে—

নিভাননী সামাল করেন ছেলেকে, জড়িয়ে আয়েষাকে আরো কোলে টেনে নিয়ে বাঁচান কনখলের উদ্যত আঁচড় কামড় থেকে। বলেন,—তুই কি বুনো হয়ে যাচ্ছিস্ রে কংখ্! মেয়ে লোকের গায়ে হাত তুলতে আছে কখনো?

—আয়েষা বুঝি মেয়েলোক? ও ত মেয়ে খালি! আর, পাজী আর দুষ্টু মেয়ে।

—তা ত বটেই রে—এই দুদিন পাখীর ছানার মতো কে বুকে করে রেখেছে তোকে? ঘুমের মধ্যে ঠোঁট ফাঁক করে কে ওষুধ পত্তর খাইয়েছে? কে সারারাত ঘুমোয় নি, ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে বসে

থেকেছে? আজ গায়ে একটু বল পেয়েই তারই সাথে লাগাচ্ছিস এসে! তুই কি অকৃতজ্ঞ রে কংখ্!

সেবা শুশ্রূষার ফিরিস্তি শুনে অপ্রতিভ হয়ে ঢোক চেপে কনখল। থতমত খেয়ে বলে,—তবে কেন আমরা ও বাড়ী ফিরে যাব শুনে ও খুশী হয়ে লাফিয়ে উঠল না? কেন মিছেমিছি বলল যে ও এখন বড় হয়ে গিয়েছে! যত সব—দুষ্টুই ত, খুব দুষ্টু—

বলতে বলতে দৌড়ে পালিয়ে যায় নিজের ঘরে। গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

চোখ মুছে নিভাননীর কোলের ভিতর থেকে আয়েষা মাথা তোলে।

—আমি ত সত্যিই বড়ো হয়ে গিয়েছি মাসি! আচ্ছা, তুমিই বলো, ওর সাথে তাল রেখে নাচলে কুঁদলে মানায় এখন আমাকে?

নিভাননী একটু অদ্ভুত হেসে যেন আপন মনেই বলেন,—বড়ো হওয়া থামিয়ে আবার ওর সমান সমান হবার চেষ্টা কর দেখি, স্বস্তি পাবি। চল চুল বেঁধে দিই গে—আজ আবার ফিরতে হবে তোকে রে, খেয়াল আছে?—মনে মনে ভাবেন তিনি, প্যাঁচামুখো হওয়া কত সহজ এ জীবনে। খুশীতে ফেটে পড়া কতো কঠিন!

আয়েষা ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, আছে। মুখভাব মোটেই বেজার দেখায় না। বেশ শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটির মত চুল বাঁধতে যায়।

বিছানায় শুয়ে চুপচাপ ভাবে কনখল। বড় হওয়া মানে কি পর হয়ে যাওয়া? দূরে চলে যাওয়া? তাহলে মা, বাবা, এত নিজের কেন, কাছের কেন? ওঁরা ছাড়া আয়েষাই ওর সবচেয়ে আপন। না হয় হোলোই বা বড়! তাই বা কখন হোলো, কি করে হোলো, বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পায় না। আচ্ছা, ধরাই যাক্, বড় হয়েছে। তা বলে পর হয়ে যাবে?

বেশ। সেও বড় হবে এখন থেকে। 'পর পর' হবার খেলায় দেখিয়ে দেবে আয়েষাকে এক হাত। আলাদা করে ছিনিয়ে নেবে নিজেকে সব ভাল লাগার লোভ থেকে। হার মানবার ছেলে সে

নয়। অমৃত বলেছিল, জীবন ভোর কত মার খেতে হবে। এও কি মার? মারই ত! লাগছে যে, ভীষণ লাগছে! বুক ফেটে যাচ্ছে!

শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কনখল। রুদ্ধ অভিমানে ঠোঁট ছুটো ফুলেই থাকে। জানতে পারে না, কখন কে এসে ওর ঘুমন্ত কপালে ছুটো কম্পিত নরম ঠোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়, রেখে যায় অবিন্যস্ত চুলের রাশে কান্নারাঙা একজোড়া চোখের ঝরঝরে কয়েক ফোঁটা জল।

১৫

কাজীর বাজারের আগুন কবে থেমে গেছে, শহর শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিপিন বেণী খুঁচিয়ে আবার জ্বেলে তুলছে নেভা আগুন. প্যারীবাবু ঢালছেন ঘি।

বিকেলের মজলিশে হরেনবাবু তীব্র ভাষায় বলেন,—এখনো ব্যাপারটা ধোঁয়াটে আছে তোমাদের কাছে? বুঝলে না সাহেব, এক আঁটি ভিজে পাট—এক টিন কেরোসিন—একটা দেশলাই-এর কাঠি। ব্যস্; ম্যারিনফায়ার কোম্পানীর কাছ থেকে কড়কড়ে ত্রিশহাজার নগদ, সেই সাথে যারা বিয়েতে বাগড়া দেবার জন্য কোমর বেঁধেছিল, তাদের শ্রীঘর বাস,—God Save the King!

মজলিশ মানে ওঁরা তিনজন, হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ আর হৃষীকেষ। প্যারীবাবু একদম আসা বন্ধ করেছেন। কনখল শুনেছে উনি নাকি আজকাল দারোগা পুলিশ উকীল মোক্তারদের দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভেতর বাড়িতে ঊষা আসে, কিন্তু সে ঊষা আর নেই। হাসিখুশি ঢলাঢলি উবে গেছে, সবায়ের মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া হয়ে থাকে। আগে ওকে আড়ালে পেলেই এগিয়ে আসত অন্তর-টিপ্পনি কাটতে—এখন দেখা হলে শুধু বোকার মত হাসে—নিষ্প্রাণ ফিকে হাসি।

নিকটতম প্রতিবেশী সম্বন্ধে হরেনবাবুর রূঢ় সত্যভাষণ অপ্রিয় বোধ হয় হৃষীকেশের। যদিও অভিযোগগুলির প্রত্যেকটিই যথার্থ বলে মনে মনে মানেন তিনি। একদিন এ মনোভাব প্রকাশ করেও-ছিলেন নিভাননীর কাছে। বলেন,—হতে পারে, কিন্তু হরেন, যে

ব্যাপারটা এখনো তদন্তসাপেক্ষ, এবং পরে হয়ত মামলার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে আগেভাগে চরম ফতোয়া দিয়ে দেওয়া একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?

—তোমাকেও ত জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নর্টন ?

—হ্যাঁ,—আমি যতটুকু দেখেছি, বলেছি। আগুন লাগার কার্য-কারণ কিছুই জানিনে। নেভানোর বিলিব্যবস্থা করেছি, ব্যস্ এইটুকু !

—কিন্তু কি শুনেছ না শুনেছ, তাও ত জানতে চাইবে ?

—চেয়েছে। শোনা কথা বলব না স্থির করেছিলাম, বলিও নি। চোখে যা দেখেছি তার বাইরে কোনো এজাহার আমি দিই নি।

—আমাদের ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুকে ডেকেছিল কেন ?

—নিবারণের কথায়। নিবারণ ছেলেটি অত্যন্ত গরীব, জানো বোধ হয়। রাত্তিরে সমাজমন্দিরে রাতপাহারার কাজ করে কিছু পায়। তাই দিয়ে আর জলপানি পেয়ে পড়াশুনা চালায়। নিবারণ বলেছে যে সে আগুন লাগার রাত্তিরে সর্বপ্রথম প্যারীবাবুর গুদাম জ্বলে উঠতে দেখেছে। সে তখনো রাত জেগে পড়ছিল। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি—আগুন আশে পাশে ছড়িয়ে পড়তেই সে দৌড়ে পরেশবাবুর বাসায় গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে ঘটনা জানিয়ে সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে ছোটে। পরেশবাবু মনিব, তাঁকে না জানিয়ে পাহারা ছেড়ে মন্দির থেকে যেতে পারে না বলে প্রথমে তাঁকে খবর দিয়েছে।

—পুলিশের কেস্ ত ঠিক উলটো। নিবারণ এবং তার দলের অর্থাৎ গীতা সোসাইটির পাণ্ডারাই নাকি বিলিতী কাপড়ের দোকানে আগুন লাগায়, তার থেকে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

—পরেশবাবুর কথায় সে কেস্ ভণ্ডুল হয়ে যাবে মনে হয়। তিনি বলেছেন, নিবারণ ত খবর দিতে ছুটল, তিনি মন্দিরে এসে আগুন দেখলেন প্যারীবাবুর গুদামে, ও তার আশপাশের দুচারখানা দোকান ও গুদামঘরে। বিলিতী কাপড়ের দোকান আগুন থেকে সাত আটটা ঘর পরে—আগুন তখনো সে পর্যন্ত পৌঁছয়ই নি।

—তাহলে ত কেস্ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—

—তা ত দাঁড়াচ্ছেই। শুনলুম, কলকাতা থেকে বিলিতী ইন্সিওরেন্সকোম্পানীর একটা সাহেব এসেছে ক্ষতির পরিমাণ তদারক করতে। রবার্টসনের বাসায় আছে। প্যারীবাবু খেসারৎ বাবদ যে টাকা দাবি করছেন, অত টাকার পাট তাঁর মজুত ছিল কিনা খোঁজ খবর নিচ্ছে। প্যারীবাবু নাকি এফিডেবিট করেছেন পঞ্চাশ হাজার কত টাকা কত আনার পাট ছিল।

—এফিডেবিট করে থাকলে হিসেব পত্তরও আছে। দাগ বই আর জাবেদা থেকে ঠিক প্রমাণ করে দেবেন খন। রসিদ ভাউচার তৈরি করবার বহুৎ টাইম পেয়ে গেছেন।

বিদ্যাভূষণ এইবারে ফোড়ন কাটেন—'অল্পস্য হেতোর্বহুহাতুমিচ্ছন, বিচারমূঢ়োপ্রতিভাসি মে ত্বম'।

—ত্রিশ হাজারের বীমা কি অল্প হোলো ভটচায? আর বিচারমূঢ় কাকে বলছো হে, এ যে ফৌজদারী—ফাঁসীদ্বীপান্তরের ব্যাপার। অবিশ্যি যদি সন্দেহ ঠিক হয়।

হরেনবাবু অভিজ্ঞ উকীল হলেও কথার তোড়ে মাত্রা হারান। তাঁর মন্তব্যে বিচলিত বোধ করেন আর দুজনা। এই সময়ে দেখা যায় প্যারীবাবু আসছেন, তাঁর সঙ্গে বিপিন কার্লাইল। বিদ্যাভূষণ টিনের কৌটো খুলে আর এক দফা তামাক সাজেন, কল্‌কের মাথায় টিকে ধরিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে থাকেন, চোখ থাকে আগন্তুকদের দিকে। তাঁরা এসে বসবার পর প্রথম প্রথম একটা অস্বস্তিকর নীরবতা থম থম করতে থাকে।

কইয়ে বলিয়ে মানুষ হরেনবাবু। কথা তোলেন,—এই যে, খবর বার্তা কি মশায়, ব্যাপার ত বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে শুনি।

—না না, ঘোরালো আর কি। তবে জোর তদন্ত চালাচ্ছে বটে পুলিশ।

—শুনলুম নাকি ফকির সন্ন্যাসী কাউকে রেয়াৎ করছে না, সবায়েরই তলপ পড়ছে?

—ফকির সন্ন্যাসী ? কই, তাত কিছু জানি নে।

—ঐ একই হোলো, প্রচারক পরেশবাবুকে নাকি ডেকেছিল নর্টন। চোখ বুঁজে ভজনপূজন করেন, একপ্রকারের সন্ন্যাসীই বলা চলে তাঁকে।

পরেশবাবুর উল্লেখে প্যারীবাবু অপ্রসন্ন হন। উত্তেজিতও। বল্লেন,—যত সব বুজরুক, বুঝলেন মশাই! করছেন ত চোখ বুঁজে নিরাকার ফক্কিকারের উপাসনা, তা করুন। তা নয়, ইনিয়েবিনিয়ে যা মনে চায় বলে এলেন ঐ দেড়ে ভদ্রলোক। আরে মশাই, নিবারণ ছোঁড়া আগুন দেখে ছুটই যদি লাগালো, তোমাকে সাত তাড়াতাড়ি তার বৃত্তান্তই বা বলতে যাবে কেন, আহা তাই করে কেউ ? একটা বাজার পুড়ছে দাউ দাউ করে, তখন 'জল আনো, জল ঢালো' করবে, না বানিয়ে গল্প করতে যাবে আর এক বাড়ী ? বিপিনবাবু ঠিক এঁচেছেন—তলে তলে ঐ ভণ্ডতপস্বী বোমার দলের লোক না হয়ে যায় না।

হৃষীকেশ ভয়ানক চটে যান। পরেশবাবু সম্বন্ধে অশিষ্ট উল্লেখ অমার্জনীয় লাগে। রাগ চাপবার চেষ্টায় ঠাট্টার সুরে বলেন,—এই ত আবার কথাবার্তা সিডিশনের লাইনে যাচ্ছে। স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার, থিওসফি, হ্যালীর ধূমকেতু, করোনেশন—সব চলবে মশাই আমার এখানে, কিন্তু বোমাবারুদ চলবে না।

হরেন বলেন,—সত্যিই ত। বেচারা 'বাবু'র বর্বরতা থেকে 'মিষ্টারের' মিষ্টত্বে পৌঁছবার জন্যে প্রাণপাত করছে এখন, তার বাসায় কিনা—

—বড়ো বাজে বকো হে হরেন, জিভ নয় ত আরবী ঘোড়া! তারপর, বিপিনবাবু, আপনার ঝঞ্ঝাটও ত কম যাচ্ছে না। স্কুলের কাজকর্মের পর এ সব নিয়ে ছোটাছুটি—

মুখফোঁড় হরেন চিপটেন কাটেন,—আদৌ 'অব্যাপারেষু' নয়, বরং 'সমব্যাপারেষু'। স্কুলে ছেলে পড়ান, এখন সাক্ষী পড়াচ্ছেন। আমাদের রুজি রোজগার গেল আর কি। তা কজনকে ভেড়ালেন

মশাই, যারা স্বচক্ষে নিবারণদের আগুন লাগাতে দেখেছে?

বিষপিঁপড়ের কামড়ের মত হরেনের কথায় জ্বলতে থাকেন বিপিনবাবু। কিন্তু তিনি গভীর জলে লীলাখেলার জীব। হাতের তেলো ঘষতে ঘষতে টিকটিকির ল্যাজের মতো গোঁফের ডগা জিভ দিয়ে চাটেন। মুখে 'চুক' করে একটু আওয়াজ করে গলায় মধু ঢেলে বলেন,—কী যে বলেন স্যার, আপনারা উকীলরা হলেন অ্যাজিটেটর, আপনাদের দেখে ইংরেজ ডরায়। আমরা হলুম গে চুনোপুটি ক্লাস, তবে রাজভক্ত। যথাসাধ্য রাজপূজা করি.—মানে ডিউটি হিসেবে'—

—আর ডিউটি হিসেবেই বলির জন্যে কচিপাঁঠা সংগ্রহ করে বেড়ান। কী হিড়িকই আনলে ক্ষুদিরাম! মাফ করো সাহেব, আর বলব না। তা বিপিনবাবু, সে গল্পটা জানেন তো? যার হাতে খাঁড়া, বলির সময় সে বে-এক্তার হলে কি হয়? মহেশ মাতালের নাম শোনেন নি বোধ হয়, একবার কালীপুজোর পাঁঠা ছেড়ে ধরুনীর ধড়মুণ্ডু ফারাক করে দিয়েছিল। দেখবেন, কচি ছেড়ে ধাড়ীর গলায় কোপ না পড়ে।

হৃষীকেশ বোঝেন হরেনকে থামানো যাবে না। তেজী, খাঁটি মানুষ সে, তার উপর ভেতরে ভেতরে তেতে উঠেছে। চট্ করে বুদ্ধি মাথায় আসে—কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন,—শুনেছ হরেন, আরে তোমাকেও ত বলা হয় নি। বড়দিনের আগেই দিল্লীতে দরবার হচ্ছে জানো ত? মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী—সে এলাহী ব্যাপার। স্থানীয় আমীর ওমরাওদের নামের ফর্দ চেয়ে পাঠিয়েছে ঢাকা থেকে। বড়লাট হার্ডিঞ্জ তাঁদের শাহ্‌জাঁহার সাথে ভেট্ করিয়ে দেবেন, চাই কি, করমর্দনের সুবিধেও করে দিতে পারেন। ভীষণ সম্মানের ব্যাপার। শিলেট থেকে তিনটে বেসরকারী নাম চেয়েছে—দু'জন মুসলমান।

—তা হলে ত হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড হে! ঐ যে তোমাদের গ্রন্থাবলীর কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়—এবার পূজায়, থুড়ি, বড়দিনে

গুদাম সাবাড়! তা, নাম পাঠানোর মালিক ত হ্যাসেট?

—আর কে হবেন,—উনিই যখন জেলার মালিক।

হ্যাসেট বাগচির বাসায় আসেন, মেশেন, কনখল-নিভাননীর সাথে খানাপিনা করেন, এসব সমাচার সুবিদিত। অ-মুসলমান দরবারীটি নিজেও হতে পারেন, এ দুরাশা আছে প্যারীবাবুর। দরবারের গোপন সংবাদ অজানা নয় ওঁর। আদত কথা, সেই বিষয়েই একটু বাজিয়ে দেখবার জন্যে আজকে আগমন। বলেন,—মালিক হলে কি হয়, আপনাকে খুব স্নেহ করেন। জানি, আর নিজ চোখেই দেখছি ত সব! যা দহরমমহরম আপনার সাথে,—

মনোগত অভিপ্রায়টি অব্যক্তই রাখতে চান তিনি, কিন্তু নাছোড়বান্দা হরেনবাবু ছোঁ মেরে বক্তব্যটি খুঁটে বার করে বলেন,—অতএব, দাও প্যারীবাবুর নামটা সুপারিশ করে। তা মন্দ কি হে বাগচি—রাজভক্তিতে প্যারীবাবুর জোড়া মেলা ভার, অবিশ্যি বিপিনবাবু ছাড়া—

বিপিন কার্লাইল চালাকের হদ্দ। সবিনয়ে নিবেদন করেন,—মশাই, দরবার হোলো উচ্চস্তরের ব্যাপার—রাজাগজার মজ্‌লিশ। আমরা দূর থেকে ভক্তি জানিয়েই সন্তুষ্ট,—যথাস্থানে যদি পৌঁছয়, জীবন সার্থক মানি।

—অর্থাৎ দীন ভৃত্য। প্রভুর ছেঁড়াছুটো শালটা লপেটাটা ইনাম পেলেই খুশী। এক ফরাসে মাইফেলে বসবার এলেমদার নই। হক্ কথা। এ কথা জজে মানবে। তা, আমি খালি ভক্তির দিকটাই তুলনা করছিলুম।

বিপিনবাবুর সাথে দরবারী তক্‌রার অযথা মনে হয় প্যারীবাবুর। সোজাসুজি হৃষীকেশকে জিজ্ঞেস করেন,—নাম বাছাই কি হয়ে গেছে?

—কি করে জানব বলুন, খোদ কর্তা নিজে এসব করছেন। এ পর্যন্ত আর কারো সাথে সলাপরামর্শ করেছেন বলে শুনিনি। খবরটা জানি, আপিসে আর সবাই যেমন জানে,—এইটুকু।

—তা হলেও ফাইন্যাল করার আগে কি আর আপনাদের সাথে

আলাপ আলোচনা হবে না—হবেই। এখন কথা হচ্ছে যে প্রথম লিষ্টে কার কার নাম থাকছে, সেইটে জানা দরকার,—

বলে চুপ করে যান প্যারীবাবু। কাছারীর আমলাকারকুনের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করবার কলকাঠি জানা আছে তাঁর। হাকিমহুজুরে জাহির করবার মতো বিদ্যা নয় সেটা।

এমন সময় দেখতে পাওয়া যায় পুলিশ সাহেব চলেছেন টম্ টম্ হাঁকিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের মোড় ঘুরে বন্দর বাজারের রাস্তায়। সাথে আর একটা সাহেব, চেনাজানা স্থানীয় অফিসার কেউ নয়। নিজেরাই গল্প করতে করতে যায়, বাগচির বারান্দার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। টম্‌টম্ অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও বিপিনবাবু আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো কপালে ঠুকে ঠুকে কুর্নিশ জানাতে থাকেন।

হরেনবাবু বলেন,—থামুন মশায়, গাঁট্টা খেয়ে কপাল ফুলে উঠলো যে! ওরা আদপেই এদিকে তাকায়নি, আর এখন ত চলেই গেছে।

—হেঁ হেঁ—আমার সঙ্গে একটু ইন্টিমেসি আছে কিনা,—মানে, খবরটা আস্‌টা দিতে যাই ত কখনো সখনো, তাই—ধরুন না, আবার যদি অফেন্স নিয়ে বসেন—

প্যারীবাবু ছাড়া আর সবাই হেসে ওঠেন। বিদ্যাভূষণ বলেন, —ইস্কুলে ইন্‌সপেক্টর এলেও কি এমনি সেলামের বহর ছোটান?

—তা সাহেব হলে করতে হয় বৈ কি,—ওরা হোলো রাজার জাত। আর পুলিশ সাহেব ত কাঁচাখেগো দেবতা, আজকালকার জ্যান্ত বিগ্রহ। বলা ত যায় না কিছুই, সেলাম না করাটাই হয়ত নোট করল। কিন্তু সঙ্গে ওটা কে,—নতুন বলে মনে হোলো যেন,—

—কোনো হালের আমদানি প্ল্যাণ্টার হবে হয় ত। আমরাও চিনি নে।

হৃষীকেশ জানেন কে ওটি। রবার্টসনের বাসায় উঠেছে কলকাতা থেকে আসা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহেব। নর্টনের সাথে এ পাড়ায় দেখে আন্দাজও করেন কারণ। মজুত পাটের

এনকোয়ারী। ভাঙেন না কিছু মুখে। শুধু বিস্মিত হন প্যারীবাবু খোঁজখবর রাখেন না দেখে। অথচ প্যারীবাবুর সমস্ত দাবিদাওয়া নির্ভর করছে ঐ সাহেবটির তদন্তের ওপর।

—মুসলমানদের মধ্যে কারা থাকবেন? আপন মনেই জিজ্ঞেস করেন প্যারীবাবু। সাহেবদের বিষয়ে ভাবেন না কিছু। হরেনবাবু বলেন,—আপনার মাথায় দরবারী কাড়ানাকাড়ার বাদ্যিই বাজছে বুঝি? তা গণিমিঞা ত একজন বটে, আর একজন সম্ভব পাঁচআনীর মজমাদার। কি বলো হে বাগচি?

বাগচি কিছুই বলেন না। নেভা চুরোটে দুটো বিফল টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

বিদ্যাভূষণ বলেন,—ওঠা যাক্, সন্ধে আহ্নিকের সময় হোলো। সাহেব সুবো আর আমীরওম্‌রাদের নাম জপে ইডেন-বেহেস্তের পথ সাফ্ করো তোমরা, আমি যাই, বৈতরণী পার হবার কড়ি সঞ্চয় করিগে। যাবে নাকি হরেনভায়া,—চলো।

ওঁরা দুজন উঠে গেলে প্যারীবাবু খাটো গলায় হৃষীকেশকে বলেন,—হরেনবাবুর কাঠখোট্টা বচনগুলো বড়ো বিশ্রী, বাগচিসাহেব। আর বিপিনবাবুর ওপর উনি যেন জাতক্রোধ।

—আরে না, না—ওর রসিকতাই অম্‌নি! মধু ঢালার সাথে হুলও ফোটাতে ছাড়ে না। আর উকীল মানুষ কিনা, বকে একটু বেশী। তা ওরাইত হল আজকাল পাব্লিক ওপিনিয়ন। অ্যাজিটেশন বলুন, ডেপুটেশন বলুন, ওরাই হোলো লীডার।

—সেটা সত্যি কথা। হালে গভর্ণমেণ্ট বরদাস্তও করছে এসব। পার্টিশনও নাকি রদ হয়ে যাবে বলছেন ওঁরা। কার্জনের সেটেল্‌ড ফ্যাক্ট নাকি নাকচ হয়ে যাবে।

চাকুরের পক্ষে দুষ্য প্রসঙ্গ আবার উঠে পড়ছে দেখে হৃষীকেশ অশান্ত হয়ে ওঠেন। বলেন,—হয়, হবে। আমরা যা করছি, তাইই করে যাব, অর্থাৎ চাকরী। কাজ কি রাজনীতির দাবা খেলার চাল ভেবে?

—তা ঠিক, তা ঠিক। বিপিনবাবু যেন কি বলতে চেয়েছিলেন বাগচি সাহেবকে ? বলে ফেলুন এইবার, এখন নিরিবিলি আছেন।

—না, মানে খবরটা শুনলুম আর কি। এ বাড়িতে খেলাধুলো করতে আসে অমৃত বলে একটি ছেলে। পুলিশের খাতায় তারও নাম আছে।

—অমৃত ? ও, হ্যাঁ। সে ত ছোট ছেলে ? সে আবার কি করল ?

—করেনি কিছুই, করেনি কিছুই। তবে করতে কতক্ষণ, এই আর কি ! গীতা সোসাইটি বলে যে ধর্ম সভাটি আছে না—ওই প্রকাশ নিবারণ যার সভ্য, ওটির ওপর নজর আছে সরকারের। ওখানে ত নিছক ধর্ম আলোচনাই হয় না, স্বদেশী প্রচারও চলে। ওখানকার স্বামীজির চেলার দলের একজনা বলেই অমৃতর নামটার কথা উঠেছে। 'গুরুজী কি জয়' ডাক শুনে যারা আগুন নেভাতে এসেছিল, অমৃতও তাদের একজন। তবে হ্যাঁ, পালের গোদাদের মধ্যে ও কেউ নয়—সে হল প্রকাশ, নিবারণ—এরা।

রাগে, ঘৃণায়, বিষিয়ে ওঠে হৃষীকেশের মন। এই শয়তান লোকটা ইনফর্মার হিসেবে ছেলে কটির নাম দিয়ে এসেছে পুলিশে,—পরিষ্কার বুঝতে পারেন। তীব্র বিদ্বেষ দৃষ্টি হেনে তিনি কঠোর কণ্ঠে বলেন,—বুঝেছি। আচ্ছা—জেনে রাখলুম। এবারে আসুন তাহলে,—

—এই যে, এই যে উঠছি আমরা।

দু'চার পা গিয়ে প্যারীবাবু একা ফেরেন। হৃষীকেশ রাগে গজরাতে গজরাতে পায়চারি করছেন—কাছে এসে বলেন,—সুবিধে পেলেই সাহেবকে আমার কথাটা একটু—মানে ঐ যে দিল্লীর দরবার না কি যেন—আপনাকে আর খুলে বলার কিইবা আছে—

—উঃ ! বিস্ফোরণ চাপেন বাগচি। মুখ দিয়ে কটুকাটব্য ফুটে বেরোতে চায়। চেপে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলেন,—অফ্ কোর্স !—গুড্ নাইট।

পাশের ঘর থেকে কনখল শুনে রাখে শেষের দিকের কথাগুলো। এইটুকু শুধু বোঝে, যা শুনেছে, সে খবরটা প্রকাশ নিবারণ অমৃতর কানে ওঠা দরকার, এবং সেটা জরুরী।

মার সাথে বাবা কথা বলছেন দুটো ঘর পরে খানাকামরায় বসে। বাবার গলার আওয়াজ থেকে থেকে চাপা গর্জনে ফেটে পড়ছে। কি বলছেন ওঁরা, শুনতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু আড়ি পাতার নীচতায় মন সায় দেয় না। কাছে গিয়ে বসতে বাধা নেই। তবুও কেন যেন বাধবাধ ঠেকে। তা ছাড়া, কালকের স্কুলের পড়া আছে. খাতা বই ঝেড়েঝুড়ে রুটিন মিলিয়ে গোছ করতে হবে।

হরেনবাবুর কচি পাঁঠা আর মহেশ মাতালের বলির গল্প কানে এসেছে, মাকে বলতে হবে। জানতে হবে পুরোপুরি গল্পটা।

সেই কবে আয়েষা বাড়ী ফিরে গেছে, ও তখন ঘুমিয়ে। কদিন আর আসে নি। 'পর পর' হয়ে থাকার সঙ্কল্প মিইয়ে আসে একা ঘরে। দূর থেকে তাকে নিজের সমান কল্পনা করে আনন্দ পায়, কিন্তু মনের কোণে ভয়ের খোঁচ জেগে থাকে, যে কাছে এলে বুঝি বড়োই হয়ে যাবে আয়েষা, চলে যাবে ওর নাগালের বাইরে। এক গোছা চুল হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে পড়ার টেবিলে মাথা গোঁজে কনখল, কিন্তু মন বসে না, দুলতে থাকে আশা নিরাশার দোলায়। আঁকের প্রশ্নমালা খুলে অঙ্ক করতে বসে, ভুল হয়ে যায়। ভূগোল বইয়ের সৌরজগৎ অধ্যায়ে ইউরেনস্ নেপচুন পৃথিবী সব একসাথে তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে থাকে সূর্যকে ঘিরে, কাউকে থামানো যায় না। 'ধুত্তোর' বলে উঠে রওনা দেয় মার কাছে।

সেদিনকার সান্ধ্যবৈঠকের উদ্দীপ্ত আলোচনা থেমে গিয়ে এখন শুরু হয়েছে ব্যাঙার বাবার কথা। এবার যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে নন্দলাল, সে এক শর্তে। রাতভোরে সিপাই-এর ডাকে সাড়া দেওয়া চাই। ভোর বলে ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই যদিও। রোঁদের পুলিশ টহলদারী করতে তিন চার ঘণ্টা অন্তর এ পাড়া ও পাড়ায় হানা দেয়, কোনদিন রাত বারোটায়, কোনদিন তিনটেয়।

ডেকে দেখে যাবার নিয়ম, নজরবন্দী দাগী বাড়ীতে আছে কি নেই। মাঝরাতের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গিয়ে ভারী অশান্তির কারণ ঘটছে নিভাননীর। বাড়ী বদলের আশু কোন সম্ভাবনা নেই জানবার পর রাত্তিরে শুচ্ছেন কনখলকে সঙ্গে নিয়ে। একটিই মঙ্গলবার গেছে সেই ঘটনার পর। সে রাত ত তিনি জেগেই কাটিয়েছেন। নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি কনখলের, এই যা বাঁচোয়া। কিন্তু রাতবিরেতে হেঁড়ে গলায় 'নন্দলালোয়া হো' বিকট হুঙ্কারে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রোজ। আর খালি হুঙ্কার ত নয়, তারপর গুজুর গুজুর, ছিলিমটানা, চলেছে ঘণ্টাখানেক ধরে। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। ব্যাঙাদের বাড়ীটা যদিও বেশ দূরেই—পুকুরের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে। তবুও রাত নিশুতিতে শব্দের যেন পা গজায়, ঠিক এসে পৌঁছে যায় কানের কাছে জ্বালাতে।

কনখল এসে গুটিসুটি মার পাশে বসে; যখন কথাটা তোলেন নিভাননী। হৃষীকেশ বলেন,—কি আর করা যাবে বল, উপায় নেই। মুচলেখা লিখে দিতে হয়েছে যে রাত্রে ঘরে থাকবে। এখন থাকে, না চুরি করতে বেরোয়, পুলিশ নিয়মিত খবরদারী করবে—এই কড়ারে ছাড়া পেয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে।

—তবে কি আজীবন এই চলবে নাকি?

—না না, এরও মেয়াদ আছে, তবে লম্বা। তা ছাড়া স্থানীয় পদস্থ লোকের কাছে এনকোয়ারী করে নজরবন্দীর লিষ্ট থেকে নাম কেটে দেবার ব্যবস্থাও আছে।

—তবে তাই করিয়ে দাও না, রোজ রাত্তিরে ঘুমভেঙে অস্বস্তি-ভোগ আর সইতে পারছি না।

—আরে এখনো ত দিন দশেকও হয়নি, এত শীগগির কি আর হয়ে উঠবে। আচ্ছা, যাক মাসখানেক, হরেনকে বলে একটা আর্জি করিয়ে দেব'খন।

—আচ্ছা আইন বাপু তোমাদের! পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে চোরের ওপর চোখ রাখা।

নিভাননী অপ্রসন্ন মুখ করেন। কনখল ভাবে, এর ত খুব সহজ উপায় আছে। ব্যাঙার বাবা রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ে বলেই না পুলিশ চেঁচামেচি করে পাড়া জাগায়। যদি নন্দলাল নিবারণের মতো রাত পাহারার কাজ পায় তবে ত তাকে আর ডেকে ওঠানোর কথাই থাকে না। সে জেগেই থাকবে, পুলিশও জানবে সে জেগে আছে, খালি টহল দিয়ে দেখে যাবে। মার বাঁ হাতের সোনা বাঁধানো নোয়াটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে আর দু'গাছা চুড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তাঁর কানে কানে বলে কথাটা। বলবার সময়ে উৎসাহে উসখুস করে, কিন্তু বলা হয়ে গেলে বোকা বোকা মুখ করে নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়। বুক দুরুদুরু করে দেখে মার চোখে তারিফের ঝিলিক উঠল কিনা।

মা কিন্তু সত্যিই প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন, বলেন—এইত! কংখ ছিল বলেই না! এমন সহজ রাস্তা থাকতে আমরা কিনা ভেবে মরছি!

হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালা নামিয়ে গোঁফ মুছে ডগায় চাড়া দিতে দিতে বলেন,—বটে, সমাধানটা কি বেরোল তাহলে?

—অতি সহজ। আজ থেকে নন্দলাল রাত চৌকির কাজ করবে। জেগে বাড়ী পাহারায় থাকলে দুপুর রাতে হাঁকডাক চেঁচামেচির ল্যাঠা আর থাকবে না। মাইনে টাকাদুয়েক বাড়িয়ে দিতে হবে নিশ্চয়ই। আস্তাবল আর বাবুর্চিখানার খিদ্‌মৎ ব্যাঙা একাই পারবে।

হাসিতে ফেটে পড়েন হৃষীকেশ।—ডাইনীর হাতে ছেলে! দাগী চোরের হাতে ঘুমপুরী! এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হতে পারে!

প্রস্তাবের এই হাস্যকর দিকটা নিভাননীর মনেও যে কৌতুক সঞ্চার করেনি, তা নয়, কিন্তু কপট-গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি বলেন, —কেন নয়? বিশ্বাস করে কেউ কোনদিন ঠকেছে নন্দলালের কাছে? পেটের দায়ে চুরিচামারি করে, এ সবাই জানে। কাজ

থাকতে অসৎ পথে যায় না, এও অজানা নয়। আমার ছেলেকে সেদিন নিশ্চিত ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়েছে, ও যাবে আমাদের অনিষ্ট করতে? এই তোমরা বিচারক? আমি বলছি, এ কখনো হতেই পারে না।

নিভাননীর গলার আওয়াজ থেকে ভানের ছোঁয়াচ কেটে যায়। আন্তরিকতায় সতেজ হয়ে ওঠে শেষের কথাগুলো। বলে চলেন,—ওকে বিশ্বাস করে দেখেছে কেউ, যে ও বিশ্বাসের পাত্র কিনা? মানুষকে খারাপ করে মানুষ। উঠতে বসতে চোর বলে ঠেলে রেখে শেষ পর্যন্ত পাকা চোর বানিয়ে ছাড়বে ওকে। অথচ, ও যে, তোমার মতো স্ত্রীর স্বামী, ছেলের বাপ, এগুলো কোন পরিচয় নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করবে, সেই পয়সায় নিজে খাবে, বৌ ছেলে খাওয়াবে পরাবে, সে সম্মানবোধ ওর মনে জাগবার কোনো সুবিধেই কেউ দেবে না। আমি বলি, এ বিচার নয়, এ অত্যাচার।

বলে দম নেন নিভাননী। হৃষিকেশ সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। মাকে এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলতে কখনো শোনেনি কনখল। যেন নতুন চোখে দেখে তাঁকে, সম্ভ্রমে বুক ভরে ওঠে।

হৃষীকেশ বোঝেন, হাসিঠাট্টার ফোড়ন কেটে এ প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানা যাবে না। আর তাঁর নিজের মনোভাব মনে পড়ে, একদিন হরেনের সাথে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে তিনিও প্রায় একই কথা বলেছিলেন।

কিন্তু বাইরে বাইরে আস্তাবলের কাজ, আর বাড়ীতে রাত পাহারার কাজ, দায়িত্বের তারতম্য যে অনেক। নিভাননীর দৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে শক্তি সংগ্রহ করেন। অস্থির নদীতে ছুঁদাড়ের নৌকোর বইঠার মাঝি যেমন করে তাকায় হালের মাঝির দিকে। সুনির্ভরে দায়িত্ব ভাগাভাগি করবার ভরসা খোঁজেন যেন জীবনসঙ্গিনীর কাছে। বোধকরি পেয়ে যান, আশ্বস্তি আসে মনে।

বলেন কিন্তু চটুল সুরে,—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। নন্দলাল বহাল। বাঁচলুম বাবা মাথা ঘামানো থেকে। তবে হরেনের দল বাক্যবাণ বর্ষণ করতে ছাড়বে না, বলে রাখছি।

—করুক। খুব ত বন্ধু হয়েছেন তোমার, এবারে আমার সাথে আলাপ করিয়ে দাও, আমি জবাব দেব।

—আর বিদ্যাভূষণ যখন প্রাকৃতে অপ্রাকৃতে নানাবিধ আর্ষবাক্য ছাড়বেন ?

—তাঁকে ত গুরুজন বলে মানি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। দরকার হলে তাঁর সাথেও তর্ক করতে ছাড়ব না।

—না না, তিনি বোদ্ধা লোক—পণ্ডিত। বাজে তর্ক করেনই না।

নিজের ঘরে ফিরে আসে যেন রাজ্য জয় করে কনখল। তেমনি গর্ববোধ করে। বুদ্ধিটা ত তার মাথায়ই এসেছে। এখন ব্যাঙাটাকে ইস্কুলে দিতে রাজী করাতে হবে মাকে। একটার পর একটা—এখুনি নয়। ছোট্ট মাথাটিতে অনায়াসে চাণক্যনীতি খেলে। বেশ ভারিক্কি চালে বসে এসে পড়ার টেবিলে। একটি সাফল্যের সাথে যেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরে আসে কনখলের। খানিক আগের না পারা আধকষা আঁকটা হাত দিতে না দিতে হয়ে যায়। উত্তর-মালা খুলে দেখে ঠিক মিলে গেছে। তৃপ্তির সাথে সাথে একটা অবজ্ঞার ভাবও জাগে। ভারী ত অঙ্ক !

১৬

আয়েষা বেশ কদিন আসেনি। কনখলের মন বলে, ও আর আসবে না। অন্তরঙ্গ খেলার সাথী থেকে যে মেয়ে হঠাৎ বড়ো হয়ে যায়, সে পর হয়ে যায়, এই কথা দৃঢ়বদ্ধ হয় ওর মনে। নিজেই ত বলে গেছে আমি এখন বড়ো হয়ে গিয়েছি। এক এক সময় হতাশ লাগে কনখলের, কিন্তু হার মানতে চায় না যেন মন। ওকে জব্দ করার সঙ্কল্পও উঁকি-ঝুঁকি দেয় মনে। অমৃত আর ব্যাঙার সাহচর্যে মেতে থাকে, কাঞ্চনকে নিয়েও বেশী সময় কাটায়, কিন্তু স্কুলের বাইরের সময় কি লম্বা, কাটতে চায় না। থেকে থেকে উদাস হয়ে ওঠে।

ছেলের ভাবান্তর নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কারণ ত জানেনই, কিন্তু সে সব কথা আদৌ তোলেন না। কনখলও যেন বড় তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে উঠছে। ছেলে হঠাৎ এসে একদিন যখন বলল,—মা, ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করার কথার কি হোলো?

—সে কিরে, সামনে পূজোর ছুটি, এখন ভর্তি হয়ে কি লাভ হবে? আর তা ছাড়া, ওরও ত বাবা মা আছে, তারা যদি এসব পছন্দ না করে। সবাই কি সব করতে পারে?

—কেন পারবে না—ওতে আমাতে তফাত কি মা? ও খুব চালাক, দেখো কেমন চটপট সব শিখে উঠবে।

নিভাননী তত্ত্ববিশ্লেষণে তৎপর হন না। ব্যাঙার সাথে নিজের ছেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন। যে সমাজে কাউকে বকতে হলে বলতে হয় 'ব্যাটা ছোট লোক' 'ব্যাটা চাষা'—সেই সমাজে বাস করে একজন দাগী চোরের অশিক্ষিত ছেলের সাথে নিজের ছেলেকে

সমান বলে ভাবতে বিপ্লুত বোধ করেন। এ অস্বস্তির সমাধান কি ভেবে কুল পান না। ধমক গালাগালি দিয়ে থামানো যায় এ অসঙ্গত আবদার, কিন্তু নিজের মনেও কোথায় একটা যাথার্থ্যের খোঁচা ফুটতে থাকে। অনুদার হতে চান না, তাই অসহায় বোধ করেন। আপাততঃ কথাটা থামিয়ে দেন, বলেন,—আচ্ছা দেখব। বাবাকে বলতে হবে ত, নইলে আমি একা করব রে!

কনখলের রাজ্য জয় ঐখানেই শেষ হয়। মা যদি বাবাকে বলেন, তিনি কি আর আপত্তি করবেন!

কনখল একটা তেলতেলে ডাল পেয়ারা গাছে গিয়ে ওঠে। পেয়ারাগুলোর বাইরে সবুজ, ভেতরে লাল। বীচি নেই বললেই হয়। সেখান থেকে একটা দুটো, তিনটে পেয়ারা ছুঁড়ে মারে বাবুর্চিখানার সামনে দাঁড়ানো ব্যাঙাকে তাক ক'রে। ব্যাঙা তাকাতেই বলে,—আয়।

ব্যাঙা এসে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে উঠে কনখলের পাশের ডালে বসে। দুইজন সমানে সমানে পেয়ায়া ধ্বংস করে। বাড়ীর বারান্দায় বসে নিভাননী দুশ্চিন্তা করতে থাকেন।

একদিনকার ছেলেমানুষী আবদার ছেলের মনে গভীর দাগ কেটেছে। বাগ্‌চির বদলির কাজ, ঠাঁইনাড়া হলেই হয়ত কনখল সব ভুলে যাবে। নিজে গোঁড়া হিন্দু বাড়ির মেয়ে, স্বামীর কজে পাঁচমুলুকের জল খেয়ে আমলমাফিক হিন্দু মুসলমান সাহেব সবায়ের সমাজেই অকুণ্ঠভাবে মিশে যেতে পেরেছেন। এ যখন সম্ভব হয়েছে, ছেলের দাবির মধ্যেও সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয় তাঁর মন। ধর্মমত যাই হোক না কেন, জীবনের সকল সুখসুবিধায়ই সাধ্যমত সবায়েরই সমান অধিকার আছে এই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, রাজা জমিদার আর সাহেব সুবো তাদের কথা আলাদা, একদলের অনেক টাকা, আর একদল দেশের রাজার জাত। স্বদেশী আন্দোলনের খোঁজখবর রাখেন, মনে বিশ্বাস আছে, শেষোক্ত দলের সুখসুবিধার কিছুটা অন্তত একদিন

দেশবাসীর হাতে আসবে। মনের বিশ্বাস মনেই রাখতে হয়, স্বামী যে শেষোক্ত দলের বেতনভোগী।

বাগচি ফিরলে আর কিছু বলেন না, বলেন শুধু ব্যাঙাকে স্কুলে দেওয়ার কথা। শুনে তিনি হা হা করে হাসেন, বলেন,—এইবারে পুত্র মারফত আমাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার লোকের সৃষ্টি হতে থাকবে। ঠাট্টা করেই বলেন। তার পরেই গম্ভীর হয়ে যান। জীবন কী রাজনীতি কিছুই তোলেন না আলোচনায়। শুধু বলেন,হ্যাঁ, পারতপক্ষে উচ্চশিক্ষায় সকলেরই অধিকার থাকা উচিত। আচ্ছা, দেব ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করে। ছেলেটা চালাক চতুর আছে ত? কিন্তু ওর বাবা যে দাগী চোর, কোনো স্কুল নেবে কি? দেখি হরেন কি বলে। ওর মাথায় অনেক রকম খেলে!

চা খেতে বসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান হৃষীকেশ। নিভাননী হৃষীকেশের সামনে রুটির পায়েসের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন,—কি হোলো আবার?

—স্বদেশী মামলায় কনা রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এসেছে।

—কখন? কবে? কোন স্বদেশী মামলায়?

—ঐ প্যারীবাবুর মামলায়। না না, ঠিক সাক্ষী নয়, তবে হ্যাসেট ওকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল। ও যা বলেছে, তাতে সরকারী মামলা ফেঁসে যাবে, স্বদেশীর দল খালাস পাবে, আব প্যারীবাবুর সাজা হবে।

—এত কাণ্ড ঘটল কবে? আমি ত কিছুই জানিনে।

—এখন যে ভোরে উঠে কাঞ্চনকে জিন কসে পোলো ময়দানে যায় মাঝে মাঝে, এটা জানো?

—তা ত জানি। সে ত যায় আয়েষার সন্ধানে। তার সাথে—

—বলতে দাও। হ্যাসেট ওকে ভালবাসে। ময়দানের মোড়ে ধরে ওকে জিজ্ঞেস করেছে কাজীর বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে ওর কি মনে আছে। ও বলেছে অনেক অবান্তর কথা, কিন্তু একটি

কথায় মামলা ফাঁসবার উপক্রম। বলেছে, আগুন লাগার রাতে প্যারীবাবুর গুদামে এক কণা পাটও ছিল না। খবরদাতা প্যারীবাবুর পত্নী, খবরের মাধ্যম তুমি, এবং তুমি আমাকে যখন বলো, ও যে কোথায় থেকে শুনে নিয়েছে, জানতুম না। হ্যাসেট বলেছে, চিলড্রেন আর গড। মিছে কথা জানে না। যা সত্য তাই বলেছে। আর হয়েছে কি, সেই কথাটা ও নাকি প্রকাশের কাছে বলে ফেলেছিল একদিন।

নিভাননীর মনে পড়ে যায় হাসপাতালে প্রকাশের কাছে খাবার নিয়ে যাবার দিনের কথা। মিছে কথা বলতে শেখেনি এখনো কংখ্, সেইদিনই তাঁকে বলেছিল সব কথা খোলসা করে। বলেছিল বেণী দারোগার পেছনে 'বন্দেমাতরম্' বলার কথা। তাঁর মন হঠাৎ সমস্ত ইংরেজ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। দৃপ্ত গ্রীবা উঁচু করে বলেন,—যদি বলে থাকে, ঠিক বলেছে। আগুন লাগার পরের ভোরে উষা এসে আমায় বলেছিল, প্যারীবাবুর গুদামে এক কণাও পাট ছিল না। হাজিরার টেবিলে আমি তোমায় বলেছিলাম। কনা চুপ করে শুনেছে। ও যা শুনেছে, শুধু রং না ফলিয়ে সেইটুকুই বলে থাকে, তবে সত্যি কথাই বলেছে। তুমি নিজে সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বলোনি, যে প্যারীবাবু তোমার কোর্টে আসামী হয়ে এলে তাঁর সাজা হয়ে যাবে?

হৃষীকেশ আমতা আমতা করেন। বলেন,—হ্যাঁ, ঐরকম একটা কিছু বলেছিলাম বটে, তখন বুঝিনি ফায়ারমেরিন বীমা কোম্পানীর সাহেব ইনেস্পেক্টরের রিপোর্টও কনা যা বলেছে তারই সমর্থন করবে। সেই সাহেবটা বলে গেছে, প্যারীবাবু খালি গুদামে কেরোসিন ছিটিয়ে নিজে আগুন দিয়ে সমস্ত কাজীর বাজার জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার সহকারী ছিল একজন কয়ালী সর্দার। কিন্তু এ যে ভীষণ অপরাধ। ফাঁসী কি যাবজ্জীবন, যে কোন একটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু,—

একটু ভাবিত মুখে গোঁফে চাড়া দেন বাগচি।

নিভাননী আজ বহুদিন পরে সকৌতুকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে

বলেন,—যা ভালো মনে হয় করো। কংখ্ সত্যি কথা বলেছে। এ ব্যাপারে তোমরা রাজাগজারা যা খুশী করবে। আমার ছেলে সত্যি বলেছে, এ গর্ব আমার কোনদিন মন থেকে মুছবে না। সত্যির আদর যদি শাস্তি হয়, চাকরী ছেড়ে প্রফেসরি নিয়ো। ছেড়ে এসে তো ঢুকেছিলে গোলামখানায় একদিন। আবার না হয় কয়েদমুক্ত হয়ে, নিজের বিদ্যার জোরে দাঁড়াও।

হৃষীকেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়লো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রুমালে গোঁফ মুছে উঠে দাঁড়ান। বলেন,—আচ্ছা, হবে হবে। ঐ ত হরেন আর বিদ্যাভূষণ মশায় এসে পড়েছেন। রহমৎ, সব চৌকী তেপাই বাইরে—

—হুজুর বিলকুল তৈয়ার। পণ্ডিতজী তাম্বাকু খাচ্ছেন।

—আমি চললুম। চা এবং টা—মারফত ঠাকুর।

হেসে ফেলেন নিভাননী। বলেন,—মনে না করালেও চলবে। তারপর মুখে একটা কঠিন ভাব আপনা থেকে এসে যায়। বলেন,—কংখ্‌কে জেরা করা হবে না। সে সত্যি কথা বলেছে।

হৃষীকেশ চোখ ফেরান। বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাইরের বারান্দায় সেদিন আর কোনো আলোচনাই হয় না। হরেন চাকী মশাই ভেতরের সব হদিস রাখেন না। বলেন,—ওহে সাহেব, এ যে সাহেবে ইংরেজের মাথা খেলো। জানো তো আজকের খবর? নর্টন ত ফায়ার। রবার্টসনের ওখানে যে বীমা কোম্পানীর সাহেবটা এসেছিলো, সে তো প্যারীবাবুকে চরম আসামী সাব্যস্ত করে গেছে। বীমার ত্রিশ হাজার ত চাঙে উঠলো, এখন শ্রীঘর হওয়াও আটকানো শক্ত। গীতা সোসাইটির চ্যাংড়াদের বিরুদ্ধে মামলা ত এক জবানবন্দীতেই উড়ে গেছে। সাহেবদের একটা কি গুণ জানো সাহেব, যদি সাহেবে সাফাই সাক্ষী দেয়, তবে তাই বহাল থাকে, কালা দারোগা কিম্বা কসাইয়ের ছেলে পুলিশসাহেব, যতো তোড়জোড়ই করুক না কেন, বে ফয়দা। ঐ বীমা কোম্পানীর সাহেব শুধু প্যারীবাবুর দাবি আদৌ মিথ্যা বলে যায়নি, বলে গেছে

তার কোম্পানীর বড় সাহেব ফুলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদি এ কেসে কোম্পানীকে ত্রিশ হাজার খেসারৎ দিতে হয়, তবে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার অথবা উনিশ বিশ, বহু খাস ইংরেজকে কালাপানি পার হতে হবে। নর্টন ত চুপসে গেছে। এখন খালি গজরাচ্ছে বেণী দারোগা আর তার চ্যালাচামুণ্ডার ওপর। অকথ্য গালাগালি করছে।

হৃষীকেশ শুধু তাক মাফিক নজর রাখেন কনার অংশটুকু পরম বন্ধু হরেনের নজরেও এসেছে কিনা। আসেনি দেখে আশ্বস্ত হন। বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত মানুষ, মামলা মোকদ্দমার খবরও রাখেন না, অব্যাপারে মাথাও গলান না। প্রাকৃতে শুধু বলেন,—খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে--

কথা শেষ করতে দেন না হরেন।—থামো হে পণ্ডিত, যদি খাচ্ছিলই, তবে আরো খাবার ইচ্ছে কেন? বুঝলে না, ঐ তৃতীয় পক্ষ, ঐ প্রকাশদের মার মার করে ওঠা, ঐ প্রতিশোধ প্রবৃত্তি, এই গেল এক তরফ আর একদিকে যতদূর খবর রাখি ঝাঁজরা হয়ে আসছিল তেরজুরি, অর্থাৎ অর্থসামর্থ্য। এ দুটোর সমন্বয় করো, তবে সাহেবপেয়ারি প্যাবীবাবুর কীর্তিকলাপের কিঞ্চিৎ হদিস পাবে।

বিদ্যাভূষণ হুঁকোয় টান দেন, ভুড়ুৎ। কথা বলেন না।

হরেন চিরকাল কান্ত কবির ভক্ত। হঠাৎ উত্তেজনা থামিয়ে বলে,

"আঃ যা করো বাবা আস্তে ধীরে—
ঘা করো কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?"

—আস্তে ধীরে চালিয়ে গেলে প্যারীবাবুও হয়ত একদিন সাগর পার হতে পারতেন। এটা বুঝলেন না, যে

"সোনার খনি দিয়ে বলো কি হবে বাবা;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ অনেকখানি পাবা;
কেন এ খোঁচাখুঁচি, পরান বধাবধি?
কেন এ কাটাকুটি, রক্তে নদানদী?"

—একটা বাজারকে বাজার জ্বালিয়ে দিলেন, সেখানে তো অনেক মরলো, অনেক পুড়লো, মায় খাজাওয়ালার ন্যাংড়া মেয়েটা পর্যন্ত। তাতেও শেষ নেই, মহৎপ্রাণ যে কটি ছেলে বাঁচাতে গেলো, পুলিশের সাথে যোগসাজস করে, তাদেরও ফাঁসাবার মৎলব। আর একি সহজ ফাঁসানো? নিবারণের বিরুদ্ধে যা চার্জ খাড়া করেছিলো, ফাঁসী অবধারিত। এ টাইপের ক্রিমিনালরা সোশ্যাল মিনেস। একেবারে চরম দণ্ডের আসামী।

বিদ্যাভূষণ বলেন, হুঁ। বাগচি গোঁফে চাড়া দেন।

মামলার আলোচনা বেশীদূর আর এগোয় না। বাড়ীর ভেতরে চাপা কান্না আর নিভাননীর অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনার আওয়াজ পাওয়া যায়। বারান্দায় তিনজনেই অস্বস্তি বোধ করেন। বিদ্যাভূষণ বলেন,—যাও হে, দেখে এসো পরিস্থিতি। আমরা উঠি।

হরেনবাবু মুখে যতোটা মারমুখী, অন্তরে ততটা নন। কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করেন। কথা একটিও না বলে বিদ্যাভূষণের সাথে উঠে পড়েন। বাগচি একা বারান্দায় পায়চারি করেন। একবার উঁকি দিয়ে অন্দরে তাকান। ঊষা উপুড় হয়ে নিভাননীর কোলে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, নিভাননী সান্ত্বনা দিতে গিয়েও যেন পাথর হয়ে গেছেন। শুধু মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

কৃত্রিম উত্তেজনার উলটো পিঠ অবসাদে ভেঙে পড়া। সহজ সতেজ জীবনই শুধু সুখ দুঃখকে সমভাবে ধরে রাখতে পারে। একবার ইমাম সাহেবের কাছে যেতে হবে, ভাবেন বাগচি। কনখল কোথায়, কি করছে কেউ খোঁজও রাখে না, দরকারও মনে করে না।

সমস্ত বাড়িটার ওপর যেন একটা শোকের কফিন ঢাকা চাদর বিস্তৃত হয়।

ওদিকে কনখল বাবুর্চিখানায় গিয়ে রহমতের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। রহমৎ বলে, ঠাণ্ডা হও কনা বাবা, বলো কি হয়েছে। বুঢ়া রহমৎ তোমার দোস্ত, কিচ্ছু ভয় নেই। কি চাও বলো।

কান্নার ধাক্কায় কনখল ফুলে ফুলে ওঠে। আথালি পাথালি করে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। রহমৎ মাথায় গালে হাত বুলোয়। জানে, হালাল করা মুরগীর মতো ওর ছটফটানী থামবেই এক সময়।

থামেও। কনখল উঠে বসে রহমতের বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপায়। বলে,—আমি কি করলুম রহমৎ।

—কি করলে ?

—বারান্দার বৈঠকে শুনলাম আমার সাথে কথা বলেই হ্যাসেট নতুন মাসীর বরকে জেলে দিচ্ছে।

—সে আবার কি ?

কনখল বলে যায় নতুন মাসীর মাকে বলা কথা প্রকাশদাকে বলে আসা, পুলিশের জেরায় প্রকাশদার সে কথা ফাঁস করে দেওয়া, পরে হ্যাসেটের জেরায় কনখলের স্বীকারোক্তি, যার ফলে আজ প্যরীবাবুর সাজা হবেই। প্যারীবাবুর যা হবার তা হোক, কিন্তু ও যে নতুন মাসীকে মার পায়ে পড়ে কাঁদতে দেখে এসেছে।

—আমি এ দোষ কেন করলাম রহমৎ।

—তুমি কিছু দোষ করোনি কনা বাবা, কেন খামোখা নিজেকে দোষী মনে করছ ?

—নিশ্চয় আমি দোষী। নতুন মাসী—ঐ মুটকী, ওকে আমি দেখতে পারিনে, তাই বলে—

বোলে ঢোক গেলে কনখল। বলে—ও লোক খারাপ নয়। ও আমাকে ভালোবাসে আমিই ওর সর্বনাশ করলাম। আমি কি করে জানব যে আমার ঐ কথায় এই সব হবে।

রহমৎ এইবার কনখলের মন ঘোরাতে চায়। বলে, রাতের কাটলিস সাজানো আছে। ভাজি দুখানা। উঠে বোসো ত কনা বাবা, ওই মোড়াটায় বোসো।

কাটলেটের কথায় কনখলের শোক কিছুটা কমে। গরম কাটলেট

বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খায়, কিন্তু নিজের ব্যবহারে কোথায় যেন অপরাধের কাঁটা গলায় বিঁধে থাকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে না। রহমৎ বলে, ঘরে চলো, হুজ্‌রাইন ব্যস্ত হবেন। সাহেব ইমাম সাহেবের ওখানে গেছেন। হয়ত খবর পেয়ে ডাক্তার সাহেব আর আয়েষা মাই আসবে। বাড়ি চলো।

কেন যেন আয়েষার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় কনখলের। আসুক না। যদিও আসবে কিনা জানা নেই। তবুও চলে রহমতের হাত ধরে বাড়ির দিকে, মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ আর কেউ নেই। আস্তাবলের দিকে তাকায়। কাঞ্চন পেছনের পা দুটো ঠুকছে। বলে,—রহমৎ, মাকে বলো আমি আস্তাবলে গেছি। আসব এখুনি। বলে দৌড়ে যায় আস্তাবলের দিকে।

কাঞ্চন একা। এ কদিন কি যেন হচ্ছে, বোঝে না পঞ্চতিলক ঘোড়া, কিন্তু রোজকার সাথীকে পেয়ে একবার চিঁ হি হি শব্দ করে। হারুণ বসে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ কনখলের মাথায় বুদ্ধি খেলে। সন্ধ্যা? সেত হয়েইছে। বুক অন্ধকার। ঘর অন্ধকার। বুকের ভেতর, সে যে অপরাধী, এ কথা কে যেন লিখে দিয়ে যাচ্ছে। হারুণকে হুকুম করে, জিন চড়াও।

কাঞ্চন, বাচ্চা মনিব, মানে মনিব নয় দোস্ত, কাছে পেয়ে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে। বাঁদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, চিঁ হি হি। কনখল ওদের কথা বোঝে। জিন কষতেই এক লাফে ঘোড়ায় ওঠে, লাগাম বাঁমুখি টানে। সোজা দরগা। ইমাম সাহেব। আজ কনখল ওস্তাদ সওয়ার নয়, তবুও ঘোড়াই তাকে বাঁচিয়ে ছোটে, শুধু কনখল ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে বলে,— চিনবি ত? শাহজলালের দর্গা। বাবা গেছেন বাইসিকেলে। আগে যাবেন জাফর ডাক্তারের টিলায়, তার আগে পৌছতে হবে।

কাঞ্চন কনখলের অনুচ্চারিত আদেশগুলো বোঝে। তীরবেগে ঘোড়া ছোটার কথা যারা বইয়ে পড়েছে, তারা বুঝতেও পারবে না তীরতর বেগেও ঘোড়া ছোটে। দর্গার সদরে দীর্ঘদেহ হাজী

ওবেদুল্লা সানুচর পায়চারি করেন দেখা যায়। কাঞ্চন ঠিক তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে থামে, কিন্তু কনখল নামে না। যেন জমে গেছে ঘোড়ার পিঠে। ইমাম এগিয়ে এসে বলেন,—এ কে, কনাবাবা? বেহুঁস হয়ে গেছে ঘোড়ার পিঠে? এ ত ঘোড়া নয়, জিব্রাইল। আসাদুল্লা, বাবা কো উতারো।

তার পরের কিছুক্ষণে কিছুই মনে পড়ে না কনখলের। এত লোক কেন, এত আলো কেন, মা বাবা কেন, সবাই এখানে কি করে এল। হাজী ওবেদুল্লা গম্ভীর স্বরে হুকুমজারী করেন, যে যার আস্তানায় ফিরে যাও। বাচ্চা আমার কাছে থাকবে রাত্তিরে। নিভাননীকে বলেন, মা বলেছি, কোনো ভয় নাই। বে-ফিকির ফিরে যাও। বাগচিকে বলেন, কুছ্ ডর নেহি।

তার পর কনার আর কিছু মনে পড়ে না। আয়েষাও এসেছিল বাপ মায়ের সাথে, আমল দেননি হাজি সাহেব।

দুঃখের রাত, দুঃস্বপ্নের রাত, সব পোহায়—কিন্তু ভোর কি সব সময়েই মঙ্গলোদয়ে দেখা দেয়? সারা রাত ধরে হাজী সাহেবের কাছে, তার মন বেহাত হয়ে গিয়ে দুষমনি করেছে, এই বোঝাতে চেয়েছে কনখল, ঈশ্বরের প্রতীক হাজী সাহেব শুধু সারারাত জেগে ওর মাথা কোলে করে বসে থেকেছেন, আরবী পারসী উর্দু কি যেন ভাষায় আল্লার নাম করে গেছেন. স্বপ্নের ছায়াছবির মতো টুকরো টুকরো মনে পড়ে ওর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ও নিজেও জানে না। যখন ঘুম ভাঙে, তখন দেবপ্রতিম ওবেদুল্লার ভোরের আজান দিকে দিগন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। কনখলের মানসে শান্তির প্রলেপ পড়তে থাকে।

১৭

ভোর হতে ঘটনাপরম্পরা দ্রুত লয়ে চলতে থাকে। বাড়ি পৌঁছয় হাজী সাহেবের সাথে, তারপর নিজের নিজের ঘর, মায়ের কোলে, রহমতের পরিচর্যা। বিছানায় শুয়ে শুনতে পায় বাবার সাথে হাজী সাহেবের কথাবার্তা। ওবেদুল্লা বলেন,—তোমার আর এখানে না থাকাই ভালো। বদলীর সময় হয়েছে কি ?

—আপনিই ত বলেছিলেন এক বছর মেয়াদ। প্রায় হয়ে এসেছে।

—তবে দেখাসাক্ষাৎ করে অন্য জায়গায় চলে যাও, তোমার ছেলেকে আমি দোয়া করি, ভালবাসি। কিন্তু ও ত তৈরী হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের মানুষে। এই ত কটা দিন, ভালোবাসল, অপরাধ বোধ নিয়ে কষ্ট পেল, মন যা চায় সব পেয়ে গেছে, এখন সাধারণ মানুষের বাচ্চার মতো ওকে বাঁচতে দাও। আমি প্রেমধর্মে বিশ্বাসী, কোন আতস দিয়ে কোথায় গিয়ে প্রেমের আলো পড়ল, সে আতসও আমি জানতে চাই না, আলোকোজ্জ্বল, পাত্রও না। আলোটা এলো কোথা থেকে, এইটুকুই সব। এইটুকু যে জেনেছে, সে সব জেনেছে।

আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝছি না হাজী সাহেব। ঘটনাগুলোর মধ্যে কি আছে যে এত কঠিন তত্ত্বে যেতে হবে ?

—আলবৎ যেতে হবে। পাক পরওয়ার দেগার যখন শেষ পর্যন্ত শয়তানকে স্ত্রীলোকের নগ্ন সৌন্দর্য দেখিয়েছিলেন, তখন ইব্‌লিস্ বলেছিল এই নিয়ে আমি বিশ্বজয় করব। সেই ফাঁদ থেকে যদি কেউ বেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে নিয়ে আর কেন খেলা ? সে যদি বুঝে থাকে, যে সে ভালোবাসতে চায়, খালি চারদিকে

প্রেমপাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুহূর্তে সে নিজের মনে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমের উৎস খুঁজে পায়, তারপর নির্ভয়। আর কোনো ভয় নেই। পারতাম ত তোমার ছেলেকে আমি নিজের কাছে রাখতাম। কিন্তু তা হয় না। দুনিয়া বেচাল। তবে, দুনিয়ার যত রং বদল না কেন, ওর বেলা আমি নির্ভয়। পাঁকে পড়বে, পাঁক ওকে আটকাবে না, ইব্‌লিসের মায়ায় জড়াবে, কাটিয়ে উঠবে। ও নিজের মনে সত্য প্রেমের উৎসের সন্ধান পেয়ে গেছে। মাকে ডাকো, আমি উঠব।

নিভাননী এসে দাঁড়াতে হাজী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদ করে বললেন, খামশ—তক্‌রার করবার শক্তি যিনি দিয়েছেন, চুপ করে তাঁর কথা শোনো। মনের কবাট ও তালা যিনি বানিয়েছেন, চাবি তাঁর হাতে। লা ই লাহ্‌ ইল্লিলাহ।

নিভাননী হাঁটু ধরে প্রণতি জানালেন। হৃষীকেশ মাথা নীচু করে। কনখল ঘুমিয়ে থাকে।

সেদিন রবিবার। হাজী সাহেব চলে যাবার পর হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ এবং সর্বাশ্চর্য, বিপিন কার্ল´াইল আসেন। নিভাননী ভেতরে চলে যাবার সময় বাগচি বলে দেন চা ইত্যাদি পাঠানোর জন্য। নিভাননীর কোনো উৎসাহ নেই, তবু ভদ্রতার ডাকে সাড়া দিতেই হয়। বিদ্যাভূষণ বর্তমান, রহমতের উপর ভার দেওয়া চলবে না।

হরেন বলেন,—ওহে সাহেব, জামিন হয়ে গেছে। কলকেতা থেকে ব্যারিষ্টার আসবে। খালাস পেলেও পেতে পারে।

—আমি খুশী হব, বলেন বাগচি।

কার্ল´াইল হাত কচ্‌লে বলে, মশাই আমি কি অতো জানি। যা শুনলাম, ওপর ওপর মনে হোলো এ গীতা সোসাইটির পুজোর বাজারের ওপর রাগ ছাড়া আর কিছু নয়, আর পুলিশ সাহেবের ওখানে প্যারীবাবুর সাথে দেখা হলেও উনিও ঐরকমই ঘটনা, তাই জানালেন। এখন শুনতে পাচ্ছি প্রকাশের দল আমার প্রাণনাশের

ষড়যন্ত্র করছে। অবিশ্যি পুলিশ সাহেব আমার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন, তবুও হাকিমহুকুমের মহলেও কথাটা জানাজানি হয়ে থাকা ভালো।

হরেন খেপতে থাকে, বলে আবার সাক্ষী তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে মশাই। আপনাকে আমরা চিনিই না, আপনি কোনদিনই আমাদের এখানে আসেন নি। আচ্ছা ছ্যাঁচড়া লোক ত আপনি।

—হেঁ হেঁ, আপনাদের উকীলের মুখের বাঁধন নেই জানি, মনে যা ভাবেন, বলেন অন্য রকম।

—হোপ্‌লেস্‌, বলে হরেন চেয়ারে পিঠ ঢালেন।

বিদ্যাভূষণ তামাক সাজা এবং খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো শক্তি ব্যয় করেন না। কিন্তু আজ বাগচি একেবারে চুপ। হাঁ, না কিছুই বলেন না। চিন্তিত মুখে বসে থাকেন। ভাবেন এরা উঠবে কখন।

ওদিকে বুড়ো রহমৎ কনখলের ঘরে বসে। কনখল, ঘুম নয়, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ তড়াক্‌ করে লাফিয়ে রহমতের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, রহমৎ, নতুন মাসীর কাছে যাব।

রহমৎ সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকায়। হুজ্‌রাইন রান্নাঘরে, সাহেবরা বারান্দায়। আস্তে গোসলখানার দরজা খুলে বলে, 'এসো।'

প্যারীবাবু জামিনে খালাস হয়ে মহালে গেছেন টাকার তদ্বিরে। অতবড়ো বাড়ী, খাঁ খাঁ করছে। জীবন খেলার মাঠে গেছে, তখনো ফেরেনি। বাড়ীর একমাত্র ঝি সদরে বসে। রহমৎ আর কনখলকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বলে মাকে খবর দেব? রহমৎ বলে, না, খবর দেবার দরকার নেই। কনাবাবা মার কাছে যাবে।

সেই শোবার ঘর, যেখানে একদিন উষা কনখলকে বুকের তলায় পিষে ফেলতে চেয়েছিল। আজ উপুড় হয়ে সেই বিছানায় নিজের বুক পিষে ফেলছে। কনখল গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে বলে—নতুন মাসী।

তড়িতাহতার মতো বিদ্যুৎবেগে উঠে বসে উসা। কিন্তু নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কনখল বলে, মাসী।

ঊষা হঠাৎ উঠে নিজের গায়ের কাপড় সামাল করে। কনখলকে কোলে নিয়ে বসে। বলে, বাবা ?

একে ? মা, আয়েষা, নতুন মাসী, সবাই মা। কনখল কি বলতে এসেছিল ভুলে যায়। শুধু ঊষার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। ঊষা ওর পিঠে হাত বুলোয়। বলে, যা হবার হবে বাবা তুই কেন ভাবছিস।

কনখল অনেক কথা বলতে চায় কিন্তু একটিও বলা হয় না। ঊষা শুধু বলে, চুপ করে থাক, তোর কথা আমি শুনতে চাই না, জানিস রে, তোকে আমি—

—ভালবাসো ? জানি বলেই ত বলতে এসেছি তোমার কাছে আমি অপরাধী। তুমি মাকে কি বলেছিলে আগুন লাগার রাতে, সেইকথা আমি কিছু না বুঝে অনেক জায়গায় বলে ফেলেছি। তাইতেই বুঝি সর্বনাশ হচ্ছে। মাসী, আমাকে শাস্তি দাও। আমার একটি কথায় তোমার এত কষ্ট হোলো।

ঊষা ওর হাত টেনে ধরে বলে, চল্ দিদির কাছে।

ঊষার হাত ধরে মায়ের কাছে যাওয়া। নিভাননী হকচকিয়ে যান। রাত হয়ে গেছে ঊষা গিয়ে বলে, দিদি,

—কি রে

—কনা মনে করছে ও আমার খুব অনিষ্ট করেছে। সেই গুদামে পাট না থাকার কথাটা সাহেব সুবোকে বলে। ও ঘুমোতে পারে না, সারারাত কাঁদে, ওকে কি করে বুঝোব ও কিছু অন্যায় করেনি ? তুমি ওকে বোঝাও, আমার কপালে যা আছে তা হবে, কিন্তু ও মনে মনে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে কষ্ট পাবে, এ আমি কি করে দেখব,—

নিভাননী সসম্ভ্রমে তাকান ঊষার দিকে। ছলাকলা-লাস্যময়ী যুবতী যেন হঠাৎ জগন্মাতার রূপ নিয়েছে। কি প্রশান্তি দুটি চোখের চাহনীতে।

হাত ধরে বসান ঊষাকে। কনখলকে একটু কড়া করেই ঘরে

যেতে বলেন। মানে ছিল। কনখলের বিছানায় আয়েষা এসে শুয়ে আছে। সেটা আগে বলেন না। কনখল আসতেই আয়েষা ধড়মড় করে উঠে বসে বলে—আবার পাগলামি শুরু হয়েছে বুঝি? তার কি দোষ?

ঘন্টি বাজিয়ে রহমৎ খানা তৈয়ার জানায়। বাগ্‌চি, জাফর, কুলসম, নিভা, আয়েষা, কংখ্‌ টেবিলে বসে। উষা পাশে একটা চেয়ারে বসে থাকে। মুসলমানের রান্না ও খাবে না, শিলেট গোঁড়া হিন্দুর রাজত্ব। হঠাৎ বাইরে হরেনবাবুর গলা শোনা যায়—বৌদি, আজ আমি জাত খোয়াব। ডিনার টেবিলে আমার একখানা চেয়ার।

সবে স্থপ দেয়া হয়েছে। নিভননী নিজে উঠে গোলকামরা থেকে চেয়ার নিয়ে আসেন। বলেন, বস্থন ঠাকুরপো।

রহমৎ ওস্তাদ বান্দা। আর একটি স্থপের ডোঙা, মায় কাঁটাচামচ এর মধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছে। ডামাস্ক কাপড়ের ন্যাপকিন শুভ্র ফুলের মতো করে বাঁ দিকের কোয়ার্টার প্লেটে। বাগচি হেসে বলেন, জানতাম।

জ্বলে ওঠে হরেন। কি জানতে হে সাহেব? তুমি আমি জীবনটাকে ইন্ধন করে চলেছি। কিন্তু প্রাণের বিকাশের কোনো আমল দিয়েছি? আমাকে গীতা সোসাইটির স্বামীজি ডেকেছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন কনখলের কথা। ইমাম সাহেবের কথা। যখন সব কথা শেষ হোলো, বললেন বস্থন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা থাকবে, মিথ্যা ঠিক কুয়াসার মতো কেটে যাবেই, আর আচার অনাচার বিভেদ মিটে যাবে। বাড়ীতে গেলাম। আমি তোমার এখানে আসি, যেখানে মুসলমানী আয়েষা বৌদির সাথে রান্নাঘরে বসে, এখানকার খাবার খাই—আমার স্ত্রী পার্শ্ববর্তী অপরা তিন গিন্নীর সাথে তারই ফলাও আলোচনায় লিপ্তা ছিলেন। আমি যেতেই যে সব ভাষা উচ্চারণ করলেন, সেগুলো সাধু তো নয়ই, অসাধু বলেও তার কৌৎসিত্য বোঝাতে পারবো না। অর্থাৎ—

—থামো হে, সুপটা খাও।

হরেনবাবু বললেন, খাচ্ছি। কিন্তু আদব কায়দা জানিনে। বলে সুপপ্লেট দুহাতে ধরে দুধের বাটির মতো চুমুকে সবটা সুপ খেয়ে নিলেন। সমস্ত ডিনার টেবিল হাসিতে ফেটে পড়লো। রহমৎ যে তৈরী খানসামা, তারও সাদা দাড়ার ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা। দৌড়ে এসে প্লেট সরিয়ে হরেনবাবুর বাঁ দিকে চিকেন কাট্‌লেটের ডোঙা স্থাপন করল, হরেনবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে খপ্‌ করে ডান হাত দিয়ে চারটে কাট্‌লেট তুলে নিজের প্লেটে রাখলেন এবং আর কারুকে দেবার আগে কচ্‌মচ্‌ করে সেগুলো খেয়ে ফেললেন।

আয়েষা উঠে এসে বলে, কাকাবাবু আপনি আমাদের সাথে এক টেবিলে খাচ্ছেন, একথা জানাজানি হবে।

—তুই থাম তো—রহমৎ আর কি আছে ?

নিভাননী হেসে বলেন, ঠাকুরপো, এর পর রোষ্ট আছে,—খাসীর মাংসের। তারপর ঘি-ভাত আর মুর্গীর কারি, শেষ পুডিং। জানিয়ে রাখছি এইজন্যে যে যেটা যতটা খাবেন কোন অভাব হবে না। যা ভালো লাগে পেট ভরে খান।

হরেন এবার নিজের গোঁফ্‌ মুছে বলেন,—তা ত খাবই। তবে, বোধ হয় আপনাদের অংশে কিছু কম-ই পড়ে যাচ্ছে—

—একেবারেই না। আজ জাফরেরা এখানে খাবে, সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে। আর দেখুন না, এই হতভাগিনীটাকে, বলে উষার দিকে আঙুল দেখান নিভাননী। ও একসঙ্গে বসবে না। কিন্তু দেখুন, ভাতকারী নিয়ে কেমন মেঝেতে বসে গেছে। বেচারা শোকতাপ পাওয়া মানুষ—

কনখল আর আয়েষা হাত টেপাটেপি করছে। হঠাৎ দু'জনাই উঠে বলল, আমাদের পেট ভরে গেছে মা রোষ্ট খেয়ে! আমরা উঠ্‌ব ?

নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকান সভয়ে—অভব্যতা করছে

ছেলে। কিন্তু না। হৃষীকেশ বলেন, ঠিক আছে। টেবিল বড়োদের ছেড়ে ছোটোরা উঠে যাক।

নিভাননী বলেন, রহমৎ, দুগ্লাস দুধ দিয়ে এসো কনার ঘরে। যা তোরা। আর দেখিস্, যেন ঝগড়াঝাটি করে জ্বালাস নে। হরেনকে বলেন,—ঠাকুরপো, আর একটু ভাত কারী ?

হরেন বলেন,—আজ দীক্ষা হোলো। যতো দেবেন খেয়ে যাব। কিন্তু ভাবতেও ভয় হচ্ছে বাড়ীতে সমাদরের বহরটা কি প্রকার হবে।

বাগচি বলেন,—খেয়ে দেয়ে একটু বাইরে বসি চলো। ইতিমধ্যে, বলে নিভাননীর দিকে ইঙ্গিত করেন।

নিভাননী ঊষার হাত ধরে বলেন, বাড়ী যাবি চল্। ঊষা বাড়ীতে ঢুক্‌লে জীবনকে ডাকেন। বলেন,—বাবা, আমায় একটু হরেনবাবু উকীলের বাসা থেকে ঘুরিয়ে আনবি ?

জীবন সাত তাড়াতাড়ি তৈয়ারী। চলুন মাসীমা।

রাত হয়ত সাড়ে আটটা ন'টা। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় যে গৌরাঙ্গী বসে আছেন তিনিই হরেনের স্ত্রী বুঝতে দেরী হয় না। একেবারে একা। প্রতিবেশিনীরা কেউ নেই। নিভাননী গিয়ে সামনে বসেন। বলেন, ভাই, ভয় পাবেন না। আমি কনখলের মা। একটু আলাপ করতে এলাম। অবসর আছেন ত ?

হরেনবাবুর স্ত্রীর নাম নির্ম্মলা। তিনি উঠে এসে নিভাননীর দুহাত ধরেন। বলেন, আজ আমার কি ভাগ্য। অবসর কেন থাকবে না দিদি। কোলেও কেউ আসেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই। সময়ে অসময়ে এবাড়ী ওবাড়ীর গিন্নীবান্নিরা এসে আসর জাঁকান, কিন্তু এ রাত্রে যে দিদি ? সঙ্গে—

ও বাড়ীর জীবন। বাইরে বসে আছে। আমি কিন্তু আপনি ছেড়ে তুমিতে নাম্‌ব। আমাদের কর্ত্তারা তাই করেছেন। শোনো বৌ, তোমার বর আজ আমার ওখানে রাত্র খাবেন। 'খেয়েছেন' বলে উঠ্‌তে পারেন না নিভাননী। বলেন,—আমার ঠাকুর আছে, আমিও বামুনের মেয়ে। বাইরের ঠাটঠমকে ভুল বুঝো না।

জানো না বোধ হয়, বিত্তাভূষণ ম'শায় রোজ বিকেলে চা জলখাবার খান।

—কিন্তু দিদি, ঐ যে শুনি, পুলিশডাক্তার আর তার মেয়ে ওখানে—

—ও আয়েষা? হ্যাঁ সে আসে, কিন্তু সেত হেঁসেলে ঢোকে না। এর আগে পোলো ময়দানের টিলার বাসায় পাশাপাশি ছিলাম। ঐ মেয়ে আমার ছেলের বন্ধু, তাই না এসে থাকতে পারে না। আর মেয়েও রত্ন। কোনোদিন আমার হিঁদুয়ানীতে চোখ দেয় নি। আমি নাড়ুগোপালের মাথায় জল দি, তুলসী তলায় প্রণাম করি, ও মেনে নিয়েছে এগুলো করতে হয়।

নির্মলা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন,—দিদি, মনে বড়ো অশান্তি।

নিভাননী একেবারে বুকে টেনে নেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ঠাকুরপোকে বকাঝকি করবে না, দেখবে শান্তি আসবে। বিধাতার রাজ্যে অশান্তি নেই, মানুষ নিজের মন থেকে সৃষ্টি করে কষ্ট পায়। পারবে?

এমন একটা জায়গায় ঘা দিয়ে নিভাননী কথাগুলো বলেন, নির্মলার দুচোখ ভেসে যায়। নিভাননী আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেন। কিছু বলেন না।

পুলিশ ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। বাইরের ঘরে হরেনের গলার শব্দ শোনা যায়।—এ কি জীবন? একা বসে?—কি, কি,—তাই নাকি? আচ্ছা কাণ্ড যা হোক্। বৌদি, কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ—

—উঠ্‌ছি ঠাকুরপো। নিজে ত গিয়ে রোজ বিকেলে আড্ডা জমান। আমার বোনটিকে একদিনও আনতে পেরে ওঠেননি এ পর্যন্ত। তাই এলাম। এখন থেকে রোজ ও যাবে। নিয়ে যাবেন কিন্তু। বলে নিভাননী ওঠেন।—কই বাবা জীবন, চলো, রাত হয়ে গেছে।

হরেন দম্পতীর সে রাত বিনা কলহে কাটে। নিভাননীর দৌত্যে মঙ্গলস্পর্শ ছিল।

ফেরবার পথে উষাকে দেখে যান নিভাননী। ঘুমিয়ে পড়েছে! মাথায় হাত দিয়ে প্রার্থনা করে যান অভাগীকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য। বাড়ীতে গিয়ে দেখেন জাফর কুলসম আয়েষা চলে গেছে। হৃষীকেশ চুরোট মুখে একা বারান্দায় বসে। কনখল ঘুমিয়েছে। স্বামীর পায়ের কাছে পড়েন নিভাননী। বাগচি তাঁর মাথার চুলে হাত বুলোন।

১৮

ইমাম সাহেবের উপদেশ মতো বাগচি তদ্বির করে বদলীর চেষ্টা করছেন। সামনে পূজোর ছুটি। ছুটির পরে ফেঞ্চুগঞ্জ বলে এক বন্দরে পরীক্ষামূলক মহকুমার হাকিম হয়ে যেতে হবে। পূজোয় দেশে যাবেন, তোড়জোড় চলছে। লেফটেনাণ্ট আব্বাস বলে ছোকরা ডাক্তার মিলিটারিতে এসেছে, আয়েষার বিয়ের সম্বন্ধ তার সাথে পাকাপাকি। বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আয়েষা ঘরকুনো হয়ে গেছে,, আদৌ বাড়ীর বাহির হয় না। কনখল আব্বাসকে দেখেছে। যেমন শিকারে, তেমনি পোলোতে। আর একেবারে সাহেবদের মতো দেখতে, টক টক করছে গায়ের রং। কনখলের পরিচয় পেয়েছে আয়েষার বাবার কাছে। আয়েষাকে বিয়ে করবে বলেই বোধহয় আয়েষার খেলার সাথীকে একটু ভালোও বেসেছে।

বাড়ীর পাহারা হারুণকে রেখে, দিন দেখে, বাগচি নিভাননী কনখল রহমৎ দেশমুখী রওনা হন। আবার সুরমা, করিমগঞ্জ, চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে বিরাট বড়ো চাটগাঁ মেল জাহাজে ওঠেন সবাই। জিনিসপত্র গোছগাছ করে কুলী মিটিয়ে ডেকে গিয়ে বসেন হৃষীকেশ। কেবিনের সাথে বাথরুম, কনখলকে মুখ হাত ধুইয়ে ঠিকঠাক করে রহমতের জিম্মা করে দেন নিভাননী। নিজে গিয়ে ডেকে বসেন। রহমতের হাত ধরে লাফাতে লাফাতে কনখল বলে,—চলো শীগগির, এঞ্জীন দেখব।

ছুটো বিরাট ডাণ্ডা ওঠাপড়া করছে। কতকগুলো চাকা ঘুরছে। বাষ্পাচ্ছন্ন এঞ্জিনের ভেতর। হঠাৎ ঘ্রীং ঘ্রীং করে ঘণ্টি বেজে

উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কী গম্ভীর সুরে ভোঁ আওয়াজ। কনখলের বুক যেন ভরে উঠলো। মেল জাহাজ হৃৎস্পন্দন তুলে তীর থেকে সরে যায়, তারপর মোড় ঘোরে, মেঘনার কালো জল কেটে পদ্মার গেরুয়া তরঙ্গমুখী রওনা দেয়। কনখলের বুক উল্লাসে ভরে ওঠে। একটা অসীম শক্তির পরিচয় পায় ঐ জাহাজের গতি বেগে।

জাহাজের পেছনের ডেকে ঘুরে বেড়ায়। বিছানা পেতে মাথার কাছে তোরঙ্গ রেখে কতো মানুষ সংসার সাজিয়ে বসেছে। আবার একটা চায়ের দোকান, চা বিস্কুট বিক্রী হচ্ছে। চোখ বুলিয়ে যায় কনখল। নীচের তলায় কি পরিমাণ মালপত্র, তারও আনাচ কানাচে লোক। একটা পাশের কামরা থেকে অতিপরিচিত সুগন্ধ আসে, কনখল রহমতের হাত টেপে, রহমত হেসে বলে,—বাবুর্চিখানা।

জাহাজের অন্ধিসন্ধি সরেজমিন করে হাঁপ ছাড়ে কনখল। ওপরকার সামনের ডেকে বেতের চেয়ারে বাবা মা বসে, ও গিয়ে পাশে বসে। জল কেটে জাহাজ চলেছে। এঞ্জিনের ঘস্ খস্ শব্দ আর পেছনে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। দুটো একটা নৌকো বেকায়দায় সেই ঢেউয়ে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। কিন্তু সাবাস মাঝি। কি কায়দায় দোলানি খেয়েও নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে। গাং চিলগুলো নদীর দুপারে চক্রাকারে উড়ছে, আর মাঝে মাঝে মরশুমী হাঁসের ঝাঁক সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে। কনখল পিট পিট করে তাকায়, আর কেবিনের বন্দুক দুটোর কথা ভাবে। কি মনে হয় ওই জানে, হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে। বিশ্বস্ত রহমৎ হাঁটু মুড়ে এক পাশে বসে। আস্তে উঠে এসে রহমতের পাশে বসে কানে কানে কথা কয়। রহমৎ ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে বলে,—জাহাজে ফায়ার করা বারণ, কোম্পানীর আইন। তবে যদি কোন বন্দরে জাহাজ দাঁড়ায় তখন হতে পারে। চুপ করে করে থাকো, আমি সাহেবকে বলব।

দু'সার কেবিনের মাঝখানে বসবার আর খাবার ঘর। কি সুন্দর করে সাজানো। জাহাজের খানসামা এসে বলে,—হাজিরা তৈয়ার। বাবা মা ওঠেন। মা খানসামাকে বলেন, রহমৎ আমার বাবুর্চি। ওর জন্যেও নাস্তা,—

—সে সব ঠিক আছে মেমসাব।

কী অপূর্ব রান্না! দুটো ডিম চট করে খেয়ে নেয়। তারপর, ডোঙার ঢাকনা খুলতে সুঘ্রাণে ঘর ভরে যায়। মাছ সেদ্ধ। ইলিশ মাছ। ওর পাতে পড়তেই খেয়ে দেখে একটিও কাঁটা নেই। কি কায়দায় কাঁটা ছাড়ালো ওরা, ভাবে। আর ঠিক সেদ্ধত নয়, একটু পোড়াটে গন্ধ, তাতেই যেন বেশী ভালো লাগে। কিন্তু কি জ্বালাতন! খাবার জিনিস খেলেই পেট যে কেন ভরে যায়। জল খেয়ে চুপচাপ বসে, কিন্তু জানে, মা এখনি চিঁড়ে ভেজা, ন কি দিয়ে এক মগ দুধ খেতে বসবেন। পরিজ না ছাই। অখাদ্য। কিন্তু আইন অমান্য করা শেখেনি বলে তাও খেতে হয়। মুখ মুছে উঠে যায় রহমতের সন্ধানে জাহাজের বাবুর্চিখানায়। পেতলের ঝকঝকে রেলিং ধরে নীচে নামে। নামতেই যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ে তাতে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। জাহাজ মাঝ গাং ছেড়ে দিয়ে তীর ঘেষে চলেছে। আর দোতলা সমান নদীর পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে নদীর জলে। খুব সোরগোল উঠছে ডাঙা থেকে। লোকে ঘরবাড়ী জিনিসপত্র সরাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে নদীর জল গেরুয়া। স্রোত খরধার। রহমৎ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করেনি। রহমৎ বলে,—পদ্মা।

পদ্মা! কনখলের দুইচোখ বিস্ফারিত হয় অবাক বিস্ময়ে। এই পদ্মা! মনোহারিনী, কলকলনিনাদিনী, তটবিপ্লাবিনী,অথচ সংহারিনী, একি ভীষণা মূর্তি এই নদীর। ও পড়েছে কি যেন বইয়ে কীর্তিনাশা বলা হয় এই নদীকে, বহু প্রতিষ্ঠাবান লোকের কীর্তিনাশ করেছে। কেউ কেউ কর্মনাশাও লেখে। ছুটে আসে মায়ের কাছে। বলে,—মাগো, এই নদী—

—হ্যাঁ—এই নদী পদ্মা। বোস ত আমার কোলে। হ্যাঁরে কনা, বেড়ে উঠলি ত এগারো বারো হয়ে, জীবনে নিজেদের আত্মীয় স্বজন কাউকে দেখিসনি। গ্রামে যাচ্ছিস, সেখানে সবাই গরীব, সবাই নবাব। কিন্তু সাহেব নেই। কি করে সেখানে থাকবি ?

—বাবা আর তুমি যে ভাবে থাকবে। স্থির কণ্ঠে বলে কনখল।

—ঐ দ্যাখ, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম গেছে, দেশ গেছে, একটা গাছ কোনরকমে মাথা তুলে আছে। তাতে কতলোক, মুরগী ছাগল সাপ সব উঠে বসে আছে। কেউ কারো কোনো অনিষ্ট করছে না। কি করে হয় ?

কনখল ধ্যানমগ্ন হয়ে এক মিনিট ভাবে। বলে, হবে না কেন ? সবায়েব শত্রু ঐ নদী—নদী থেকে ওরা নিজেকে বাঁচাচ্ছে। আর কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করবে !

নিভাননী ঔৎফুল্লে উপছে পড়তে পারতেন, কিন্তু সামলান নিজেকে। গম্ভীর স্বরে বলেন,

—গোয়ালন্দ এসে গেল। এইবার বাড়ীর লাইন। ষ্টিমার বদল করতে হবে।

গোয়ালন্দ ভারী ষ্টেশন। ঢাকা মেল, চাটগাঁ মেল আরো কতো রেলগাড়ি আর জাহাজের আড়ৎ। চাটগাঁর ডাক জাহাজ থামতে সেকি কোলাহল ! কাঠের সিঁড়ি পেতে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে দেবার সাথে সাথে হাজারো কুলীর আক্রমণ। রহমৎ—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও বলে একে ওকে খেদিয়ে, তিনকুলীর মাল নিয়ে নীচে নামল। নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন—, এইবার ?

—চলো দেখাচ্ছি।

কালীগঞ্জ সার্ভিস ষ্টিমারের আরোহী হয়ে কনখল ষোলবোরের বন্দুকটা হস্তগত করেছে। বাবার হাফগ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে কার্তুজ ছিল, চারটে চার নম্বর নিয়েছে। রহমৎকে গা টিপে জানিয়ে দিয়েছে অপরাধের কথা। জাহাজ ছাড়তে দু ঘণ্টা দেরী।

নতুন জাহাজে হৃষীকেশ নিভাননী খোলস বদলাচ্ছে। হৃষীকেশ ইজের কোর্তা ছেড়ে খালি গায়ে ধুতি পরেছেন। খালি পা নিভাননী লাল কস্তাপেড়ে পরে গৃহলক্ষ্মী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু রহমৎ ও কনখল যে সাতটা ঘুঘু কবুতর আর সারস মেরে এসেছে, সেটা লক্ষ্য করেননি। রহমৎ বুড়ো ওস্তাদ। বলে,—বাবা গাঁও এসে গেছে, জাহাজ ছাড়লেই পৌঁছব। শিকার কটা,

—বুঝেছি। গাঁয়ে বুঝি আমরা অন্যরকম হয়ে যাব? তাহলে,

—আমি বলিকি বাবুর্চিখানায় দিয়ে আসি। সন্ধ্যে নাগাদ গাঁয়ে পৌঁছব। তার আগে দুপুরের খানায় যদি ওরা করে দেয়,

—বেশ ত, দাও না। কিন্তু মাকে আমি বলবই। রহমৎ বিব্রত বোধ করে। কনখল গিয়ে নিভাননীর কোলে মুখ গুঁজে সব বলে। নিভাননী ছেলের দুঃসাহসে উতলা হন কিন্তু খুশীও হন। বলেন,—ঠিক আছে। সামলে নিচ্ছি।

ঐ একটি কথা। সামলে নিচ্ছি। না বলে নিভাননী যদি সেদিন শাস্তি দিতেন, হয়তো কনখলের ভবিষ্যৎ রূপান্তর গ্রহণ করতো।

খাবার টেবিলে বিচিত্র পক্ষীমাংসের সমাবেশে হৃষীকেশ পুলকিত হন। বলেন,—আমাদের কালীগঞ্জ সার্ভিস লাইন রীতিমতো উন্নত। কেউ কিছু ভাঙে না, তবে কনখল উসখুস করে। মিথ্যে সহ্য করতে পারে না তাই। ছাগলছানার মতো মায়ের বুকে ঢুঁ মারে। নিভাননী হেসে ফেলে বলেন,—এসব ইষ্টীমারের নয়, তোমার ছেলের শিকার। বোকো না, কথা দিয়েছি।

হৃষীকেশ কয়েক মিনিট গুম হয়ে থাকেন। বা হাতের কাঁটা দিয়ে সারসের রোষ্টএর ঠ্যাং চেপে ডান হাতে ছুরী চালান। মুখে মাংসের পিণ্ড ঠেলে দিয়ে বলেন,

—কার্তুজ পেল কোথায়?

—কেন, খোলা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে।

—হুঁ। আচ্ছা হাতের তাক ত! সতেরোটা পাখী মারল চার

কার্তুজে। কিন্তু এইবার গোলাবারুদ সামাল করো নিভ। বন্দুকেও শিকলি পরাও। আজ সাত বছর পরে গাঁয়ে ফিরছি। মা আছেন, দুই বৌদি আছেন, প্রচুর আত্মীয় বন্ধু আছেন, তাদের সাথে এক হয়ে একমাস থাকব—এতে যেন বাধা না হয়।

—কোনো বাধা হবে না। কনাকে আমি আগলে রাখবো।

কালীগঞ্জের ষ্টীমার ছাড়বার ভোঁ দিলো, সিঁড়ির পাটাতন সরে গেলো। তর তর করে জাহাজ পদ্মা ছেড়ে যমুনার দিকে মোড় নিলো। সিরাজগঞ্জ লাইন। ওই লাইনেরই কোনো এক অখ্যাত ষ্টেশন বাগচিপরিবারের গন্তব্য স্থান। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার, তবুও হৃষীকেশ গ্রাম্য হবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। জুতো মোজা কোট পাৎলুম ট্রাঙ্কে উঠে গেছে। একটি ছাতা, খালি পা, ধুতি, গেঞ্জি, দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে। নিভাননী ঘোমটা টেনে কলাবতী হয়ে বসেছেন। কনখল দেখছে আর অবাক হচ্ছে।

আরিচা গেল, নগরবাড়ী গেল। এইবার। বাগচি অসম্ভব অধীর হয়ে উঠেছেন, ষ্টেশন দেখা দিতেই স্ত্রী-ছেলের হাত ধরে সামনের ডেকে টেনে নিয়ে বলেন,—এই আমাদের দেশ। ভালো করে দেখো।

দেশের মাটিতে ষ্টীমার ভিড়ল। কি বিরাট নদী, আর কি ঘূর্ণী জায়গায় জায়গায়। কে একজন একদলা কাগজের মোড়ক ছুঁড়ে দিল ঘূর্ণীর বুকে, অতলে তলিয়ে গেল মুহূর্তে।

শুধু মা বাবার চেহারাতেই রূপান্তর নয়, রহমৎও উর্দী ছেড়ে কখন ধুতি সার্ট পরেছে দেখে কনখল। ভাবে নিজেও তবে তাই করবে নাকি। নিভাননী ধুতি পিরান বার করেই রেখেছেন। ওর ত অভ্যাস আছেই। কাপড় ছাড়তে দেরী হয় না।

সিঁড়ি পাততেই যে ভদ্রলোক এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর পরনে ধুতি, কিন্তু গায়ে সার্টের ওপর খাকী কোট। কনখল দেখে অবাক হয়, সার্ট কোট বাবা যেমন পরেন তেমনি। কলকাতার সাহেব বাড়ির। বাবা বলেন, শিবুদা। ওরে প্রণাম কর। নিভাননী

হাঁটু গেড়ে বসে ঝাড়া দু মিনিট প্রণাম করেন। কনখল ঝট করে দুপায়ের পাতা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক বলেন, চলো, নামি। আয়রে কনখল, আমার হাত ধর। ভালো লাগে কনখলের, কেমন যেন উদার চষা মাঠের স্পর্শ তাঁর কর্কশ হাতের তেলোয়।

সবাই নামেন, ছোট্ট ডিঙিতে চড়ে বসেন, ডাকাতে চেহারার গহর মাঝি নৌকা চালাবে, আগে মালপত্র শিজিল করে নিচ্ছে। একটা ছোট্ট ছেলে, পুঁচকে, বছর ছয়েকের হবে, বসে হালের কান মোচড়াচ্ছে। মাঝি বলে, ছারান দে, ভাঙ্যা যাবে। ছেলেটা হঠাৎ ভয় পেয়ে যায় যেন। হাতের কসরৎ থেমে যায়। গহর বলে, রায়বাহাদুর ছাড়ব? সেই ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। কিন্তু জিজ্ঞেস করেন,—জোলায় সোঁত আছে ত? গহর বলে, সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত টানা জল। কোনো ফিকির নেই।

কনখল শুনতে পায়, বাবা ঐ শিবুবাবুর কানে কানে বলছেন, —দাদা, এটা গহর ডাকাত না? উনি হেসে মাথা নাড়েন। মার যে কি হয়েছে, বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে লজ্জাবতী হয়ে বসে আছেন। ডিঙি তরতর করে চলেছে যাকে বলছে জোলা, সেই নালা দিয়ে। সরু, যেন হাত বাড়ালেই দুপার ধরা যায়। কত ঝিয়ারীরা চানে নেমেছে, কত বউ কলস ভরে, সর্বাঙ্গে তরঙ্গ উথলে ঘরকে চলেছে। কত কলির কানাই আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে। ডিঙি চলেছে।

বাবা হঠাৎ গহরের হাত ধরে প্রায় বুকে টেনে বলেন, গহর দা চিনতে পারো?

পারবো না ক্যান—রিসি—গাব চুরী কর্‌যা খাওয়ার ওস্তাদ। শুনল্যাম নাকি হাকিম হছিস, তাই ভয়ে কথা কই নাই।

—ওডা কে? ওই ছ্যাঁরাটা?

—আর কও ক্যান। কি বিপদেই পেরল্যাম ডাকাতি করব্যার গিয়া। মরিয়ম, ঐ যে সাজাদ দারোগার বহেন,—লুট্যা ত আনলাম।

নিকাও হোলো। ফল ঐ চ্যাংড়া। মরিয়ম মর‍্যা গিছে। গহরের দুচোখ টসটসে জলে ভরে এলো।

ঐ যে রায়বাহাদুর শিবুদা, তিনি বললেন, থাম তুই গহর। শোনো রিস্তু ওর বউ ত মরলো, ঐ একটি ছেলে রেখে। ডাকাতি ছাড়ল। ছাপান্ন ইঞ্চি বুক নিয়ে আমাকে গিয়ে বলল, আমাকে শাস্তি দাও রায়বাহাদুর আমি মাইনষের ভালোই করব, আর ডাকাতি করব না। ফলে ওর বিরুদ্ধে যা কিছু চার্জ ছিল, নাকচ করে দিয়ে ওকে গাঁইয়া করে নিয়েছি। ভালো করিনি? কি বলিস রিস্তু?

বাবা বলছেন, দাদা, আপনি কোন দিন কোন কাজ খারাপ করেছেন, একথা কেউ বলবে না। তবে গহরকে একলা পেলে আমি জেল দিতাম।

গহর দাঁড় ছেড়ে রুখে দাঁড়ায়। কি বিশাল বুক, এক মুখ দাড়ি। দুটো হাত যেন চাটগাঁ মেলের দুটো ইস্পাতের রানার। ছাপান্নো ইঞ্চি বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। গহর বলে, আস্তা গ্যালাম রায়বাহাদুর। রিস্তুকে কয়্যা দিবেন, গহর কোনোদিন মন্দ কাজ করে নাই।

মন্দ কাজ? কাকে মন্দ কাজ বলা হয়, কনা জানে না। মন্দ? সে কেমন কাজ? যা ভালো লাগে, তাকে যদি কেউ মন্দ বলে, তবে, যারা বলে, তারাই মন্দ। নিভাননী কেন যে ভূতের মতো ঘোমটা টেনে বসে আছেন! কনখলের বিস্মিত সত্তা উত্তর চায়, উত্তর চায়।

কিছুতেই পেছপাও হবার মতো ধাত নয় কনখলের। সাহেবঘেঁষা চটি পরা মা যে হঠাৎ কি করে ঘোমটাবতী কুলবতী হয়ে গেলেন, দেখে তাক লাগলেও হতভম্ব হয় না কনখল। দুর্ধর্ষ সাহেব বাবা হঠাৎ খালি গায়ে খালি পায়ে ধুতির কোঁচর কোমরে বেঁধে ছাতা মাথায় এ বাড়ী ও বাড়ী করে বেড়াচ্ছেন, এবং দিনের মধ্যে গাঁয়ের সব কটা বাড়ীতে মুড়কী, নাড়ু, নারকোলের ফোঁপরা, অন্তত পঁচিশবার খাবার পরও বেলা চারটেয় তাঁর শিবুদাদার বাড়ীতে আড় মাছের ভাজা সুক্ত, বিরাট বোয়ালের পেটি সমাকীর্ণ

দগদগে লাল মরীচ পোড়া ঝোল, কইমাছের সর্ষেবাটা পাতুরী এবং কচি বেগুনের নৈবেদ্যার্পিত টাটকিনি খরশোলার পান্‌সে ব্যঞ্জন সমানে খেয়ে যাচ্ছেন। তার পরও রাত আটটা বাজতে না বাজতে একবার বাড়ীতে এসে হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন, খাওয়াটা সুবিধের হোলো না মেজবৌ। ক্ষীর চিঁড়ে কলা থাকে ত তৈরী রেখো। বড়বাড়ীতে ঝুমুর গান আছে। শেষ হলে আমি আর শিবুদা এসে খাব। বলেই ঘরের হাফ গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ থেকে অত্যাশ্চর্য টর্চ লাইট হাতে আবার খালি পায়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। রহমৎ বলে, সাহেব দেখছি দারুণ গাঁইয়া।

ওই টর্চ লাইটটার রহস্য আজো ভেদ করতে পারেনি কনখল। একটা চক্‌চকে চোঙা—গায়ে বোতাম। টিপ্‌লেই ছুঁচের মতো আলো বেরিয়ে বাড়তে বাড়তে দশ বারো হাত আগে জায়গা ঘোর অন্ধকারেও আলো করে দেয়। এই যন্ত্রটা শিলেটে ফায়ার মেরিন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহেব দিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, হালে বেরিয়েছে। আরো কত কি বেরুবে। দেখো, আমরা, ইউরোপীয়ানরা জড় প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করব। এখুনি কি হয়েছে। তোমরা ভারতীয়েরা দৈবে বিশ্বাস করো, আমরা করি বাহু ও মনোবলে।

কনখল ও সব কথা কানে তুলেছে, আর-এক কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা মেরামতের ঐ যে জানোয়ারের মতো ইঞ্জিনটা, ঐটে ওকে বুঝতে শিখিয়েছে, মানুষ একদিন প্রকৃতিকে জয় করবে। একদিন মানুষ জলে স্থলে পাতালে সমানে দাপট চালাবে। কনখলের "ঠাকুরমার ঝুলির" রূপকথা একদিন সাহেবদের বাহু ও মনোবলে রূপায়িত হবে। কনখল বিস্ফারিত চোখে দিগন্তে তাকায়, এ রহস্য কবে ভেদ হবে, কবে ভেদ হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ কি চাঁদের মা বুড়ীর কাছেও গিয়ে পৌঁছবে?

কিন্তু কনখল ছেলেমানুষ। তার মন চায় দিগন্ত ছোঁওয়া মাঠের আনাচে কানাচে উঁকি দিতে। দু' চারটে বাবলার ঝাড়,

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হালে উঠে আসা গ্রাম পত্তনের কয়েকটি কুঁড়ে ঘর, প্রমত্তা যমুনার পক্ষপাতী ভাঙন, আর উদয়াস্ত খোলা মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মার্তণ্ড তাণ্ডব।

যমুনা এ পার ভাঙ্‌ছে, তো ও পার গড়ছে। ধ্বস নামছে যে পারে, অপর পারে জমি জেগে উঠছে। এ যেন জোর যার, মুল্লুক তার। এক লহমায় কনখল বুঝে নিয়েছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পড়েছে কথাটা কোনো কেতাবে, মানে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, কিন্তু আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্থটা।

ওর অপরিণত মানসে এ সব তত্ত্বকথা বেশীক্ষণ আসন গাড়ে না। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে! বলে, রহমৎ, চলো শিকার করে আসি বড় নদীতে। কাল ভোর রাতে। আমি চাইলে বন্দুক হাতছাড়া করবেন না মা-বাবা, তুমি চাইলে নিশ্চয় দেবেন! বেরোতে হবে বাত দুটোয়।

নিভাননীকে রাজী করাতে বেগ পেতে হয় না রহমতের। তিনি ভাবেন, ছেলেটা অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে কাহিল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, যাক্‌ না, একটা খেলাধুলোর মতো শিকারে। হৃষীকেশকে আদৌ কিছু বলেন না। বাবো আর ষোলো দুটো বোরের বন্দুক আন্দাজ মতো কার্তুজ দিয়ে রহমতের হাতে দিয়ে দেন আগরাত্তিরেই। শুধু বলেন, কনার কোনো অমঙ্গল না হয় দেখো রহমৎ।

নিভাননী মনে মনে আঁচেন, হৃষীকেশ গ্রামে এসে মেতে আছেন বাল্যসাথী আত্মীয়-স্বজন গ্রামীনদের নিয়ে। তাঁকে কিছু এখন বলতে যাওয়া তাঁর বহুদিন পিছে-ফেলে-আসা দিনগুলোর ওপর বৈদ্ধস্ত আনা। বুদ্ধিমতী নিভাননী। থাক না সাহেব তাঁর অতীতের মাধুর্যে ছুটির কটা দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে। হালের হাকিমী জীবন যেন বিস্মরণের বৈতরণীতে তলিয়ে গেছে। তিনি নিজেও ত গ্রামের সহজ সরল জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। বাড়ীর ছোট বৌটি হয়ে দুই বড় জার হুকুম

তামিল করে যাচ্ছেন, দু' বেলা আনাজ কাটার ধূমে স্থানীয়া ঝিয়ারীদের হার মানিয়ে দিচ্ছেন, দু'পুরে ঢেঁকি পাড়েও গ্রাম্য বীরাঙ্গনাদের সাথে সমান পদক্ষেপে চলেছেন। সেমিজ সায়া বাদ দিয়ে কস্তাপেড়ে লাল সাড়ী পরে বাড়ীর পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে গৃহদেবতা শালগ্রামের মাথায় জল দিচ্ছেন, সজ নৈবেদ্য টাটে সাজিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কি কিছু দোষ ধরতে পেরেছে? তবে হেঁসেলে ঢুকতে দেন না মেজ জা, বলেন, চাকরীর জায়গায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছিস, যদি খেতে এসে গাঁয়ের পাজীগুলো একটা বেফাঁস কথা বলে, মাথা কাটা যাবে। থাক না নিভা, তুই জোগাড় দে, রান্না আমিই তুলে নিতে পারব। বড়জার হবিষ্যি ঘর, সেখানে ঢোকার কথাই ওঠে না, তবে দাওয়ায় বসে নারকোল কোরান, সেই যে ময়ূরের ঝুঁটি লাগানো বঁটিতে ঘসে ঘসে। ঝুরঝুরে নারকোল গুঁড়িতে বারকোষ ভরে ওঠে, হবিষ্যির চৌকাঠে ঠেলে দিয়ে বলেন,—বড়দি, আর কিছু? বড়দি বলেন, ডালফেলা তরকারীর ডাঁটা লাউগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে দে ত নিভা। বুড়ো মটরের এই বেগুনটা ঠাকুরপো ভালোবাসে। নিভার মনই কনখলে সংক্রামিত হয়েছে। সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার আশীর্বাদ তাঁর জীবনদেবতা দিয়ে রেখেছেন। খুশী মনে দাসীবৃত্তি করে যাচ্ছেন দুই বড় জা'য়ের। মন ভরে উঠছে, বুঝে উঠতে না পারলেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছেন তৃপ্তিতে।

রাত দুটোয় দুই অ-সমবয়সী শিকারী সাথী, রহমৎ ও কনখল, বড়ো ছোটো দুই বন্দুক ঘাড়ে ফেলে, বড় নদীর পথ ধরে। অত রাতে জোলা দিয়ে নৌকা বা ডিঙি বেরোয় না, হেঁটেই পাড়ি দেয় চার মাইল রাস্তা। যমুনার পারে পৌছতে তিনটে সতিনটে হয়। শেষ রাতের কুয়াশা ভেদ করে ভোরের রোশনাই ধীরে ধীরে জাগছে। জলজমিনের কুয়াশা ঘন, ওপরের দিক পরিষ্কার হয়ে আসছে। একফালি ছোট স্রোতস্বতী, ইছামতী, মিশেছে এসে বাঘিনী যমুনার সাথে, ওরা পৌছোয় সেইখানটায়। যমুনার

পার পাহাড় সমান উঁচু, নীচে খরস্রোতা ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল সর্বনাশা বীচিবিভঙ্গ,—জল ঘোর নীল। ইছামতীর জল ইলিশ মাছের মত সাদা। যেখানটায় ডাকিনী যমুনার কোলে আছড়ে পড়েছে সেখানটায় নীল সাদা দুটি রং-এর বিভেদ পরিস্ফুট।

হঠাৎ কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠে যায়। কনখল নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে এই কি নদী? এপারে পৌঁছে গেছে, কিন্তু অপর পার? দিগন্তে মিশে গেছে অনন্ত জলরাশি, ও পার দেখাই যায় না। অজানা ভয়ে গুরগুর করে ওঠে কনখলের বুক। বলে, রহমৎ, এ নদী, না সমুদ্র? রহমৎ বলে, শুনেছি এটা বাইশজুড়ির মোহনা। নদী এখানে বাইশ মাইল চওড়া। ভরা বর্ষার জল এখনও নদীতে থেকে গেছে, মাঝখানের চর-টর সব জলের তলায়। ভয়ানক নদী এ কনাবাবা। হোই দেখ পদ্মার গেরুয়া জল, আর এখানকার জল কী নীল। আরে, এ ছোট নদীটা রূপোর মত চকচকে, কিন্তু ধার কি!

—দেখ দেখ রহমৎ, ওগুলো কি?

—চুপ চুপ কনাবাবা, লালশির, ঝাঁকে বোধ হয় শ'পাঁচেক আছে। আর ওই যে ছাইয়ে সাদায় দেখছো, হলদে ঠোঁট, ওগুলো দোমেলা। সাহেবরা পিন্টালি বলে। এ দুটোই খুব ভালো জাতের হাঁস। শুয়ে পড়ো, মাটিতে বুক দিয়ে, আমি এক দুই তিন বলব, একসাথে ফায়ার হওয়া চাই।

সদ্য পড়ন্ত চরের জিলজিলে পাতলা বালুবিস্তারের ওপর, ইছামতী যমুনার সঙ্গমে এই হাঁসের পাল, রাত্রি-বিশ্রামান্তে উড়ি উড়ি করে মৃদু মৃদু ডানার ঝাপটা দেয়। এক সঙ্গে পর পর চারটে আওয়াজ গর্জে ওঠে দুটো দোনলা থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যায়। ঘাড় কাৎ করে মরে পড়ে থাকে মোহনায় গুটি কুড়ি। আধ-মরা গুটি চার পাঁচ ওড়বার বিফল চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

কনখলের তর সয় না। অতগুলো পাখী পড়েছে, আনতে হবে, আর ও ত পারের কাছেই। হরিণের মতো বেগে দৌড়ে ইছামতী যমুনার বাঁকে নামে, ও জায়গাটা ঢালু খাড়া পার নয়। জলে পা

দেবার সাথে সাথে আর্ত নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ওঠে,—নেমো না, নেমো না, প্রাণে মরবে—

কিন্তু কনখল এ সাবধানীর মানেও বোঝে না। হাতের কাছে এতগুলো শিকারের পাখী, নামবে না ত আনবে কি করে? ও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থার্মোমিটার ভাঙা পারার মতো তিন আঙুল জলের নীচের বালিতে। হায় হায় করে ওঠে নারীকণ্ঠ। রহমতের কোন পাত্তা নেই। বুড়োমানুষ, ধীরে সুস্থে এগোয় হয় ত। কিন্তু কনখল ছোট হলেও নারীকণ্ঠের সাবধানবাণীর মানে বোঝে এইবার। এক পা, যেটা আগে পড়েছিল, দেবে গিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত। আর এক পা বালিতে দিতে সেটাও দেবে যায়। পার হাত তিনেক দূরে। তারপর যতো চেষ্টা করে ততোই দু'পা পাতাল প্রবেশ করতে থাকে ধীর কদমে, পাঁচ মিনিটে আধ ইঞ্চি রেটে। ওর অজ্ঞাত মানসে ঝলকে ওঠে একটি কথা,—চোরাবালি? তবে, তবে উপায়?

তীব্র আদেশ আসে পার থেকে—বন্দুক ছুঁড়ে দাও খোকা পারে, ওর ওজনে আরো তাড়াতাড়ি পুঁতে যাবে। এই বুড়ো, একটা বাঁশ-টাশ দেখনা শীগগির, খোকা ত গেল, হতভাগা বুজরুক কোথাকার—

রহমৎ বন্দুক ফেলে বাঁশের সন্ধানে যায়। ইচ্ছে মতো সহজপ্রাপ্য নয় গ্রামদেশে কেনো জিনিসই। আসতে দেরী হয়। কোমর পর্যন্ত চোরাবালিতে ডোবে কনখল।

কনখলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কিন্তু কাতর হয় না। ঘাবড়ায় কিন্তু ভয় পায় না। ভয়ের বিভীষিকা বিপদ ঘটবার আগে, ভয় ঘাড়ে এসে পড়লে শুধু সংগ্রাম, ভয় কাটিয়ে ওঠবার তোড়জোড়। কিন্তু তবুও নিরুপায়, অসহায় মনে হয় নিজেকে। নাভীমূল পর্যন্ত কবরের তলায়, নিশ্চিত মৃত্যু তাকে টেনেই চলেছে নীচের দিকে।

হঠাৎ একটা সাড়ীর আঁচল এসে ঘাড়ে পড়ে। আবার সেই নারীকণ্ঠ—কোমরে বাঁধ দাও খোকা, শক্ত গিঁট। তারপর দু'হাত

ছড়িয়ে বুক আছড়ে পড়ো জলে। খাড়া হয়ে থেকো না। নির্দেশ মতো কষে কোমরে সাড়ীর আঁচল বাঁধে কনখল। তারপর—তারপর ওর আর কিছু মনে পড়ে না। যেন কত যুগ পরে চৈতন্য ফেরবার পর দেখতে পায় ওকে কোলে নিয়ে কে যেন বসে আছে পারের ওপর। সস্নেহে চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার আঁচলের গেরো এখনও কনখলের কোমরে বাঁধা। আলুলায়িতাকেশা, উন্মুক্ত-স্তনা, অপূর্বসুন্দরী, শ্যামমূর্তি। সুস্থ সবল দুটি হাত কনখলকে কোলে টেনে রেখেছে। কোমরের গিঁট ছাড়িয়ে গায়ে কাপড় জড়ায় নারীমূর্তি, বলে, আর কোন ভয় নেই। সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ। কনখল পরম নির্ভয়ে সেই মেয়েটির বুকে মাথা রেখে চোখ বোঁজে। কী যেন ক্লান্তি, থেকে থেকে বিস্মরণ, অভিভূত করতে থাকে ওকে। কখন যে সত্যিই সত্যিই ক্লান্ত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে জানেও না।

ঘুম ভাঙে প্রাণদাত্রীর তর্জনে। ‘কেমন লোক তুমি বুড়ো মিঞা, একটা বাঁশ আনতে দিন কাবার করে দিলে ? খোকাকে ত আমি তুলেছি, এখন বাঁশ দিয়ে আঁকশি বানিয়ে যে কটা পারো শিকারের পাখী তোলো। জ্যান্তগুলো অনেক দূর চলে গেছে। ডিঙি ছাড়া আনা যাবে না। তা না যাক, ছেলে প্রাণে বেঁচেছে, নিয়ে বাড়ী যাও। কোন্ গাঁ তোমাদের ?” রহমৎ গাঁয়ের নাম বলে। বাবার নাম বলে। মেয়েটি হাতের ও-পিঠ গালে লাগিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, বলে চিনেছি।

হঠাৎ জেগে কনখল বলে, তোমার নাম কি ? ফিক করে হেসে ফেলে শ্যামসুন্দরী। বলে, কি নাম পছন্দ হয় খোকা ? কনখল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে,—যমুনাবতী। মেয়েটির, বয়েস কুড়ি বাইশ হবে, বলে—ঠিক বলেছ—অমনি কালোই আমি। তবে, নামটা আমার এলোকেশী।

কনখল অবাক বিস্ময়ে ভাবে, কি মিল যমুনাতে আর এলোকেশীতে। কালো রং, নীল চোখ, চূর্ণ-কুন্তল,—নদীতে মেয়েতে

যেন দুই যমজ বোন। একটা অলৌকিক শক্তিতে ভরা যেন দুজনারই সর্বাবয়ব।

এলোকেশী বলে, বাইরে থাকো, জানো না ত এসব দেশে কতরকমের বিপদ। চরের পলিমাটিতে কেউ নামে কখনো? সব জায়গায়ই যে চোরাবালি আছে, তা নয়। কিন্তু জলটানের সময় জাগন্ত চরের বেশার ভাগই চোরাবালি। বুঝলে বুড়ো মিঞা, ওসব জায়গায় ছোট ছেলে নিয়ে শিকার খেলতে এসো না।

রহমৎ খুঁটে খুঁটে কনখলের উদ্ধারের ইতিবৃত্তান্ত সব জেনে নেয়। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুড়োর মন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় খোদার দোয়া প্রার্থনা করে। বলে, মা, আজ কি সর্বনাশ থেকে বাঁচালে তুমি আমাদের। মেমসাহেব যখন শুনবেন আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কিনা আল্লা জানেন।

মেমসাহেব কে? সুধোয় এলোকেশী। ও খোকাবাবার মা? তা তাঁর যদি বুদ্ধি থাকে, তবে কিছুই দোষ নেবেন না। এ তল্লাটের নদীনালার হালচাল তোমাদের দেশের কেউ হয়ত জানেই না। এতবড় নদী ত তোমাদের দেশে নেই, থাকলেও এমন ভাঙন নেই। ভাঙে বলেই ত বালি মাটি পড়ে, ভেসে এসে, চোরাবালির সৃষ্টি করে। যাক, খোকাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার আগে আমার ওখানে চলো, বাড়ীর গায়ের দুধ আছে, দুয়ে দিচ্ছি, দু'জনে দুবাটি খেয়ে নাও। ওইত নদী পারেই ঘর আমার। আমি জেলের মেয়ে কিনা, তাই ফুটিয়ে নিতে বলছি তোমাদের।

রহমৎ ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে পাকা দাড়ি চুমড়ে বলে, আজ তুমি ওর মায়ের কাজ করেছ গো মা, তোমার হাতে খেলে আমাদের অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। তুমিই ফুটিয়ে দাও।

—চলো।

পকেট থেকে টোয়াইন সুতো বার করে পায়ের দিক গেঁথে গেথে পাখীর মালা বানায় রহমৎ। সেই মালা দু ফেরতা গলায় জড়িয়ে রহমৎ চলে, দুটো বন্দুকই ঘাড়ে নিয়ে। কাদামাখা হাফপ্যাণ্ট পরে

এলোকেশীর কোলে চড়ে কনখল, ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও এলাকেশী ছাড়েনি, হাঁটতে দেয়নি। এলোকেশীর সতেজ সরল আস্ফালনের কাছে কনখলের সব দ্বিধা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বাড়ী পৌঁছে ছবির মতো নিকোনো দাওয়ায় বসিয়ে দেয় ওদের। একখানি ঘব, আব একটি হেঁসেল। ওদেশে রাংচিতে কি জিকে গাছের চল নেই। পাতাবাহারী কচু, আর মান, আর ওল, আর দু'চারটে বকফুলের গাছ দিয়ে বাড়ীর চৌহদ্দি ঘেরা। ভারী শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ ভাব বাড়ীটা জুড়ে। দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিয়ে এলোকেশী দুধের খবরদারীতে যায়। কনখলের গা এইবারে সত্যিই এলিয়ে আসে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে কনুইয়ে মাথা রেখে। রহমৎ অনির্দেশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করে যায়, বাক্য ফোটে না। চোখের কোণা দিয়ে জল গড়ায়, বোধ হয় প্রার্থনার অনুচ্চারিত মন্ত্রের তাপে বুকের কৃতজ্ঞতার জমাট বরফ দ্রব হয়ে বেরিয়ে আসে চোখ দিয়ে।

দু জামবাটি উষ্ণ এক্‌বল্‌কা দুধ ভিজে গামছায় পেতে দুহাত প্রসারিত করে এলোকেশী। এসে দৃশ্য দেখে। ওরও মনের মধ্যে মোচড় দেয়। শক্ত মেয়ে এলোকেশী। সামলে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে— এই বুড়ো চাচা, চ্যাংড়ার মতো কাঁদছ কেন? খোকা যে খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিজে কাদা কাপড়-চোপড় পরে, হুঁস্‌পবন নেই তোমার? দেখো ত বাছার গায়ে চাকা চাকা চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে? ডাক্‌তে হয় না আমাকে? কি রকম বে-আক্কেলে লোক গো তুমি? এই রইল দুধের বাটি, খোকাকে ওঠাও আমি পাতবার কিছু আনি। কনখল ধড়মড় করে জেগে উঠে বসে চোখ কচলায়। ততক্ষণে এলোকেশী ঝাঁঠে দিয়ে কাচা ফরসা থান এনে ভাঁজ করে পেতে দেয় চাটাইয়ে। বলে, না, ওঠ্‌। বসিয়ে দেয়। —দুধটা খেয়ে নে। একচুমুকে ঈষত্তপ্ত দুধ শেষ করে কনখল। বলে, বাড়ী যাব না?

—কি করে যাবি? ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে যে। বুড়োচাচা,

তুমি শিকার আর বন্দুক নিয়ে চলে যাও। ঐ যে কি বললে মেমসাহেব, তাঁকে নিয়ে এসো। আধঘণ্টার পথও নয়। না না —উত্তরে না—পশ্চিম দিকের ঐ পুকুর—ওর পারেই গাঁয়ের ইস্কুল। ওরই পেছনেই তোমাদের গাঁ। তোমরা ত ঘুর পথে এসেছিলে, তাই দেরী হয়েছিল। যাও, বেলা এখন এক পহরও হয়নি। খোকা ঘুমোক।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কনখল বলে—তাই যাও রহমৎ, আমি ঘুমোই। এলোকেশীর কোলশিয়রি হয়ে কনখল গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

এলোকেশীর ঘড়ি নেই, তবে সত্যি বেলা তখন সাতটার বেশী হয়নি। কনখলের এলোমেলো চুলে হাত বুলোয়, আর আপন মনে বলে—শতেকখোয়ারী মা! মেমসাহেব! যমদুয়ারে ছেলে পাঠিয়ে ফিরিঙ্গিপনা হচ্ছে! এসো না একবার—দেখব কতো বড়ো মেম তুমি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মা-বাবার দল পৌঁছে যান। কনখল তখনো ঘুমে, নিভা ত্রসে বুকে সাপ্‌টে হুম্‌ড়ী খেয়ে পড়েন ছেলের ওপর। এলোকেশী উরু সরিয়ে নেয়, মাথায় কাপড় দেয় না, তবে সাড়ীর আঁচল সামাল করে গায়ে বুকে জড়ায়। উঠে দাওয়া থেকে এক কোণায় দাঁড়ায়।

বড় বাড়ীর শিবুবাবু বলেন—কেরে—মাধব জেলের বিধ্‌বা এলোকেশী না? তাই বলি, এত সাহসই বা কার হবে, আর গায়ে এত জোরই বা কোন মেয়ের। রহমতের কাছে শুনে একবার যে মনে হয়নি তা নয়, তবে চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন হোলো। শুনেছি রে, সবই শুনেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ভগবান ত তোর ভালোই করবেন, আমরাও যা পারি করব।

ফিক্ করে আঁচলের আড়ালে হেসে ফেলে এলোকেশী। সঙ্গে সঙ্গে সিংহীর মতো হিংস্র হয় চোখের চাউনী। বড় বাড়ীর বড়বাবুর যা পারি তা করবার কথা এ তল্লাটে আটদশখানা গাঁয়ের

বিধবারা জানে। জেলে, চূণে, এমনকি ভদ্দর ঘরের কচি রাঁড়ি-দেরও অজানা নয়। দু' দু'বার দূতী পাঠিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজে এসে, সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছেন তিনি। আজকের এই অন্তরঙ্গতা আবার কি অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে ভেবে শঙ্কিতা হয়, কিন্তু দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে হেঁসেলে ঢুকে মনে মনে বলে—কোরো ঠাকুর। কেশী জেলেনিকে সবটুকু চেনোনি। নীচু ছাদের সাথে টাঙানো শিকেয় দু'দুটো মাটির পাতিলের ওপর একটা ছ'ফলা ট্যাটার আধ হাত হাতল সমেত ফলাটা দেখা যায়। দেখেই আশ্বাসে বুক ভরে ওঠে।

হঠাৎ ঝাঁপ খুলে নিভাননী এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কিচ্ছু বলতে পারেন না, খালি ফুলে ফুলে ওঠেন কান্নার ধমকে। এলোকেশী ভাবে এ কেমন মেমসাহেব? সেমিজ সায়া জুতো মোজা নেই, কপাল জোড়া সিঁদুর আর আদুল গায়ে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, দুচরণে আলতা, হাতে নোয়া, শাঁখা, আটগাছা করে চুড়ি---এ কেমন মেমসাহেব? বলে, অধৈর্য হবেন না, খোকা ত ভালোই আছে। সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধ খাইয়ে দিয়েছি। ওকেও, বুড়োচাচাকেও। তার পর খিল খিল করে হেসে ফেলে। বলে, জেলেনীর হাতে দুধ খেয়ে তোমার ছেলের জাত গেছে—

নিভাননী ওকে বুকে পিষে ফেলেন। কপালে গালে চুমো খেয়ে বলেন, জন্ম জন্ম জাত যাক মা, ওর মায়ের পেটের বড়ো বোন ওকে নিজ হাতে দুধ খেতে দিলে যদি ওর জাত যায়ই, যাকগে সে জাত। তোর নাম ত এলোকেশী?

এলোকেশী বলে—কেশী বলে সবাই ডাকে মা।

বাড়ীর দাওয়ায় একটা সোরগোল ওঠে। দুজনে বেরিয়ে দেখেন, কোমর পর্যন্ত কাদা লেপা এক সাঁই জোয়ান, বয়েস সাতাশ আটাশ হবে, দাঁড়িয়েছে এসে। এক হাতে গামছায় বাঁধা গুটি পাঁচেক হাঁস, আর এক হাতে হাত চল্লিশেক লম্বা বিপর্যয় এক তল্লা

বাঁশের লগী। ঠোঁটের কোণে অপরাধীসুলভ বিনীত হাসি। বলে, খোকাকে কেশী যখন টেনে তুলল, তখন বলছিল, ডিঙি না হলে জ্যান্ত পাখী কটা আনা যাবে না। আমি দুই বাঁকে নাও বেঁধে ছিলাম। কেশী ত খোকাকে চ্যাংদোলা করে কোলে তুলে বাড়ীর দিকে রওনা দিল, আমিও ডিঙি খুললাম চোরাবালির ফটিকজলে। কি শয়তান ওই হাঁসগুলা কর্তা, ধরি, ধরি, হুস্— পাঁচহাত দূরে। সবকটা ত পাকড় করলাম, ওই বড়ো দোমেলাটা জ্বালিয়ে খেয়েছে। লাগালের মধ্যে আছে মনে করে যেই ঝুঁকেছি, ডিঙি কাৎ হয়ে পড়ে গেলাম গাঙে। গাঙ ত ভারী—দেখিনা হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে গিয়েছি। ভাগ্যিস লগিটা হাতেই ছিল—ভর দিয়ে, পারে এসে উঠলাম। এই বাঁশের দাগ দেখেন কর্তা, ত্রিশ বত্রিশ হাত চোরা—তার পর শক্ত মাটি। উঃ এই হিমের বিয়ানেও ঘেমে নেয়ে উঠেছি কর্তা।

—শুধু ঘাম কেন, কালঘাম ছোটা উচিত ছিল তোর। গোঁয়ার গোবিন্দ বোম্বেটে ডাকাত কোথাকার। বলে এলোকেশী ছোটে হেঁসেলে। পাটকাঠির আগুনে তপ্ত করে খানিকটা দুধ। বাটি ভরে এনে দুম করে উঠোনে বসিয়ে দেয়। বলে, বসে খা। তারপর ঘুমোগে যা হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া, গাধা।

নিভাননী যেন আভাসে বোঝেন। কেশীকে ধরে হেঁসেলে আনতে এবার কেশীর ফুলে ফুলে কাঁদার পালা। কিন্তু একটি কথাও বার করতে পারেন না নিভাননী তার মুখ থেকে। নির্বাক সান্ত্বনা দিয়ে যান তিনি।

কনখল বীরপূজারী। যেখানে এলোকেশীর আঁচল না থাকলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল, সেইখানে এই মানুষ একটা লগি নিয়ে ঠেস দিয়ে উঠে আসতে পেরেছে। উঠে এসে লগিটা দু'হাতে তুলতে যায় কনখল। দু আঙুল উঠে আবার পড়ে যায় বাঁশটা উঠোনে। লোকটা হেসে বলে—ভয়ানক ভারী খোকাবাবু, তোমার কর্ম না।

—যখন ভর দিলে হাতে খুব লাগছিল তোমার ?

—কাঁধ কব্জি বিষ হয়ে আছে বেদনায়। পার থেকে আর দুহাত দূরে থাকলে বাঁচার আশাই ছিল না।

শিবুবাবু হৃষীকেশকে বলেন এর নাম মনোহর হলদার। এরও সাতকুলে কেউ নেই, বাড়িও নাই ঘরও নাই। নৌকা একখানা আছে, শোয়া বসা রুজি-রোজগার সব তাতেই। কিন্তু ভারী সৎ আর—হেসে ফেলেন বড়বাবু—ভারী বোকা। দেখলে কেশী জেলেনী যা তা বলে গেল—আর ও কেমন ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে তাকিয়ে থাকল ?

হৃষীকেশ বলেন,—আমি ও দু'জনের কথাবার্তায় একটা রহস্যের —না না, রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেয়েছি দাদা। তবে দেখুন, বেলা বাড়ছে এবার বাড়ি ফেরা যাক। এ হাঁসকটা এরাই রাখুক। কনা মাকে ডাক ত।

এলোকেশীর কপোল চুম্বন করে নিভাননী ঘোমটা টেনে বেরোন। কনখলকে বুকে নিয়ে চুমো খায় এলোকেশী। দুচোখে জল। রহমৎ অনেক নীচু হয়ে আদাব দেয়।

দলটা একটু এগিয়ে গেলে, ফিরে এসে নিভা কেশীকে বলেন,—মনোহরকে খাইয়েদাইয়ে নৌকোয় ঘুমোতে পাঠিয়ে আসিস আমাদের বাড়িতে বিকেলে। গল্প করব। এলোকেশী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, কিন্তু কান আর গাল বেগুনী হয়ে ওঠে।

১৯

—ন’ বছর বয়সে বিধবা হয়েছি মা। আমার বাবার নাম ছিল সাধু, তার সাথে মনহরার বাবার বড়ো কাজিয়া ছিল, যেদিন মনার বাবা আমাকে বৌ করে নেবে বলে প্রস্তাব নিয়ে এলো, আমার বাবা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মনাও মনের দুঃখে দেশছাড়া হোলো। গোয়ালন্দে গিয়ে সাদেকের ইলিশের নৌকোয় তাঁবেদার হোলো। ওর বাবা মরলো দেশে। ও খবরও পেলো না। কুঁড়ে একটা ছিলো, পাঁচ জ্ঞাতিতে ভাগাভাগি করে নিল। মনোহর দেশে ফিরে বাড়ি পেলো না। সেও আমার বিয়ের পর, বিধবা হওয়ারও চার বছর পরে। আমি তখন তের, মনা আঠারো। আমার বাবা তখনো বেঁচে। বাবা হুঁকোয় টান দিয়ে কাশতে কাশতে বলতেন,—দেখালি কেশী, ওই বাউণ্ডুলেটার হাতে তোকে তুলে দিলে তোর কি দশা হোত! বাড়ি নেই, ঘর নেই, সাদেকের চাকরী নেই, থাকার মধ্যে একটা জেলেডিঙি। হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে!

—আমি মা, কথার পিঠে কথা বলতাম না। বাবা শুধু জেলেই ছিল না, ডাকসাইটে ডাকাতও ছিল। জোয় পালে পার্বনে গেরস্ত নৌকো লুট করে গওনা টাকা আনত, আর মাটিতে পুঁতে ফেলত। কিন্তু সেই বাবাও মরল আমার ষোল বছর বয়সে। মনোহরের খোঁজ আমিই করেছিলাম, কিন্তু পাত্তা পেলাম না। লোক মুখে শুনলাম আশুগঞ্জ না ভৈরব, কোন বন্দরে চলে গেছে। সে নাকি মেঘনা নদীর ওপর, সমুদ্র সেখানে কাছে, জল সেখানে গহীন।

—মাগো, তারপর কী দুঃস্বপ্নে দিন কেটেছে আমার। চরের মধ্যে গুল্লী আছে জানো ত, ঐ বড়বাবুদের চরের জমিতেও আছে।

ঝাঁপা জল টান দিলে বরই কাঁটা ফেলে চরের গর্ত ঢেকে দিলে অনেক মাছ আটকে যায়। সারা শীত কাঁটা তুলে ঐ মাছ ধরে বিক্রি করে জমিদারেরা। সর্দার থাকে প্রত্যেক জমিদারের। হাফিজ মিঞা বড়বাড়ির সর্দার। একদিন রাত নিশুতিতে এসে কুপ্রস্তাব করে আমার কাছে বড়বাবুর জবানীতে। আমি ঘুম তরাসে লোক, অনেক রাত নদীর ধারে বসে থকি। হাফিজ বাবার থেকে ছোট, চাচা বলি আমি। কিন্তু সেদিন মা আমি তাকে এমন বাঁ পায়ের লাথি মেরেছিলাম, শীতের পর্বতপ্রমাণ নদীর পার থেকে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। আমি বাড়ি ফিরে এসে বাবার বোয়ালমারা কোঁচটা—ঐ যে ছ'ফলা বর্শা, ডাণ্ডা কেটে ছোট করে ছুরির সাইজ বানিয়ে নিলাম। নিরুপদ্রবে কাটল দিনকতক।

—কিন্তু মা, বাবার জমানো অধর্মের টাকার সন্ধান জানলেও এক পয়সা ভাঙিনি, রোজ ছোট ডিঙিটা নিয়ে মাছ ধরে আইরচার ষ্টীমার বাজারে বেচে আসতাম। দুটাকা, আড়াই টাকা হোতো। একার খরচ বাদে টাকা দেড়েক জমত। নির্ভাবনায় ছিলাম। ট্যাঁটা কোমর ছাড়া করিনি, সেদিন আশ্বিনের ঝড়ে তোমাদের গাঁয়ের ঘাটে নৌকো ভিড়োতে হোলো। ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলেন বড়বাবু। জোলার মধ্যে তাঁর নৌকো, তাতে বিধু চুণেবৌ। সবাই জানে ওর সাথে ওর সম্পর্ক। আত্তি দেখিয়ে বললেন—নৌকো ওইখেনে ভিড়ো কেশী, ভারী পাক, ডুববি। পাক সত্যিই ছিল। আমি গিয়ে কথামত নৌকো ভিড়োলাম।

—এদিকে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি আইরচার কেনা মুড়িকদমা খাই, হঠাৎ পিছন থেকে লোহার মতো শক্ত হাতে কে যেন আমার বুক বেড়ে টান দিয়ে কোলে নিয়ে ফেলল। খানিকটা গরম নিঃশ্বাস, খানিকটা ঝাপটাঝাপটি, তার পরই—উঃ মেরে ফলেছে রে—আর্তনাদ। ট্যাঁটা মেরে দিয়েছি পিঠে। খালি গায়ে থাকেন না উনি সেই থেকে। ছ'ছটা ফোঁড়ের দাগ পিঠে কায়েম হয়ে গিয়েছে। আমার হাত পায়ের জোরের ত পরিচয় পেয়েছ।

তার পরেই এক লাথিতে ঠেলে দিলাম জোলার জলে। শব্দ হোলো ঝপাং। ঝড় তখন নেই। সোজা বাড়ির পথে ডিঙি চালালাম।

—তারপর শুরু হোলো উপদ্রব। কথা নেই, বার্তা নেই, আজ কোনো মেয়েলোক, কাল একজন চৌকীদার,—বড়বাবু পিসিডেণ্ট কিনা—অনবরত ঘুর ঘুর করে। মনোহরের কোনো পাত্তা নেই, ভাবলাম, আজ আইরচা যাওয়ার পথে মাঝ গাঙে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেব। কিন্তু প্রাণের মায়া, পারলাম না। সূর্যি পাটে বসার আগে ফিরে মাছভাত খেয়ে গাঙপারে গিয়ে বসলাম। আমরা জেলের মেয়ে, বিধবা হলেও মাছ খাই। রাইত তখন অনেক, ঘরে ফিরে বারিন্দায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা চেনা গলার আওয়াজ—কেশীলো, ওঠ্ ওঠ্, ওই পিঠালী গাছের তলা দিয়ে নেমে ইছামতীর মধ্যে আমার ডিঙিতে যা, দেরী করিস না, ধ্বস্ নামবে। তাকিয়ে দেখি, মনোহর। হাতে ওই পেল্লায় বাঁশের লগি, কাঁধ বুক ফুলে ফুলে উঠ্ছে ঝড়ের ঢেউয়ের মতো। আমার ঘরের পিছনে তিনজন জোয়ান মাটিতে পড়ে, আর দু'জন আস্ছে পার বেয়ে। মনোহর এক ধাক্কায় আমাকে পিঠালি গাছের দিকে ঠেলে দিয়ে, লগি উঁচিয়ে ওই দুটো লোকের দিকে দৌড়য়। আর তখুনি, গাঙের পর্বতপ্রমাণ পার ধ্বসে—তিন মূর্দা, জিন্দা গাঙ পাড়ে তলিয়ে যায়। মনোহরের পায়ের দু ইঞ্চি দূরে বেবাক ফাঁক—জমিন নেই। আমার ঘরটা বেঁচে যায়। ঝট্কা দিয়ে মনাকে টেনে নেই পিছনে—বলি, উজ্বুক, বাঁদর, পাঁঠা—কে তোকে অত ধারে যেতে বলেছে ? গাধার মত দাঁত বের করে লোকটা, বলে, তা ঠিক্, তা ঠিক্, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি।

—এত বড় কাণ্ডকারখানার পর ঘুম আসে না। দুইজনে উঠোনে বসে খবর বার্তা নেই। মনোহর নাকি আজ চারদিন ভৈরব থেকে ফিরে ডিঙি নোঙর করেছে ইছামতীর খাঁড়িতে। রোজ নাকি আমার ওপর নজর রাখে—সমস্ত রাত জেগে পাহারা দেয়। একটা দৈত্যের মতো হয়েছে শরীরটা। কি খায়, কি পরে, কিছু বলে না। শুধু

হাসে, চলে যায়। আমি বলি,—সাদেক মিঞার কামে আবার গোয়ালন্দ যা না কেন? বলে—উঁহু, এসে যা শুনলাম, আমি এই দিক্‌দেশ থেকে নড়ছি না।

—নির্ভরসার থেকে ভরসার মুখ দেখি। কচি ছুঁড়ির মতো লজ্জা লজ্জা করতে থাকে। ঝড়, ঝাপট, অত্যাচার, সব মুছে যায় মন থেকে, কিন্তু বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করে ভয়ে। পাঁচ পাঁচটা লোক ধ্বসে তলিয়ে গেল, সোরগোল উঠবেই। তবে গাঙের ভাঙনে অমন কত প্রাণ যায়, সুলুক সন্ধান শুরু হয়, আবার ভুলেও যায় সবাই। গাঙ্‌ আমাদের মা দুর্গা, একহাতে অসুর মারে, আর কত হাতে পালন করে।

এলোকেশী দম ফেলে কাহিনী বন্ধ করে। নিভাননী নির্বাক স্নেহে ওর চুলের রাশে হাত বোলান। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, উপায় একটা হবেই। সাধুর অধর্মের টাকা তুলে ফেল। গাঁ ছাড়তে হবে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর আমরা ফিরব। ঐ গোয়লন্দেই তোদের স্থিতি করে দিয়ে যাব। সাদেকের কারবার এখনো চালু আছে?

—যদি বাবার টাকাকড়ি তুলি তবে মাঝারী কিসিমের ব্যবসা আমরাই চালাতে পারব। সাদেকের নোক্‌রী করার দরকার হবে না।

—তবে তাই হবে। তুই মনহরাকে পয়সা কড়ি দিয়ে ডিঙি, জাল কিনতে পাঠিয়ে দে কালকেই। আর দিন দশেকের বেশী ত নেই। আবার তার আগে তোর বিয়ের জোগাড় যন্তর করতে হবে। এখন বাড়ী যা, ভর সন্ধ্যে হয়ে এলো। বিপদ আপদ নেই ত?

—বিপদ আপদ পদে পদে, তবে এই যে,—বলে এলোকেশী ছ'ফলা কোঁচটা দেখায়। নিভাননীর পায়ে প্রণাম করে স্কুল বরাবর বাড়ীর পথ ধরে। যতক্ষণ না ভট্টাচাজদের পোড়ো-বাড়ীর মণ্ডপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, নিভাননী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তার পর উঠে গৃহকর্মে মন দেন।

হৃষীকেশ যথারীতি পাড়া বেড়াচ্ছেন, কনখল রায়বাড়ীতে ঝুমুর গান শুনতে গেছে। ঝির ঝির করে বিষ্টি এলো। এক লহরা শেয়ালের ডাক শুরু হয়ে থেমে গেল। আশ্রান্ত ব্যাঙের সারিগান শুরু হয়েছে। বাড়ীর পেছনে ডোবার দিক থেকে দু একবার কোন নাম না জানা রাতচরা পাখীর হৃদয়ভেদী টিট্টীকার শোনা যায়। শরতের বর্ষণভারাক্রান্ত রাত তার বিপুল দেহভার নিয়ে সমস্ত দিনের হর্ষোজ্জ্বল জীবনচাঞ্চল্যভরা ছোট্ট জনপদটির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসতে আরম্ভ করে। নিভাননী উত্তর দুয়োরীর দাওয়ায়, শিলেট থেকে আনা ডিট্জ লণ্ঠনের পল্‌তে উস্‌কে, হালে আসা "প্রবাসী"র পাতা ওলটান। মলাটের উদ্ধৃতি প্রতি মাসে পড়েন, পুরোনো লাগে না।

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
পরো লৌহ বিনির্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ॥"

রবিবাবুর দু চারটে গান, প্রভাত মুখুজ্যের নবীন সন্ন্যাসী, চারু বাঁড়ুজ্যের ছোট গল্প, ঘণ্টাখানেক মনোহরণ করে রাখে নিভাননীর। সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গে রস পান না, তাই উলটে যান। কিন্তু তাতে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, তার প্রত্যেকটিই ওঁর মতের অনুকূল। তবে নিজের মনের কথা আর একজন গুছিয়ে বলছে শোনবার ধৈর্য থাকে না। এসব ত নিজেই ভেবেছেন, নিজেই বলতে পারেন।

শিবু চৌধুরী হাঁসের রোষ্ট খাবেন, তবে মুসলমানের ছোঁওয়া খাবেন না। রেঁধেছে রহমৎ, সদরে কাছারী ঘরের পেছনে পাট-শোলার আগুনে। তাকে সাত্ত্বিক করতে হবে। জনকয়েকের মতো রান্না পাখী নিয়ে আসেন নিভাননী, পেতলের ডেক্‌চিতে

ঢেঁকিঘরের বাইরে উঠোনে খোঁড়া উনুনে হু'হাতা গাওয়া ঘি ঢেলে নবা আঁচে বসিয়ে রাখেন। সুঘ্রাণে বাড়ী ভরে যায়। সাদা ভাত মেজবৌ এখনো বসান নি, ছোট্‌ঠাকুরপো'রা এলে গনগনে বাঁশের জ্বালে বসিয়ে দেবেন, দশ পনের মিনিটে হয়ে যাবে। ঐ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঝুল-কালিপড়া অন্ধকার হারিকেন নিয়ে লাঠি কাঁধে নিধি চৌকীদার আসছে। পেছনে চৌধুরী, হৃষীকেশ, কনখল আর রায়বাড়ীর বিশু—ও কনখলের সমবয়সী। নিভাননী কপটতাকে উপেক্ষা করতে শিখেছেন—রহমতের রশুই নিজের বলে গেঁয়ো গোঁড়াকে খাওয়াবেন তাতে একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন না। হুদিনেই মালুম করে নিয়েছেন, এ সব গাঁ দেশে সব চলে, খালি মুখপাত দোরস্ত রাখতে হয়।

হৈ হৈ করে দল এসে পড়ে। কাছারী বাড়ীতে ফরাসে বসেন কর্তারা, ছেলে হুটো ভিতর বাড়ীতে যায়। নিভাননী শোলার উনুনে বাঁশের চোঙে ফুঁ দিচ্ছেন, চিক্‌মিক করে আঁচ উঠ্‌ছে আর পড়ছে। বলেন, গা হাত পা ধুয়ে আয়। ওটা কেবে? জয়ার ছেলে বিশু না? আয় বাবা আয়। বিন্দি ঝিটা গেল কোথা? যা যা, বাইরে সদরে বালতি ঘটি গামছা তোয়ালে দিয়ে আয়। ছোট কর্তার চটি নিয়ে যাস্।

মেজ বৌ ডেকে বলেন,—ভাত চড়ালাম রে ছোট বৌ—দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, তুই মাংসের ডেগ্ নামিয়ে ওদের জায়গাগুলো করে রাখ। নিভা বলেন সেকি আর করে রাখিনি, বিশু আসবে জানতাম না, আর একটা পিঁড়ি দিচ্ছি। বড়দির তহবিল থেকে কিছু তেঁতুল-কাশন বের করে রেখো মেজদি। তোমার ছোট্‌ঠাকুরের লালচের অন্ত নেই। কতো যে খেতে পারে মানুষ। মেজবৌ বলেন, জিভ সামাল দে নিভা, কি খাওয়া ওর দেখলি তুই। প্রাণভরে দশদিন সবরকম ভালোমন্দ করে খাওয়াতেই পারলাম না। চাক্‌রী আর বিদেশ, কি যে খায়, কি যে করে, বুঝিও না, জানিও না।

নিভাননী আলগোছে মুচকি হেসে কাজে মন দেন।

আহার পর্ব শুরু হয়। পরিবেশন মুখ্যত করেন মেজবৌ। কেবল মাংসের হাঁড়ি নিয়ে নিভা বসে থাকেন। বাগচি ও চৌধুরীর পাতে দুটি করে আস্ত পাখী ছেলেদের দুজনাকে একটা করে দিয়ে নিভাননী কনখলকে বলেন,—কেটে দেব? কনখল বলে, খুব নরম হয়ে গেছে মা, হাত দিয়ে পারব।

শিবু চৌধুরী দুটি পুরন্ত হাঁস সাবাড় করে বলেন,—অমৃত। বলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে ঢাক্‌নী চাপা ডেক্‌চির দিকে তাকান। আরো দুটো পাখী তুলে দেন তাঁর পাতে নিভাননী। তিনি হাঁ হাঁ করে করে ওঠেন, আরে করো কি বৌমা। একটা, একটা, অতো কি মানুষ খেতে পারে! কিন্তু যথারীতি ও দুটিরও হাড় কখানি পড়ে থাকে। তৃপ্তির উদ্গার তোলেন শিবু চৌধুরী। হবিষ্যিঘরের কাউনেবীজের পায়েস দিয়ে ভুরিভোজন সমাধা হয়।

মুখ ধুয়ে পানের বিরদানী হাতে সদরে যেতে যেতে চৌধুরী বলেন,—ধন্য রান্নার হাত তোমার বৌমা। নবমীর দিন ভেড়া বলি আছে। খানিকটা সরিয়ে রাখব—এমনি মোগলাই করে আলাদা রেঁধো। এসব দেবভোগ্য খাদ্য, আমরা কল্পনায়ও আনতে পারিনে। কি বলো হে হৃষীকেশ?

হৃষীকেশ বলেন না কিছুই, কিন্তু ঘোঁৎ ঘাঁৎ শব্দ করে সম্মতিই জানান মনে হয়। শিবু চৌধুরী বিশুর হাত ধরে বাড়ীমুখো রওনা হন। কনখল পশ্চিমদুয়ারী ঘরে শুতে যায়। হৃষীকেশ বর্মাচুরুট ধরিয়ে পায়চারি করেন। নিভাননী তোলা জলে স্নান করে ছাপাছন্দ হয়ে মেজবৌয়ের সাথে রান্নাঘরে খেতে যান।

সুষুপ্তির পরিবেশ নামে গেরস্তালি ঘিরে।

সত্যিই কি সুপ্তি? রাত্রির একটা মুখর জীবন আছে। রাত কথা কয়। কিছুটা হাওয়ার হুহুশ্বাসে, কিছুটা রাত্রেয়দের কণ্ঠনিঃসৃত প্রকাশে, কিছুটা রাত্রিশেষে প্রথম অরুণোদয়ের ইঙ্গিতে। কনখল বিছানা ছেড়ে খোলা উঠোনে এসে বসে পড়ে, সেই একরাতে

আয়েষার আকর্ষণে যেমন ডুবে মরতে গিয়েছিল। কিন্তু আকর্ষণ যেন বিশ্বপ্রকৃতির। চোরাবালি থেকে প্রাণ নিয়ে গ্রামীন পরিবেশের অনেক কিছু জানা, মা-বাবা থেকে ধীরে ধীরে দূরে দূরে সরে যাওয়া, ওর ব্যক্তিত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করে। এগারো বারো বছরের কনখল আজ মনোহরের মতো সাঁই জোয়ান হয়ে যেতে চায়। চায় আকাশ পাতাল পৃথিবীকে কাগজি লেবুর মতো টিপে রস করে খেয়ে ফেলতে। বুকের দুরাশা। সমস্ত সত্তায়, আশ্চর্য একটি মুখ, এক জোড়া চোখ, সম্মোহন আনে ওর মনে। দাফিয়ে ওঠে তারই কাছে ফিরে যেতে। ঠোঁট ফেটে বাক্য ফোটে না, কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রশান্ত প্রশাস্ত ওকে স্বপ্নে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ও যাবে, যাবে, ফিরে যাবে,—সেই শাহ্‌জলালের দরগায়, সেই দেবমূর্তি ইমাম সাহেবের কোলে, সেই অগণন কবুতর কবলিত মিনারের তলায়, সেখানে শান্তি, সেখানে তৃপ্তি, সেখানে আনন্দ। জীবনদেবতা বোধ করি একটি মানুষের মধ্যে রূপায়িত হয়ে দেখা দেন, তা না হলে রক্তমাংসের মানুষ তাঁর নাগাল পাবে কেন।

কনখলের স্বপ্নস্তিমিত চোখে, মনে, বুকে হাজি সাহেবের বলা একটি গল্প রূপ নেয়। ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে কোনো এক রাজকুমারীর কোলে এক ছেলে এসেছিল। রাজকুমারী তাকে ভাসিয়ে দেন ভেলায়। সেই ছেলে আর এক দ্বীপে এসে পৌঁছল। সে দ্বীপে মানুষ নেই। এক হরিণী তাকে ডাঙায় তুলে ছেলের মতো মানুষ করলো। সদ্যোজাতের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা আকিঞ্চন হরিণী-মা মেটালো। জীব, জন্তু, গাছ, পালা এই সব সে দ্বীপের বাসিন্দা। ব্যতিক্রম রাজকুমারীর নন্দন। শিখলো পশুদের আত্মরক্ষার সহজাত সহবৎ। হিংস্রদের হাত থেকে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, কি করে আহার সংগ্রহ করতে হয়, কি করে উল্লাস উল্লম্ফনে জীবন যাপন করতে হয়। হরিণী-মা সবসময়ে সাহচার্য দেন। যেন হাতে কলমে জীবন যাপন শেখান। বিশাল সূর্যকে ঘিরে বিশালতর আকাশ, কুমারের চন্দ্রাতপ। সমস্ত দ্বীপ তার শয্যা ও ক্রীড়াঙ্গন।

অগাধ সমুদ্র তার কেলিভূমি। কিন্তু হরিণী-মা মরে গেল একদিন। মরণ কি কুমার জানতো না। শুধু অভিভাবকত্ব ঘুচে গেল, এই বোধ জাগলো মনে। সাথে সাথে সাবালক মনে হোলো নিজেকে।

মানুষের বাচ্চার সাথে জীবজন্তুর প্রভাব ধীরে ধীরে স্ফুট হয়। গাছের শেকড় পাতা দিয়ে কটিবাস তৈরী করে কুমার। বড়ো গাছের বাকল গায়ে জড়িয়ে শীতাতপ নিবারণ করে। কিন্তু না, এ ত যথেষ্ট নয়। তার হরিণী-মায়ের মতো অনেক পশুপক্ষী মরে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। তাদের বৃহত্তর জানোয়ার এসে খেয়ে ফেলে কেবল মাত্র ঈগল পাখীর দেহের দিকে কেউ যায় না। অনেক পালক অনেক রোম। কুমার তাই খুলে নিয়ে নিজের দেহ-বাস বানাতে লাগলো। আপাদমস্তক ঈগলের পালক আর রোমে নিজেকে ভূষিত করলো কুমার।

কী ভয়াবহ চেহারা হোলো তার। অন্য বন্য জীবজন্তু ভয় পেতে লাগলো। শীতে শরীর উত্তপ্ত থাক্‌লো, নগ্নতা নিবারণ হোলো।

আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর কুমার ভাবতে লাগলো, কেন হরিণী-মা মরে গেলো। কাল যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বনবাদাড় উদাল করে ঘুরেছে, আজ কেন সে স্থির হয়ে পড়ে আছে। ছুরীর মতো বাঁশের চাঁচ, তীক্ষ্ণফলা পাথরের টুক্‌রো, এইসব দিয়ে সে পালিকা মাকে কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলো। শরীরের সব যন্ত্রের শেষে এসে পৌঁছলো বুকের বাঁ দিকে ধুক্‌ধুকি একটুক্‌রো রক্ত-পিণ্ডের ওপর। সেটাও স্পন্দ শেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। এইবার হরিণী-মা একেবারে নিথর হয়ে গেলো। কুমার অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর হরিণীকে নিয়ে কবর দিয়ে এলো।

আদিম প্রকৃতির নিঃসঙ্গ রাজত্বে, সেই বন্যপশুপক্ষী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ বনভূমে, আত্মরক্ষা, আত্মসংরক্ষণ, জীবনধারণ এইসব সহজাত সংস্কারের সাথে কুমারের মানসে প্রকৃতির দুলালদের বশ করবার অভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠতে লাগলো দিনের পর দিন।

ক্ষুধাতাড়ন ভোজনোপযোগী মৎস্য-মাংস আহরণ, পরিধেয় বস্ত্রসংগ্রহ বাবুই পাখীর কুলায় নির্মাণ কৌশলদৃষ্টে স্বগৃহ নির্মাণ, বন্য অশ্ব বশ করে আরোহণোপযোগী করে নেওয়া—দিনের পর দিন কুমার এই সমস্ত জৈব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আয়ত্তে আনবার প্রয়াসে সফলকাম হোলো। মিটলো জীবন ধারণের দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার পালা।

পায়ের তলায় পৃথিবী ভোগ্যা হয়ে এলো, কিন্তু রাত্রিনিশীথে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমার মনের মধ্যে অন্তহীন জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। এই আকাশ, এত তারা, চাঁদ, সূর্য—কিন্তু সবায়ের আবির্ভাব নিয়মতন্ত্রী। তাহলে কে এদের চালাচ্ছে? একজন নিশ্চয় সৃষ্টি করেছেন! তিনি স্রষ্টা। তিনি হুকুমাফিক চালাচ্ছেন। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনি অনন্ত। তিনিই অখণ্ড পরিপূর্ণতা। তিনিই সুন্দরতম। তিনিই শক্তি, তিনিই সার্থকতম প্রকাশ। তিনি তিনিই। তাঁর পায়ের নীচে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য পাতাল অবনত। তিনি স্বয়ম্ভূ।

স্বপ্নাচ্ছন্ন কনখল খোলা উঠোনে ঘুমেব কোলে ঢলে পড়ে। সকালে নিভাননী বেরিয়ে খোলা গায়ে ছেলে পড়ে আছে দেখে হায় হায় করে ওঠেন। ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, কোলে তুলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। আর্তনাদ করে ওঠেন,—মেজদি, বলো। দুই জা'য়ে ছেলেকে ঘরে ওঠান। আচ্ছন্নের মতো কনখল ঢলে পড়ে বিছানায়। সেদিন ওর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম ভাঙে না।

২০

পুজো এসে গিয়েছে। আজ সপ্তমী। কেশী-মনোহরের বিয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিভাননী হৃষীকেশ। ওরা দুজনেই আজ এ বাড়ীতে। মনোহরের ডিঙি বাবলা বনের তলায় জোলার মধ্যে বাঁধা। মনোহর বলির পাঁঠা ধোয়াতে গেছে, এলোকেশী ইয়া জগদ্দল পাটায় মশলা পিষ্‌ছে। বাড়ীতে পূজো তবুও হৃষীকেশের পাড়া বেড়ানোর কামাই নেই। বাজনাদারেরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বাজনা বাজিয়ে চলেছে, বাল্যভোগের বাজনা। পূজারী ঠাকুরের রেফের মতো, টিকিতে ফুল বাঁধা, খালি গা, উত্তরীয় জড়ানো, মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে ভুল মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। আশে পাশের পাঁচখানা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে পূজো মণ্ডপের সামনে। কে যে কি করছে, তার তদারক করবার লোকের অভাব। ভেতর বাড়ীতে তিন জা'য়ের ব্যস্ততার অন্ত নেই। পূজারীর হুঙ্কারে বড়বৌ ফাইফরমাস খাটছেন। মেজবৌ ভোগ-রান্নার ঘরে, জোগানদারনী রায়বাড়ীর সর্বজায়া ঠাক্‌রুণ, বিশুর মা। ঢেকিঘর থেকে ঢেঁকি সরিয়ে দুটো উনোন পাতা হয়েছে, তাতেই বিরাটকায় কড়াই চাপানো, মাছ এখনো আসে নি, অন্যসব নিরামিষ উপাদান চড়ে গেছে।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সর্বজয়া ঠাক্‌রুণ যেন ঘুরতি লাটিম। এই ডালে কাঠি দিচ্ছেন, এই কচুর শাকে খোন্তা ঘোরাচ্ছেন। আর থেকে থেকে বলছেন,—মেজবৌ, যাওনা কেন, একটু মিছ্‌রীজল মুখে দিয়ে এসো। সেই ভোর রাতে উঠেছো, ধকল ত সমস্ত দিনমানই আছে, শরীরে সইবে কেন? মেজবৌ বলছেন—তোর শুক্‌নো

মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোন্ প্রাণে জলগ্রহণ করি বল। সর্বজয়া বালবিধবা—নিরম্বু উপবাসিনী। কিন্তু মুখরা। বলেন,—আ মর। আমরা যমের অরুচি। তুমি সধবা, তুমি শুকিয়ে মরবে কেন!

নিভাননী, আরো দু একটি গিন্নীবান্নীর সাথে পেল্লায় বঁটি পেতে আনাজ কোটায় ব্যস্ত। তরিতরকারির পাহাড় জমে উঠ্ছে পরাতের ওপর। কলকল রবে কলকাকলীর অবধি নেই, কিন্তু গিন্নীদের হাত ধারালো বঁটির ওপর চলছে কলের মতো, তাতে একটুও বে-হিসেবী অঙ্গুলী চালনা নেই। এই সময়ে মাছ এসে পড়ল। পরাণ জেলের মাথায় চ্যাঙারী, উঠোনের মাঝখানটায় উপুড় করে ঢেলে দিল। সাত আট সেরী গুটি চারেক রুই, একটা প্রকাণ্ড বোয়াল, আর আধ মণ আন্দাজ টাটকিনি খরসোলা। মেজবৌ ঝামটা দিয়ে ওঠেন—তোর কি হুঁস পবন হবে না কোন দিন পরাণে? মাছ কোটা হয় ঐ জগডুমুরের তলায়, নামালি মাঝবাড়ীতে?

পরাণ একগাল হেসে বলে,—সবাই দেখুক মা, তার পর আমি আর মদ্না ঠিক জায়গায় মাছ নিয়ে পৌঁছে দেব। মদ্না পরাণ-জেলের ছেলে, বছর দশবারো বয়েস হবে। ছাতাপড়া দাঁত বের করে হেসে বলে,—হেঁ কর্তামা, সব ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। মাছ দেখতে ভিড় হয়ে যায় গোল করে। একজন বলে,—বোয়ালটা একটা জ্যান্ত মানুষের সাইজ রে, মণখানেক হবে। আর একজন টিপ্পনী কাটে—রুইগুলো কি টক্টকে লাল রে, এখনো কান নড়ছে। মেজবৌ মাছ দেখে আহ্লাদিতা, নিভাকে ডেকে বলেন—ছোটবৌ, মাছ দেখে যা।

মৎস্য পর্ব শেষে আবার গতানুগতিক কর্মব্যস্ততা বাড়ীটাকে ব্যাপৃত করে রাখে। বিশু আর কনখল এ পাড়া ও পাড়া টহলদারি করে ফিরে আসে। কনখল সোজা এলোকেশীর সামনে গিয়ে সিঁথেয় দগ্দগে সিঁদুর দেখিয়ে বলে, মাকালী সেজেছিস কেন কেশীদি? এলোকেশীর মুখে কটুকাটব্য ফুটতে গিয়ে ধন্দ খেয়ে

যায়—তোকে খাব বলে। সাম্‌লে নিয়ে বলে, আমি কালো, তাই বলছিস ত? কনখল বলে,—না না, অতো সিঁদুর লেপেছিস কেন কপালে? এলোকেশী ফিক করে হেসে বলে,—মাকে জিজ্ঞেস কর। কনখল দাঁড়ায় না। কিন্তু হাত ধরে ভোগরান্নার জায়গায় উঁকি দেয়, সর্বজয়াকে দেখিয়ে বলে—তোর মা'ই যেন দুর্গাপ্রতিমা, মুখে কেমন জ্যোতি দেখেছিস্। সর্বজয়ার মুখে আশীর্বাণীর প্রলেপ পড়ে। বলেন, তোরা দুটিতে কিছু খেয়ে নেত এইবার। মধ্যাহ্ন ভোগের ঢের দেরী। মেজবৌ উঠে আসেন। দু' ছেলের হাত ধরে হবিষ্যি ঘরের সামনে বসিয়ে দেন। খিচুড়ি, ভাজা, একটা ঘণ্ট তরকারী, পেট ভরে খেয়ে নেয় ওরা। খাওয়া শেষ হলেই আবার বেপাত্তা হয়ে যায় একাধিক পূজোবাড়ীর আঙিনায়। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে দিন। পূজোর সমস্ত আঙ্গিক একটার পর একটা সুষ্ঠু ভাবে সংঘটিত হয়ে চলে। বলির সময় লুকিয়ে থাকে কনখল। বন্দুক দিয়ে পাখী মারতে যে নির্মম হাড়িকাঠে ফেলা হাত পা বাঁধা অসহায় ছাগশিশু বধে তারই মনে আর্তনাদ জাগে। বলে এ অন্যায়, এ ভালো না। বলির বাজনা থামলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো চোখ মুছে ওঠে। চোখের কোণের জলের ধারা মোছে। আড়াল থেকে একজন ওর কীর্তি-কলাপ দেখছেন, দেখতে পায় না কনখল। নিভাননী আঁচলে চোখ মুছে নিঃশব্দে সরে যান।

রাত্তিরে বড় বাড়ীতে যাত্রা। পালা সেই চিরন্তন রাধাকৃষ্ণের। নাম বুঝি 'চতুরালী'। আয়ান ঘোষের গাঁক্ গাঁক্ গর্জন, জটিলা কুটিলার অপদস্থ হওয়া, কেষ্টর কালী হয়ে যাওয়া, ফুটো কলসীতে রাধার জলভরা—দেখে দেখে আশ মেটে না কনখলের। কানে হাত দিয়ে একটানা সুরের গানগুলো মোহিত করে ওকে।

'ওদের বাড়ী আর যাব না,
ক্ষীর সর ছানা, নবনী আমি
চুরি করে আর খাব না—'

যশোদার কপট গঞ্জনা বুঝতে পারে কনখল। সুবলটা দেখতে অনেকটা বিশুর মতো। নিজেকে দেখতে পায় না, কিন্তু কেন যেন মনে হয় কেষ্টর সাথে কিছুটা মিল আছে ওর। কেষ্টর অলৌকিক কার্যকলাপ সব যেন করতে পারে, এমনি মনে হয় ওর। যাত্রা ভাঙ্‌লে ম'ার হাত ধরে বাড়ী ফেরে। চেনা জগতে পা পড়ে না, যাত্রার জগৎ দখল করে থাকে মনপ্রাণ। বুকে গুণ্‌গুণ্‌ করে গান ঠেলে ঠেলে ওঠে,—হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে খামখাই। নিভাননীর হাতে ঝাঁকি দিয়ে বলে—খুব ভালো যাত্রা, না, মা? নিভাননী ছেলের পাগলামীতে অভ্যস্ত, বলেন—ভালোই ত।

পূজোর কটা দিন বেশ কাটে। নবমীর দিন শিবু চৌধুরীর বাড়ির বলির ভেড়ার খানিকটা চালান হয়ে আসে বাগচি বাড়িতে। যথারীতি রহমৎ কোর্মা বানিয়ে ডেকচি চালান দেয় নিভাননীর কাছে। উনি আবার দই ঘি দিয়ে আর একবার ফুটিয়ে বসে খাওয়ান সবাইকে। রান্নার তারিফ পড়ে যায়। নবমীর রাত শেষে বিজয়ার ভোরে সানাইয়ে করুণ তান ওঠে। 'নবমীর নিশি তুমি পোহায়ো না, তুমি গেলে উমা আমার চলে যাবে, আর আসিবে না।' বিষাদের সুর। প্রত্যুষে চোখ মেলে কনখলের মন উদাস হয়ে যায়।

মেয়ে বৎসরান্তে বাপের বাড়ি এসেছিল, আজ ফিরবে শ্বশুর ঘরে। আবার একটি বছর অদর্শন। মেয়ের মায়ের বিলাপ ঐ রাগিণীতে বেদনা ঝরায়। এ সব বই পড়ে আর শাস্তর শুনে কনখলের জানা হয়ে গেছে। তাই মেনকার দুঃখে ওরও মন কাঁদে।

কিন্তু না। হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার আছে—ভাসান ও বিসর্জন। নদীতে যাওয়া হবে বিকেলে। নতুন কাপড় পরতে হবে। বিসর্জন অন্তে প্রণাম কোলাকুলির ধুম পড়ে যাবে। এ বাড়ি ও বাড়ি মিষ্টিমুখ, অনেক রাত হবে সারতে সারতে। পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে রাখেন নিভাননী।

প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে যায় আগবেলায়। গোটা তিনেকের সময়

সোরগোল করে নামানো হয় উঠোনে। ছেলেমেয়েরা ডাকের সাজের সাড়ীর আঁচল, শোলার গয়না সংগ্রহ করে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর গা থেকে। কার্তিকের হাতের তীর ধনুক কনখল খুলে নেয়। গণেশের কলা বৌ হুমড়ী খেয়ে পড়ে, হরনাথ ঠাকুর টিকি নেড়ে সামাল সামাল করেন। আটজোয়ানের স্কন্ধবাহিনী হয়ে মা দুর্গা সপরিবারে নৌকাভিমুখীনী হন, বাড়িতে মা জ্যেঠিরা ঘন ঘন শাঁখ বাজান, খই ছেটান, যারা নৌকায় যাবে তারা বীরদর্পে এগোয়, যারা যাবে না তারা খালি মণ্ডপে মাথা ঠোকে।

বড় গাঙে এসে বিরাট জোড়া নৌকোর সন্ধিস্থলে প্রতিমা বসানো হয়। ঢাকি, ঢুলি, করতালবাহকেরা মৌজ করে বসে কান কালা করা বাজনা বাজায়। কর্তারা শশব্যস্ত হয়ে বিপদ-আপদের তদারক করেন। অ্যাসেটিলিন গ্যাসবাতির আট দশটা ডাণ্ডা তৈরী করে রাখা আছে, সূর্যাস্তের পর জ্বলবে। ছেলেমেয়েরা থেকে থেকে ধমক খায় নৌকোর কানাচে ভিড় করবার জন্য, মাঝখানে এসে বসতে হয়। এইবার নৌকো ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘণ্টাখানেক পার থেকে মাঝনদী, এক ফেরতা পরিক্রমা করতেই সন্ধে ঘনিয়ে আসে। ঠিক মাঝ গাঙে নয়, অথচ জল গভীর, এমন জায়গায় নৌকো থামে। তারপর জোড় খুলে দিয়ে দু' নৌকো দু'ধারে হটতে থাকে। ঢাক ঢোল করতাল উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রতিমা বিরাট শব্দ তুলে তলিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে নদীর জল এ ওর গায়ে ছেটায়। গ্যাস বাতি জ্বলে ওঠে। কোনো সৌখীন কর্তার নাও থেকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে বাড়িমুখো। কড়া কড়া নির্দেশ আসে, যে যার বাড়ি গিয়ে আগে মণ্ডপ প্রণাম করবি, তারপর প্রণাম কোলাকুলি।

প্রণাম কোলাকুলি শুরু হতে আশপাশের গাঁ অবধি গতায়াত চলে। মাইলখানেক দূরে উত্তরের গাঁয়ে খুব ডামাডোল, একটি যুবককে কেন্দ্র করে। চক্রবর্তী বাড়ির নরেশ। আঠারো বছর বয়সে আন্দামান হয়েছিল কোন লাটের গাড়িতে বোমা ফেলার

সন্দেহে, বারো বচ্ছর কারাবাসের পর সচ্চরিত্র মেয়াদী বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে করোনেশনের বছর বলে। কনখল আগামী ডিসেম্বরে দিল্লীদরবার হবে জানে, পঞ্চম জর্জ কুইন মেরী আসবেন শুনেছে। বিশুতে ওতে নরেশকে দূর থেকে দেখে আসে। রোগাপটকা বিশ্রী চেহারা, কিন্তু সবাই মিলে তাকে নিয়ে কি যে করছে। কেউ বলছে দাদা, কেউ কাকা, কেউ বা তুই তোকারি করছে, কিন্তু ভাবখানা একই। নরেশ যেন মস্ত বীর, হয়ত একটা রাজ্য জয় বা করে এসেছে। বিশু, কনখল গাঁয়ে ফেরে। কনখল রাত্রে মাকে বলে, আচ্ছা মা, চক্রবর্তী বাড়ির নরেশ কি খুব বীর ?

নিভাননী নরেশের পূর্ব-ইতিহাস হৃষীকেশের কাছে সব শুনেছেন। বলেন, কেন রে, তাকে দেখে এলি বুঝি ? শুনেছিলুম ছাড়া পাবে।

—হ্যাঁ মা, ছাড়া পেয়েছেন ত বটেই, কিন্তু কথাবার্তা শুনে ভালো লাগল না। পরেশদার মতো নয়।

—এরা সব অন্য দলের। পরেশরা অন্য দলের। এরা ধর্মাধর্ম মানে না। পবেশদের সেবাব্রতই মূল লক্ষ্য। ওরা সব স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য কিনা। নরেশরা ভালো লোক নয়, ওদের সাথে যেন ভাব করতে যাস নে।

কনখল বুঝতে চায় কেন একটি লোক বহুজনের আকর্ষণের মধ্যমণি হবে যদি তার ভেতরে লোকত্তর গুণ কিছু না থাকে। মায়ের কথায় সন্তুষ্ট হয় না। শুতে যায়। ঐ বয়সে কনখলের মনে অনেক কথা বলা, অনেক কথা জিজ্ঞেস করা, অনেক ভাবের আদান-প্রদানের সঙ্কল্প জাগে, কিন্তু ভাষায় কুলোয় না। কে ওকে সব ভাষা শেখাবে ? ভাষা না হলে ভাব প্রকাশ করা যায় না, ফুঁসে ফুঁসে ওঠে ওর চিত্তচাঞ্চল্য, কিন্তু বৃথা, সব বৃথা। রাত্রির স্বপ্নে না বলার কথার তুবড়ি ছোটানো যায়, কিন্তু দিনে ? দিনে ওর ঠোঁটে লাগসই কথাগুলো কে জুগিয়ে দেবে ? ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ভেসে ওঠে মানসে ইমাম সাহেবের সৌম্য মূর্তি। তিনি যেন হাত বুলিয়ে ওর মনের চোখ খুলে দিচ্ছেন, ঠোঁটে ভাষা দিচ্ছেন, কি জাদু

আছে তাঁর ধ্যানে, এ সব সমস্যা সমাধানের আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের দিন এসে পড়ে। আজ কনখলেরা শিলেট ফিরবে। রহমৎ বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। কেশীদি মনোহর গোয়ালন্দে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ষ্টীমার ছাড়বে নটায়। ফেণা ভাত খাইয়ে চোখের জলে ভেসে বড়বৌ মেজবৌ দেওর ভাজকে বিদায় দেন। শিবু চৌধুরী বাগচিকে সহোদরের চেয়েও ভালোবাসেন। দু'জনে অশ্রুসজল আপ্যায়নে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চান। কনখল বিশুর মা সর্বজয়াকে প্রণাম করে আসে। বিশু ষ্টেশনে যাবে। কনখল কানে কানে বলে, উঁচু ক্লাসে উঠি, এক সাথে পড়ব একদিন, কি বলিস? বিশু ফুঁপিয়ে সম্মতি জানায়।

ঘাট থেকে ষ্টীমার ছাড়ল। সেই চেনা শব্দ, সেই সোরগোল, সেই পার থেকে রুমাল নাড়া—কনখল রহমতের হাত ধরে দোতলার ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব দেখে। ফিরে যায় যখন, তখন বাগচি আর গাঁইয়া নেই। পুরোদস্তুর সাহেব। মা আবার মেমসাহেব। রহমৎ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

দু' ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পৌঁছে যায় ষ্টীমার। আর একবার নামবার পালা, চাটগাঁর বিরাট জাহাজে ওঠবার পালা। কিন্তু ডাকজাহাজ ছাড়তে প্রায় দু' ঘণ্টা দেরী। ঘাট থেকে দুটি প্রাণী যে হা প্রত্যাশে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রথম নজরে পড়ে নিভাননীর। চেঁচিয়ে উঠেন তিনি, ওগো ওই দেখ, কেশী আর মনোহর। ডাকো না ওদের।

হৃষীকেশ বলেন—তার চেয়ে চলো আমরাই নামি। এখনো কলকাতার গাড়ী আসেনি, ঢের সময় আছে।

রহমৎ খবরদারীতে থাকে, মা, বাবা, কনখল নেমে আসে ঘাটে। এলোকেশী কনখলকে কোলে নিয়ে বলে,—চল্, আমাদের বাড়ী

দেখ্‌বি চল্‌। মনোহর বোকার মতো দাঁত বের করে হাসে। কথা বলতে পারে না।

ষ্টীমার ঘাট থেকে এক রশি দূরে দুটি নৌকো বাঁধা। একটা দুই কামরার ছইঅলা নৌকো, আর একটা ইলিশ মাছের জাল সমেত জেলেডিঙি। বসবাস করবার নৌকার ব্যবস্থা চমৎকার। শোবার ঘর, রান্নাঘর সব সুন্দর। নিভাননী বলেন, খাসা বাড়ী হয়েছে ত কেশী।

—দু'জন দাঁড়ি রাখতে হয়েছে মা। একজন ওকে নিয়ে মাছ ধরতে বেরোয়, আর একজন ঘাটের নৌকোয় পাহারা থাকে।

—টাকা কড়ি কি করলি ?

—বাবা ত ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন। রাজবাড়ীর ডাক ঘরে জমা আছে।

—তোদের ভালো হোক। ছাখ্‌, তোর বাবা হয়তো এইখানেই বদ্‌লী হয়ে আসতে পারেন।

খুশীতে উপ্‌ছে পড়ে এলোকেশার চোখ মুখ। তারপর হঠাৎ মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে,—ওরে বাঁদর, হাড় গিলে—নোস্তা ইলিশের হাঁড়ি ?

মনোহর থত মত খেয়ে বড় নৌকোয় ঢুকে এক বিরাট হাঁড়ি বার করে নিয়ে আসে। এলোকেশী বলে, মা গো, গোটা আষ্টেক বড় ইলিশ নুনজারা করে দিয়ে দিয়েছি। দুদিনের রাস্তা অনায়াসে চলে যাবে। হৃষীকেশ হৃষ্টচিত্তে বলেন, ফাইন। নিভাননী এলোকেশীর কানে কানে বলেন—তোর বাবাটি বড় লোভী রে, হয়ত জাহাজে উঠেই বলবেন ইলিশমাছ ভাজা আনো। আর ঐ যে তোর বুড়ো চাচা, সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারের বাবুর্চিখানা থেকে ভাজিয়ে আনবে। তা ভালোই করেছিস। এ ইলিশ 'ত শিলেটে কেউ দেখতেই পায় না।

অনেক প্রণাম, অনেক আশীর্বাদ, অনেক চোখের জল। বাগচিরা জাহাজে ফিরে আসেন। ঘাট পারে দাঁড়িয়ে থাকে

মনোহর এলোকেশী। কোলকাতার মেলগাড়ী এসে গেছে। জাহাজও পুরো ইস্টিমে থর থর করে কাঁপে। যাত্রী ওঠার পালা শেষ হয়ে যায়। সিঁড়ির পাটাতন খালাসীরা হেঁইও হেঁইও করে ওঠায়। মোটা শিকলের কড় কড় শব্দ, জলদ গম্ভীর সুরে জাহাজের শিঙা, তারপর বয়লারের বাষ্প নিকাশের সাথে জাহাজ ছাড়ে। ডাঙায় এলোকেশী ফুঁপিয়ে কাঁদে, জাহাজে নিভাননী চোখ মোছেন।

২১

শিলেটে পৌঁছে কনখলের প্রথম কাজ হয় কাঞ্চনের তদ্বির। এতদিনের অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি অভিমান করে থাকে কাঞ্চন। অনেক ঘাড় দালাইমলাইয়ের পর আড় চোখে তাকায়, তারপর ল্যাজ তুলিয়ে চিঁহি হি শব্দ করে। ভাব হয়ে যায় সাথে সাথে। মাকে গিয়ে বলে,—আমি দরগায় ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে আসব মা?

—যা না। কিসে যাবি?

—কেন, কাঞ্চন।

—আচ্ছা যা। আর দেখ, ফেরবার পথে আয়েষাদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসিস।

—আসতে বলব?

—না, থাক। শুধু আমরা ফিরেছি, খবর দিয়ে আসিস।

সকৌতুকে তাকান ছেলের দিকে নিভাননী। কিন্তু তাজ্জব বনে যান লক্ষ্য করে যে কনখলের আয়েষার নামে কোন ভাব বৈলক্ষণ্য হয় না। সে উসখুস করে ছুটতে, তার উর্ধ্বনেত্রে অপার্থিব অঞ্জন লেগেছে। এটা কোনো মানুষী আকর্ষণ নয়। হঠাৎ ভয় পেয়ে যান নিভাননী। বলতে চান, ওরে থাম থাম—কিন্তু বলবার আগেই টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায় কনখল। নিভাননী ঘর দোর গোছগাছে মন দেন। ব্যাঙা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়, সব আদর ঢেলে দিতে চান তার ওপর। ব্যাঙা কেঁদে ফেলে। বলে,—বাবা মরে গেছে।

—কি হয়েছিল রে ?

—কালো জলের জ্বর না কি, আমি ত বলতে পারব না মা। তবে উকীল হরেনবাবু হাঁসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, উনি সব জানেন।

—তোদের চলছে কি করে ? খাস-দাস কোথায় ?

কনাবাবার নতুন মাসী আমাদের সব ভার নিয়েছেন। আমি ত হারুণের সাথে এই বাড়িতেই খাই। মা এখন নতুন মাসীর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে।

কথা শেষ হবার আগেই উষা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। নিভা উষার থুতনী ধরে চুমো খেয়ে বলেন,—কি লো, খবর সব ভালো ত ? উষা ম্লান হাসি হাসে। নিভা বলেন,—চল ঘরে যাই। ব্যাঙা, তুই হরেনবাবুর বাসায় একটা খোঁজ দে ত যে আমরা এসেছি। ব্যাঙা চলে যেতে বলেন,—ওদিকের খবর কি সব ?

উষার কাছ থেকে যে খবর সংগ্রহ করেন, তা মোটামুটি হোলো যে প্যারীবাবু পক্ষাঘাত হয়ে শয্যাশায়ী। কলকাতার ব্যারিষ্টার এসে সলা পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। ফায়ার মেরিনের এক পয়সাও পাওয়া যাবে না, তবে আগুন লাগানোর ফৌজদারী হয়ত ফেঁসে যাবে। তেমন জোর প্রমাণ নাকি হয়নি। উষা গিয়ে পরেশের মায়ের পায়ে একদিন পড়েছিল, মা পরেশকে ডাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, যাতে উষার সর্বনাশ না হয় গীতা সোসাইটি যেন দেখে। পরেশরা নির্দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে। তারা আর প্যারীবাবুর বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ আনতে চায়নি। অপরাধী অজ্ঞাত কেউ, এই সিদ্ধান্তই সাব্যস্ত হয়ে আছে। আর বিপিন কার্লাইলকে কারা যেন পূজোর ছুটিতে দেশে যাবার পথে বদরপুর জংশনে চলন্ত সুরমা মেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। প্রাণে মরে নি, তবে একটা পা আর একটা চোখ গেছে। এখন সেইটেই মামলা, আবার গীতাসোসাইটির ওপর হামলা হচ্ছে। বেলুড় থেকে কে একজন স্বামিজি এসেছেন, সমস্ত শহর ভিড় করছে সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কথকতা শুনতে।

এক নিঃশ্বাসে এত খবর দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে উষা। বাইরে হরেন চাকীর হাঁড়ি চাঁছার মতো কর্কশ ডাক শোনা যায়—কই হে মিষ্টার—বৌদি—কোথায়—আরে এই যে, তা একখানা এক পয়সার সরকারী দূত পাঠাতে বাধা কি ছিল বৌদি, অন্তত একবেলা অধমের আতিথ্য গ্রহণ করে ঘরদোর গোছাতে পারতেন।

হৃষীকেশ এসে হরেনবাবুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে যান। বলেন,—চলো হে, বসিগে চলো। ওরে হারুণ, বিদ্যাভূষণ মশায়কে সেলাম দে। ওগো শুনছ, কিছু চা' টা—

উষার দিকে তাকিয়ে কপট রোষে নিভাননী বলেন,—কি বেআক্কেলে লোক রে বাপু। ঘণ্টাদুয়েকও হয় নি,—চলত, ঠাকুর ত এসেছে, দেখি কি হয়।

লুচি আলুর দম করে পাঠিয়ে দেন বাইরে, বিদ্যাভূষণ মশায় আবার খাবার সময় জুতো ছাড়বেন। তার বসবার এবং খাবার দুটি জলচৌকীই ধুয়ে মুছে বাইরে পাঠান। হাত মুখ ধোবার জল নিজে নিয়ে রেখে আসেন ঘোমটা টেনে। হাঁ হাঁ করে ওঠেন হরেনবাবু—আরে একি, একি, মানে—

হৃষীকেশ বলেন—থামো হে চাকী, এ হোলো সহবৎ। গোঁড়া বামুনের সহধর্মিনী, আচারনিষ্ঠ হিন্দুঘরের বৌ, পুজোর পর আসছে গাঁয়ের বাড়ী থেকে। কি করতে হয় না হয়, বেশ জানেন উনি।

বিদ্যাভূষণ দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।—চিরায়ুষ্মতী হও মা, ধনেপুত্রে সার্থক হও। ও হরেনটার কথায় কান দিও না। ওটা অতি ফিচেল। হরেনবাবু কপট রোষকষায়িত চোখে বলেন,—বটে ভট্চায, আচ্ছা, Fair presence, এখন কিছু বলছি না, তবে দেখে নিচ্ছি দাঁড়াও।

আড্ডা জমে ওঠে। উষা যা যা নিভাননীকে বলেছিলো, সে সবও আলোচনা হয়ে গেল। হৃষীকেশ বলেন,—বিপিনবাবুর ব্যাপারটা ত নতুন জটিলতার সৃষ্টি করল হরেন।

হরেনবাবু চট্ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।—জটিলতা? জটিলতা

কোথায়? ও, হ্যাঁ, প্রাণে বেঁচে গেছে, তাই জটিলতা থেকে যাচ্ছে বটে। একেবারে সাবাড় হয়ে গেলে কেস্ সাফ্ হয়ে যেত। ফৌজদারী ব্যাপারে মোক্ষম প্রমাণ ছাড়া কাকে দায়ী করবে বাপু অপরাধী বলে? পুলিশ সন্দেহ করছে পরেশদের গ্রুপকে, কিন্তু ওদের একজনও শহর ছাড়ে নি ঘটনার দিন। অ্যাক্‌সিডেন্টটা হোলো বদরপুর জংশনে—এটা পিওর অ্যাক্‌সিডেন্ট হতে বাধা কি? আর কার্লাইল যে গেঁজেল, সে ত ওর চেহারায়ই মালুম। ছোট কলকেয় বড় তামাক ডবল ফুঁকে পড়ে যায়নি, তার প্রমাণ?

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন, লোকের চরিত্রে মসীলেপন তোমার বড় বদভ্যাস। আইন আদালত হচ্ছে, সেখানেই যা হবার ধার্য হয়ে থাক্ না কেন। মনে মনে এ যুক্তির সমর্থন করেন হৃষীকেশ। কিন্তু মুখে কথার মোড় ঘুড়িয়ে দেন। বলেন,—ওহে, প্যারীবাবুর পক্ষাঘাত ত একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মুখফোড় হরেন চাকী বলেন,—স্বকৃত।

বিদ্যাভূষণ এবার দুঃখিত হন। বলেন,—হরেন, শুনেছি জীবনের নতুন মা মর্মাহত হয়ে মরার বাড়া দিন যাপন করছেন। মনে হোলো যেন তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। বেফাঁসে এসব কথা তাঁর কানে গেলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো লাগবে।

যৌক্তিকতা বোঝবার মতো বুদ্ধির অভাব নেই হরেনবাবুর। মাথা নীচু করে থাকেন, জবাব দেন না। হৃষীকেশ প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য বলেন,—কনাটা আবার দেখলুম কাঞ্চন সওয়ারী হয়ে ছুট্‌লো। কোথায় গেল এই অবেলায়—

ভেতর থেকে নিভাননী মৃদু কণ্ঠে বললেন—ইমাম সাহেবের কাছে। ডাক্তারের বাসায়ও খবর দিতে বলেছি।

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন—বুঝলে হে বাগচি, বুঝলে হরেন, ধর্ম মত যার যাই হোক, এই ইমাম সাহেবটির দেবাংশে জন্ম। এত মহৎ, এত উদার, এত ধর্মপ্রাণ লোক লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। আর পাণ্ডিত্য—অসাধারণ। সুফীধর্ম নিয়ে একদিন

আলোচনার অবকাশ হয়েছিল, অবাক হয়ে গেলাম শুনে। উনি জালালউদ্দীনরুমীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সুফী সাধকদের মর্মবাণী বুঝিয়ে দিলেন। আরও অনেকের। সেদিন অভিভূত হয়ে ফিরেছি।

হৃষীকেশ আন্তরিক সমর্থনে ঘাড় নাড়েন।

এই সময়ে কনখল ফিরে আসে। ঘোড়া আস্তাবলে হারুণের জিম্মা করে লাফাতে লাফাতে মার কাছে যায়। গিয়ে বলে—ইমাম সাহেব খুব খুশি হয়েছেন মা। কত আশীর্বাদ করলেন, তোমার কথা, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি চোরাবালিতে পড়ে যাওয়া, কি করে কেশীদি আমায় বাঁচালো, সব বললাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাক্‌লেন। ফার্সীতে মন্ত্রের মতো কি যেন বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

নিভাননী জিজ্ঞেস করেন,—জাফর ডাক্তারদের ওখানে যাস্‌নি?

—গিয়েছি ত। ওঁরা আসছেন। আর জানো মা, আয়েষার নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। নতুন ডাক্তার সাহেবের সাথে। বলতে বলতে কনখলের মুখ লজ্জারাঙা হয়ে ওঠে। নিভা বলেন, —আরে বিয়ের কনে আয়েষা, তুই অমন মুখ চোখ সিঁদুরে করছিস্‌ কেন? কোন জবাব না দিয়ে কনখল নিজের ঘর গুছোতে যায়।

ইতিমধ্যে জাফর ডাক্তারের গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢোকে। বোরখা ঢাকা দুটি নারী খিড়কি দিয়ে অন্দরে যান। জাফর বারান্দার আড্ডায় এসে বসেন। কুশল সম্ভাষণাদি শেষ হলে জাফর কথাটা তোলেন।—আরে বাগচি সাহেব, আয়েষা মাই-র বিয়ে প্রায় ঠিক্‌ হয়ে গেল যে। নতুন যে সার্জন এসেছে লেঃ আব্বাস, তার সাথে। ঢাকার নবাব গুষ্টির সাথে কি যেন দূর সম্পর্ক আছে, চেহারাটিও ভালো।

বাগচি বলেন—কিন্তু বয়েসে বেমানান হয়ে যাবে না?

—হ্যাঁ—তা—তবে সেটা এমন বেশী কিছু নয়। আয়েষা প্রায় পনেরয় পড়ছে, আর আব্বাস প্রায় চব্বিশ পঁচিশ। ওটা ধর্তব্যের

মধ্যে নয়। বিয়ে হলেও আয়েষা কনভেণ্টে পড়বে, বলেছে ডাক্তার সাহেব।

—তাহলে ত খুব উদার মতাবলম্বী হে জাফর।

—বিলেত ফেরৎ কিনা, চায় যে স্ত্রীও ইংরেজি জানা কেতাদুরস্ত মেয়ে হয়।

—আচ্ছা, এ বিয়ের যোগাযোগ ঘট্‌ল কি করে?

—সে এক মজার ব্যাপার। নতুন ডাক্তার সাহেব আমার হাসপাতাল দেখতে আসবেন। উনি যখন টিলায় উঠেছেন, মনে আছে তোমার পুরোনো বাংলার পিছে অনেক কটা ছোট বড় গাছ আছে? সেই যেখানে কনা আর আয়েষা হরিয়াল মেরেছিল? তারই একটা গাছে হ্যামক টাঙিয়ে আয়েষা দুলে দুলে বই পড়ছিল। শিক্ষিত সভ্য লোক—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো অভব্যতা করেন নি। হাসপাতালে তদারক শেষে যাবার সময় আমায় খালি জিজ্ঞেস করলেন যে দোলনায় বসে যে মেয়েটি বই পড়ছে, সে কে। আমি বললুম যে আমার একমাত্র সন্তান। তারপর থেকে ডক্তার সাহেবের কাজে অকাজে আমার ওখানে আসা বেড়ে গেল। একদিন, বোধ হয় দিন দশেকের পর, মুখ ফুটে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

হৃষীকেশ মনে মনে ভাবেন, এ যে রীতিমত রোম্যান্স। আয়েষা মেয়ের মতো, তাই মুখে কিছু বলেন না।

হরেন চাকী ও বিদ্যাভূষণ প্রায় এক সাথেই বলেন,—এত সর্বাংশে যোগ্য বিয়ে। আয়েষার মতো অপূর্ব সুন্দরী ও সদ্বংশের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। আমরা বড়ো খুশী হয়েছি ডাক্তার জাফর।

ওদিকে বাড়ীর মধ্যেও খুঁটিনাটি আলাপচারী হয়। আয়েষা কনখলের ঘরে, কাজেই খোলাখুলিই নিভাননী বলেন,—হ্যাঁরে, এ ত প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ে বিয়ে। তার ওপর ঘর বর দুইই ভালো। রূপে গুণে আমার আয়েষার তুলনা নেই। তুই ভাগ্যবতী, কুলসম।

কনখলের ঘরে আয়েষা পড়ার চেয়ারে বসে। কনখল খাটের ওপর। এ ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আবার মুখ নীচু করে। কেউ কথা কয় না। মনে মনে কত কথার আদান প্রদান হয় অনুচ্চারিত ভাষায়, ওদের ভাবভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়। এ বই সে বই নাড়ে আয়েষা, খানিক পর স্তব্ধতা ভেঙে যেন জোর করে সহজ হবার চেষ্টায় বলে—কিরে বাঁদর, ধন্দ ধরে গেলি কেন? ছুটি কাটিয়ে এলি দেশে, গল্পটল্প কর।

ড্যাবডেবে চোখে আয়েষার দিকে তাকিয়ে কনখল হাসে। করুণ সে হাসি। হঠাৎ কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যে আবেগ ঠেলে ঠেলে উঠ্ছিলো বুক থেকে গলা পর্যন্ত, ঝাঁকি দিয়ে দাবিয়ে দেয় তাকে। তারপর খুব সহজভাবে আয়েষার হাত ধরে বলে,—চল পুকুর পারে যাই। ছুটির অনেক গল্প আছে, সব বলি গে চল।

চোরাবালির গল্প শুনে আয়েষার গাম্ভীর্যেব বাঁধ ভেঙে যায়। ঠিক আগেকার মতো কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ভালো লাগা আর ভালোবাসার বিভেদ রেখা বড় লাজুক, কখন কিসের ছোঁয়া লেগে সে রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। দুজনে গালে গাল ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ বসে থাকে। মায়ের ডাকে যখন উঠে আসে অপরিসীম তৃপ্তিতে দুজনেরই বুক ভরে থাকে।

২২

নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি, অব্যাহত সুখ, স্থায়ী হয় না জীবনে। স্থিতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে না মন। উন্মেষ-মুখর চিত্ত দয়েলখঞ্জনের মতো নেচে কুঁদে দাপাদাপি করে চলতে চায়। কনখলকে গতির চুম্বক টানে—দুর্বার সে আকর্ষণ, গন্তব্যের কোনো দিশারা নেই। ভয়ের মারাত্মক বোধ এখনো জাগেনি, তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা কনখলের অজ্ঞাত। বিজয়ীর গৌরবে বিপদ অতিক্রম করে আসা ওর যেন সহজাত সংস্কার।

সহপাঠী বা সমবয়সীদের সামনে, স্কুলে শাস্তি পেয়েই হোক বা খেলায় হেরে গিয়েই হোক, অপদস্থ হবার গ্লানি কিন্তু কনখলকে শঙ্কিত করে। তবে স্কুলের আবহাওয়ায় সে শঙ্কাও কেটে আসে। শাস্তির লাঞ্ছনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মধ্যে যেন আত্মত্যাগের মহিমা আছে, অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর বীরত্ব আছে, এমনি মনে হয় ওর। স্কুলে ভূগোলমাস্টার গোপালবাবু ছাড়া আর সব স্যারেরাই যেন এক একটি জঙ্গীলাট—খালি তম্বী, আস্ফালন, আর হুকুমদারী তামিল না করলেই সাজা। ক্লাসে ওপারের সেই বেশী-বয়সী ছেলেটি, যার নাম মাতব্বর, একদিন চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝেনি, বুঝিয়ে দিতে বলেছিল খগেন স্যারকে। তিনি অঙ্ক ত বোঝালেনই না, খামখা গালমন্দ করে অতোবড় ধাড়ী ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিলেন বেঞ্চির ওপর।

কনখল বোঝে না, মাতব্বরের দোষ কোথায়। ভাবে, এত ভারী অদ্ভুত! পিরিয়ড ফুরিয়ে গেলে শাস্তিও শেষ হবে, কিন্তু অঙ্কটা না বোঝাই থেকে যাবে মাতব্বরের। সেও ত নিজে না

বুঝলে মাকে সব জিজ্ঞেস করে। মাতব্বরের হয়ত তার মায়ের মতো মা নেই, কিন্তু স্কুলেও ত জানতে, শিখতে, বুঝতে আসে ছেলেরা। খগেন স্যার এ সহজ কথাটা কেন বোঝে না, ভেবে পায় না। মন বিরূপ হয়। শাস্তি? ভয়? ফুঃ?

যা কিছু বারণ, অজ্ঞাতসারে তার প্রলোভন যেন দুর্জয় হয়ে ওঠে। যা কিছু, গোপন, তার ঢাকা খুলে দেখার আগ্রহ মনকে অধীর করে। হাজারো বিধিনিষেধের গোলকধাঁধায় মন ঘুরপাক খায়, কিন্তু হার মানতে চায় না। ধমক, ভয়, শাস্তি, বারণ, গোপন—অনেক শত্রু। ও যে লড়ছে, তাও ওর বোধের অতীত। জানতে পারে না, তীব্র আবেগ চাপতে গিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে শুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে বলা দু চারটে কথা কখনো সখনো নিভাননীর কানে গেছে। স্বপ্নে কথা বলছে মনে করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন তিনি। হয়ত হজম হয়নি, পেট ফেঁপেছে, দুঃস্বপ্ন দেখছে। পেটে টোকা দিয়ে ঢ্যাবঢ্যাব করছে কিনা পরখ করেছেন। নাঃ, সে সব কিছু নয়। নির্দোষ দেয়ালা মনে করে আমলে আনেন নি।

আয়েষার সাথে রোজ দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ করা হয়েছে। প্রয়োজনও মিটেছে বোধ হয়। দু'জনেই দু'জনাকে জেনেছে, চিনেছে। কিন্তু আব্বাসের অনুরাগে আয়েষা অননুভূত রসের স্বাদ পেয়েছে। বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পর থেকে দেখাসাক্ষাৎ নেই বললেই চলে। আবরু কড়া হয়ে উঠেছে, কুলসম আর আয়েষাকে ঘর থেকে বেরই হতে দেন না। জানলার সার্শী ফাঁক করে আব্বাস আসতে যেতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে আয়েষা, বন্ধ একা ঘরেই গাল লাল হয়ে ওঠে। কোন মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়া লেগেছে যেন, দেহে মনে তরতর করে বেড়ে ওঠে আয়েষা। ম্যাজিকওয়ালার আমগাছের মতো। বীজ পোঁতা, গাছ বাড়া আর ফল ধরা সব যেমন দুমিনিটে হয়।

কনখল আসবে না কেন, আসে। ছুটিছাটার দিনে কাঞ্চনের

পিঠে চড়ে পোলো ময়দানের ধারটিতে এসে দাঁড়ায়, হ্যাসেট যেদিন আসেন, খেলাতে নেন কখনো কখনো। এক সোয়ারী হয়ে খেলবার সুবিধে দিয়েছেনও দু'একদিন। ঘোড়ায় চড়া ও কেয়ার করে না, সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো ঘোড়ায় চড়ার কসরত জানা আছে ওর, কিন্তু বিপদ ঐ তিন মানুষ লম্বা পোলোর ডাণ্ডা নিয়ে। তাও মাঝামাঝি এক জায়গায় দৃঢ়মুষ্টিতে ধরবার কায়দা বাগিয়ে ফেলেছে। ব্রিগেডিয়ার রণছোড় সিং মনে মনে তারিফ করেন। হ্যাসেটকে বলেন,—লৌণ্ডাকো স্যাণ্ডহার্ষ্ট ভেজ দো। হ্যাসেট গোঁফ চুমড়ে হাসেন। বলেন—মাই ডার্লিং ডটার উইল নেভার স্পেয়ার মি। নিভাননীকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন তিনি। লড়ায়ে তালিমে ছেলেকে ঢোকালে খুশী হবেন না নিভাননী, মনে হয় হ্যাসেটের।

খেলার শেষে একবার আয়েষাদের বাড়ি হয়ে দরগামুখো রওনা দেয় কনখল। বাড়ি ফিরে নতুন নেশায় মাতে। সাইকেল। অমৃত কোথা থেকে একটা ছোটাখাটো সাইকেল এনেছে, তাতে চড়তে শেখায় কনখলকে। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগলেও' গা শিরশির করে। অমৃত সীটের তলায় হাত দিয়ে সাইকেল ঠেলে, কনখল হাতল সোজা রেখে ব্যালান্স আয়ত্ত করে। মাঝে মাঝে হাত ছেড়ে দেয় অমৃত, কনখল দেখতে পায় না। ব্যাঙা দৌড়য় সাইকেলের সাথে, কিন্তু ভয়ে ব্যাঙার বুক গুরগুর করে। ব্রেক কষার কাযদা রপ্ত করতে পারেনি কনখল, পড়ল একদিন গাছে ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে। অমৃত ছুটে এসে হাত ধরে তোলে, বলে,—খুব লেগেছে নাকি রে ?

লাগা স্বীকার করাটা পরাজয়, এ বোধ ঠিক আছে কনখলের। সগর্বে গায়ের ধুলো ঝেড়ে মাথা দুলিয়ে বলে,—লাগলেই হোলো! কিছু লাগে নি। বাঁ দিকের কানের লতিটা থেঁতলে গিয়েছে ব্যাঙা দেখে ফেলে। বলে,—লাগেনি আবার! কানটা ত গেছে, দেখি ত মাথায় কোথাও কেটেছে কিনা। অমৃত বলে,—ব্যাড,

ভেরী ব্যাড্। ব্যাঙা, যা ত, গোটাকত গাঁদা পাতা পুকুরে ধুয়ে নিয়ে আয়। ব্যাঙা ছুট দেয়।

ইঁটের ওপর ইঁট দিয়ে ঠুকে গাঁদা পাতার নির্যাস তৈরী হয়। ক্ষতে লাগিয়ে কোঁচার খুঁট ছেঁড়া এক ফ্যালি ত্যানার পটি লাগায় অমৃত। বলে,—ও তোর দু'দিনেই সেরে যাবে, তবে মাসিমা জানলে আর আস্ত রাখবেন না। নাঃ, ক'দিন আর এমুখো হচ্ছি না।

কনখল বলে,—আচ্ছা অমৃত, আমি বলছি মা কিছু বলবেন না। ওই ব্যাঙাকে জিজ্ঞেস কর, মাকে গিয়ে সব খুলে বললেই হোলো। মার কাছে না লুকোলে মা কিছুতেই রাগ করেন না। সেই পাখী ধরার দিন মনে নেই ব্যাঙা? তোর হাতটা ত খুব্লে খেয়েছিল মাদী কোকিলটা। মা খালি উড়িয়ে দিলেন, কই বকেন নি ত? ব্যাঙা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ছুটির বার, কিন্তু বিকেলের খেলায় ফাটা কান নিয়ে যোগ দিতে পারে না কনখল। ব্যাঙাকে একসাথে নিয়ে খেলায় মর্যাদা এখনো দেয়নি ছেলের দল। কিন্তু ব্যাঙা স্কুলে ভর্তি হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, এখনো ওকে বাদ দেওয়া হবে কেন, ভাবতে খারাপ লাগে কনখলের। মার দিকে তাকায়, মা যেন বোঝেন ওর মনোভাব। বলেন,—আজ ব্যাঙা খেলবে কংখের বদ্লী। আমি জানলায় বসে দেখব। হ্যাঁ রে অমৃত, তোদের গীতা সোসাইটির মামলা নাকি মিটমাট হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ মাসিমা। নিবারণ ছিল মূল আসামী। হ্যাসেট সাহেব বলেছেন ওর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ টিকবে না। বাদ্বাকী প্রকাশদা, অমূল্য, আমরা—আমরা ত শুধু আগুন নেভানো, লোক বাঁচানো, এই সবই করেছি। তবে কানাঘুষা শুনি, বেণী দারোগা নাকি পণ করেছে যে আমাদের সবাইকে জেলে পুরবে।

—প্যারীবাবুর কি হবে?

—উনিও খালাস হবেন। সন্দেহ আছে প্রমাণ নেই। তারপর হঠাৎ ফিস্ফিস্ করে বলে—মাসিমা, হরেনবাবু উকিল, তিনি

নাকি বলেছেন যে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর কথা, কি মতামতের আইনে কোনো দাম নেই। নতুন মাসির সেই আপনাকে বলা কথা ছাড়া প্যারীবাবুর বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ নেই। সেই যে, আগুনলাগার দিন বলেছিলেন, গুদামে একটুও পাট ছিল না। বলেছিলেন তিনি আপনাকে, আপনি বলেছিলেন মেসোমশাইকে, কনা শুনেছিল। কলকাতার কোম্পানীর সাহেবটাও নাকি তদন্ত করে তাই বলে গেছে। তবে হরেনবাবু বলেন, যে পাঁচফেরতা কানকথায় ফৌজদারী মামলায় সাজা হতে পারে না। খালাস হবেন প্যারীবাবু, তবে ওঁর অনেক ধারদেনা, বিষয়সম্পত্তি সব নাকি বিক্রী হয়ে যাবে।

অমৃত ছেলেটি দলের মধ্যে সাবালক, খাসা গুছিয়ে পূর্বাপর বর্ণনা করে যায়। এই পূর্ণাঙ্গ নাটকে ছেলের অংশ তুচ্ছ নয় মনে করে অস্বস্তি বোধ করেন নিভাননী। মুখে প্রকাশ করেন না কিছু। বলেন,—যা তোরা খেল গে যা। ব্যাঙাকে খেলায় নিতে ভুলিস্ না অমৃত।

ছেলের সাথী, দাগী চোরের ছেলে, খিদ্‌মৎগার ব্যাঙা নিভাননীর কাছে যেন কনখলের সমপর্যায়ে উঠে গেছে। মায়ের মনের রহস্যই আলাদা।

বৈকালিক বৈঠকের আড্ডাধারী সবাই বাইরের বারান্দায় জমায়েৎ হয়েছেন। বিদ্যাভূষণ ম'শায় ফুলো গালে টিকেয় ফুঁ দিচ্ছেন। হরেন চাকী রহমৎবাহিত কোন ম্লেচ্ছ জলখাবারের কথা সলোভে ভাবছেন। দীক্ষা নতুন, তাই ঈপ্সা বলবতী।

বর্মা চুরোট ফুঁক্‌তে ফুঁকতে দু'চার কদম পায়চারি করে বাগচি এসে স্বস্থানে বসেন। নিভাননী পর্দার আড়াল থেকে হরেনবাবুকে ইশারায় ডাকেন। ত্বরিৎ পদে হরেনবাবু উঠে ভেতরে যান। বলেন—কি বলছেন বৌদি ?

—ঠাকুরপো, আপনি নাকি প্যারীবাবুর পক্ষে ওকালতী করছেন ?

—কে বল্‌লে ? ওকালতী নয়, ওকালতী নয়। আমমোক্তার নামা আমায় দেননি প্যারীবাবু। তবে—মানে, আইনসঙ্গত সাক্ষ্যপ্রমাণের রহস্যটুকু ফলাও করে জানিয়ে দিয়েছি কর্তাদের। জীবনের নতুন মার সেদিনকার কান্নাকাটি শুনে গেছি কিনা, মনটা কেমন মুষড়ে ছিল।

এই স্পষ্ট বক্তা কটুভাষী লোকটির সদয় অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে প্রীত হন নিভাননী। হরেনবাবু বলতে থাকেন, আপনি ত বুদ্ধিমতী মহিলা, বৌদি, আপনিই বুঝুন। স্বামীর অনিষ্টকারী কোনো কথা ঘরোয়াভাবে স্ত্রী তাঁর কোনো বন্ধুস্থানীয়াকে বললেন। সেই বন্ধু আবার তাঁর স্বামীর কাছে কথাগুলো গল্পচ্ছলে শোনালেন। গল্প কানে গেল এক নাবালক বাচ্চার, এখন এই বাচ্চার শোনা কথার সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে কি দাম থাকতে পারে ? তেমন জোর মামলা খাড়া হলে উকীল ব্যারিস্টার শিখিয়ে পড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়ে হলপ করে বলিয়ে দেবে যে তিনি আদৌ কিছু বলেননি ও ধরনের। ব্যস্‌। না, না—ওসব ঘরোয়া বৈঠকের গালগল্পে মামলা খাড়া হয় না। আর তা ছাড়া, নাবালকের শোনা কথার দাম দিলে আপনাকে, বাগচিকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। পারবেন সেটা ?

—রক্ষে করুন ঠাকুরপো। মাগো, তাই কখনো কেউ পারে ? ওসব ভয় নেই ত আর ?

—না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও আশঙ্কার গোড়া থেকে সমূলে কেটে দিয়েছি।

নিভাননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন—নির্মলার সাথে আর ঝগড়াঝাঁটি করেন না ত ?

—রামঃ, আবার। সেই আপনার যাবার দিন থেকেই সাদা নিশান। সন্ধি। তবে লক্ষ্য করছি, আমার যেমন রহমতের রসুই-এর ওপর লালচে বেড়ে উঠছে, ওঁরও তেমনি ঠাকুর পুজো, সাত্ত্বিক রান্নাবান্নার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। আজ ত সাফ বলেই এসেছি

রাত্তিরে আপনার এখানে নেমন্তন্ন। বলে, যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবেই নিভাননীর দিকে তাকান হরেনবাবু।

নিভাননীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন—নেমন্তন্নই ত। আমি তাই আপনি খাবেন বলে আগে থেকেই আয়োজন করেছি। আচ্ছা বসুনগে আড্ডায় গিয়ে, আমি এদিক দেখি। বলে, অসত্যভাষণের গ্লানি কাটাতে বাবুর্চিখানার দিকে পা চালান নিভাননী।

কনখল ছাদে বসে খেলা দেখে। কানের ব্যথাটা বেশ জানান দেয় থেকে থেকে। শীত প্রারম্ভের পাহাড়ী পাখীরা দলে দলে অপেক্ষাকৃত সমতলে মরসুমী অভিযান করে আকাশ ছেয়ে, ঠায় তাকিয়ে দেখতে দেখতে মন কেমন উদাস হয়ে যায়। একটা শঙ্খচিল ঘুরপাক খেয়ে উড়তে উড়তে ওপরে, অনেক ওপরে, মেঘাবরণের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। পূজোর ছুটিতে দেশের নদীর নীল গেরুয়া দুই ধারা জলের সংমিশ্রণ দেখে এসেছে কনখল। প্রকৃতি বিলাস ও শারীরিক যন্ত্রণা তেমনি ওর অনুভূতির দুই কানা বেয়ে বয়ে যায়। উৎফুল্ল ও বিষাদ একসাথে মিশে নিছক ভাবালুতা থেকে যেন বাচায় ওকে, সম্বিৎ সজাগ রাখে।

দূরে রাস্তার বাঁকে হ্যাসেটের অশ্বারোহী মূর্তি দেখা যায়। বোধ হয় ওদের বাড়ীতেই আস্‌ছেন। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে কনখল ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে বলেন,—হ্যালো ইয়ং ম্যান,—

হারুণ আসবার আগেই ও ঘোড়ার লাগাম ধরে। হ্যাসেট আদর করে ওর পিঠ চাপড়ান। বাগচি এগিয়ে আসেন। বিদ্যাভূষণ, হরেনবাবু নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। ছেলের দল খেলা শেষে মাঠের কোণায় জটলা করছিল, এইবার যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। হারুণের হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে কনখল বাড়ীর ভেতরে যায়।

হ্যাসেট আসন গ্রহণ করে বলেন,—তোমার মনস্কামনা সফল

হয়েছে বাগচি। সামনের মাস থেকে সরকারী ইস্তাহার ইত্যাদিতে তোমার নামের আগে মিষ্টার ব্যবহার হবে, হুকুম হয়েছে। কেমন, খুশী ত?

বাগচি মুখ কাঁচুমাচু করেন, অস্পষ্ট সুরে বলেন,—আপনার দয়া। হরেনবাবু আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন। বিদ্যাভূষণের মুখভাব নির্লিপ্ত।

হরেনবাবুর মুখভাব হ্যাসেটের চোখ এড়ায় না। ঝানু সিভিলিয়ান, বহুদিন এদেশে আছে। পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পেতে হয় না। বলেন,—ওয়েল, বাগচি, যদ্দিন চাকরী করবে, সাহেবীটাহেবী কোরো, কিন্তু ওই ওপবপাত পর্যন্ত। চালচলনে, বেশভূষায়। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালীই থেকো হে, সরকারের কাছেও সম্মান পাবে। তোমাদের সুরেনবাবু, রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু, বিপিনবাবু, এঁরা যাই বলুন, আর যাই করুন, মনে মনে সমীহ করি এঁদের। যে মাটিতে জন্ম, সেই মাটির রসে পুষ্ট হবে, তবে ত জীবনীশক্তি অটুট থাকবে! কি বলেন হরেনবাবু?

হরেনের বাক্‌রোধ হয়ে আসে। মনে মনে বলেন—সাহেব, তুমি ম্লেচ্ছ ও বিজাতীয়, কিন্তু ইচ্ছে করছে তোমার সবুট শ্রীচরণ-যুগলে কপাল ঠুকি। মুখে বলেন—খাঁটি কথা স্যার। আর বাগচির সাধ্য কি, শেকড় কাটা কাঠখোট্টা হবার। বাড়ীতে তুলসীতলা আছে, শালগ্রাম আছেন,—

আবার মনে মনে বলেন হরেনবাবু—আর জীবন্ত লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ আছেন। মুখে আবার বলেন,—বাইরে মডার্ণ বেঙ্গল হলে কি হয়, ভেতরে ঘোর সনাতনী। হাঁচি টিক্‌টিকি মাকুন্দচোপা,—সব মানেন আমাদের বাগচি।

—হোয়াট—হোয়াট ইজ ছাট—

—এই কতকগুলো অশুভ সঙ্কেত স্যার। অমঙ্গলসূচক। শুভকাজে বেরোতে ওগুলোর প্রত্যেকটি বাধাই বাগচি মেনে থাকেন। মনটা ওঁর খাঁটি দেশের রসেই পুষ্ট জানবেন।

ভেতরে নিভাননী মুখে আঁচল চাপেন। বিদ্যাভূষণ ঈষৎ হাসেন। বাগচি দাঁত কিড়মিড় করে হরেনকে চিমটি কাটেন। হ্যাসেট প্রসঙ্গ লঘু করে দেন স্বাভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণে। বলেন—ওঃ, ইন্অস্পিশাস সাইনস্—ও সব দেশেই মানা হয়। আমাদের দেশের তেরো নম্বর, আর কালো বেড়ালের কথা শুনেছ ত? ভারী অমঙ্গলের ব্যাপার। কত উচ্চশিক্ষিত লোক এখনো মানে। যাক্, আরও ভালো খবর আছে। পার্টিশন রদ হয়ে গেল। লর্ড কার্জনের সেট্‌লড্ ফ্যাক্ট আন্‌সেট্‌ল্ করে দিলে হে তোমাদের স্থরেন ব্যানার্জি। জানুয়ারী থেকে আসাম, বাংলা, বেহার, ওড়িষ্যা, আলাদা আলাদা প্রভিন্স হয়ে যাবে। লর্ড কারমাইকেল আস্‌বেন বাংলার প্রথম গভর্ণর হয়ে। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি আমরা— ভারী ভালো লোক। খাঁটি মানুষ।

ওপরওলার সাম্‌নে বাগচি বাকবিস্তার করেন না, কিন্তু হরেন মুখফোঁড় মানুষ। বলেন,—সার, ভালো খবরটা খালি দেশসংক্রান্ত, —না—

—ক্লেভার, ভেরী ক্লেভার। না শুধু দেশ সংক্রান্ত নয়। জানুয়ারী থেকে বাগচি মহকুমা হাকিম হয়ে যাবে উত্তর বাংলার নিশ্চিন্তপুরে। দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি জায়গা। স্বাস্থ্যকর নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা।

হরির লুটের বাতাসার মতো ভালো খবরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হ্যাসেট উঠে দাঁড়ান। বাগচিকে বলেন,—ওয়েল, ওয়েল, মাই সন, আই হ্যাভ্ ডান মাই বেষ্ট। মেয়ে কোথায়? কনখলকে বলেন—হ্যালো, ইয়ংম্যান, লীড্ মি টু ইওর মাদার।

সাহেব উঠে যেতে হরেনবাবু বাগচির করমর্দন করে প্রায় নাচতে বাকি রাখেন। বিদ্যাভূষণ বলেন—অতি সজ্জন ব্যক্তি। এমনি যদি সব ইংরেজ হোতো।

তার্কিক হরেন জো পান। বলেন,—হলে কি হোতো? এ জীবনে স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো না। শাসক

শ্রেণী অবিবেচক ও অত্যাচারী না হলে বিরুদ্ধ মত দানা বাঁধতে পেত না। ব্যক্তিগতভাবে হ্যাসেটকে দেবতুল্য মানুষ মনে করি—ইংরেজের প্রতিভূ হিসেবে কার্জন ফুলার কার্লাইল লায়নেরাই কাম্য—এই নির্বীর্য দেশে অন্তত কিছুটা প্রাণসঞ্চারের সমিধ জুগিয়েছে।

বাগচি বলেন—থামো হে। হ্যাসেট আস্‌ছেন।

হ্যাসেট এসেই হরেনকে বলেন,—যাচ্ছি আমি। আই সে হরেনবাবু, আপনি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সাক্ষী বিষয়ে যে পয়েণ্টটা সেদিন উল্লেখ করেছিলেন, যদিও সেটা এক্ষেত্রে পুরো প্রযোজ্য নয়, তবুও একেবারে উড়িয়ে দেবারও নয়। জাজ লালওয়ানী আর কলকাতার কাউন্সিলর, তাঁরাও একমত। ঠিক্ ওই ধরনের ডমেষ্টিক গসিপ-এর ওপর নির্ভর করে পিয়ারীর বিরুদ্ধে কেস্ দাঁড় করানো যায় না,—হি গোজ্ স্কটফ্রী। তবে ইন্‌স্যুরেন্সের টাকা কিছু পাবে না, কোম্পানীর লোক এন্‌কোয়ারী রিপোর্টে মেরে দিয়ে গিয়েছে।

এ সুসংবাদের সম্ভাবনা আভাসে ইঙ্গিতে আগেও আলোচিত হয়েছে, তবুও খোদ ডেপুটি কমিশনারের জবানী খবরে প্রত্যেকেই হর্ষ প্রকাশ করেন। হ্যাসেট যাবার মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন,—কিন্তু আই ডোণ্ট লাইক পিয়ারীস্ মেথড্‌স্। হি ইজ নট এ ষ্ট্রেইট্ ফেলো। আমি বহুদিন এখানে আছি। শিলেটের সবায়েরই নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজখবর রাখি। দরগার হাজি, রেভারেণ্ড নিকলসন, পরেশবাবু, গীতা সোসাইটির স্বামীজি, এঁদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় আমি আপনাদের থেকে কম নই। কিন্তু বর্তমান সরকারী নীতিতে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটছে, সরকারী হিসেবে আমার কার্যকলাপেও উনিশ বিশ হতে বাধ্য। আশা করি, আপনারা পাব্লিক মেন, এটুকু বুঝবেন।

হরেনবাবু হাত কচ্‌লে বলেন,—রামরাজত্বে ছিলুম আমরা। আপনার সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, সদয়ব্যবহার, প্রতি সিলেটবাসীর

বুকে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে থাকবে চিরদিন। তা না হলে, স্যার্, আমি প্যারীবাবুর সবচেয়ে বিরোধী, আপনাকে গিয়ে তাঁর জন্যে ধরি?

—নো নো হরেনবাবু, ইউ আর আপরাইট, অনেষ্ট টু দি কোর। লোকচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা কম নয় জানবেন। তবে এডুকেটেড বেঙ্গলের অ্যাজিটেশন—ইট্‌স্ ইন্ দি এয়ার। এ হাওয়ার তোড় ঝড়ে দাঁড়াবে কিনা, দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকব না। যাক্, ইট্‌স্ নাইদার হিয়ার, নর দেয়ার। অন্দরের দিকে তাকিয়ে নিভাননীকে উদ্দেশ করে বলেন,—নিভ্-এর মতো একটি মেয়ে ছিল আমার। আর্মি অফিসারের সাথে বিয়ে হয়েছিল। নর্থওয়েষ্টে একটা রাইজিংএ মোম্যান্দ দস্যুর হাতে দু'জনেই প্রাণ দেয়। তাই তো রণছোড় সিং যেদিন বলেছিল, কনখলকে স্যাণ্ডহার্ষ্টের জন্যে সুপারিশ করতে, আমার মন সায় দেয়নি।

মোটা বুরুশের মতো ভুরুর তলায় চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। গলাও যেন ধরে আসে। কিন্তু সাহেবকা বাচ্চা—আধ মিনিটেই স্বাভাবিক হয়ে যান।

—ওয়েল নিভ্, ওয়েল বাগচি—চলি এবার। জানুয়ারী থেকে নিজের এলাকায় গিয়ে রাজত্ব করবে আর কি! কিপ্ এ ক্লিয়ার হেড্—গুড্ বাই।

হারুণ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে। ঘোড়ায় উঠে ধীর কদমে হ্যাসেট বেরিয়ে যান। মেয়ে জামাইয়ের উল্লেখের সময় সাহেবের গলা ধরে আসা কারোরই নজর এড়ায় নি। বৈঠক আর জমে না। এতগুলো সুখবর তারিয়ে তারিয়ে চাখ্‌বার মনোভাবও উবে যায়। এক বোঝা গোঁফ ও কটা চামড়ার তলায় অতি সাধারণ পিতার স্নেহপ্রবণ মনের কাতরতা সবায়েরই মর্ম স্পর্শ করে। বাগচি ভাবপ্রবণ মানুষ—চশমা মুছবার অছিলায় চোখের ছলছলানি আড়াল করেন।

হঠাৎ প্যারীবাবুর বাড়ীর দিক থেকে কান্নার রোল ওঠে।

২৩

জীবনটাই নাটক। প্যারীবাবুর বিপন্মুক্তির খবর নিয়ে নিভাননী যখন ও বাড়ীর দিকে পা বাড়ান, তখনই কান্নার রোল ওঠে। বাইরে কর্তারা, আশে পাশের বাড়ীর লোকজন, সবাই পৌঁছল, প্যারীবাবু তখন সমস্ত সুসংবাদ দুঃসংবাদের অতীত। তাঁর প্রাণহীন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। মাথার কাছে ছেলে জীবন আর পায়ের কাছে উষা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

জীবিত প্যারীবাবু যার কাছে যতো দ্বেষবিদ্রূপের পাত্রই হোন্ না কেন, মৃত্যুর দৌত্য তাঁকে সাময়িক সমবেদনার যোগ্যতা অর্পণ করে। প্রাথমিক ফিস্‌ফাস্, জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তার ডাকতে যায় একজন। প্রকাশদেরও খবর দেওয়া হয়। প্রচারক পরেশবাবুর নির্দেশে নিভাননী উষাকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যান। হরেনবাবুর স্ত্রী নির্মলাও এসে যান। নির্বাক সান্ত্বনার স্পর্শ ছাড়া আর কি দেবারই বা আছে তাঁদের, উষারও অঝোরধারে কেঁদে বুক হালকা করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

মিনিট পনেরোর মধ্যে লোকের ভিড়ে বাড়ী ভর্তি হয়ে যায়। প্রমোদবাবু, সরকারী ছোট ডাক্তার, পরীক্ষা করে বলেন—পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন, তারই জের। আক্রমণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে হার্টফেল করেছে।

শেষকৃত্যের সামাজিক ফৌজ যেন প্রস্তুতই থাকে। প্রকাশ তাদের দলপতি। পারিবারিক পুরুতঠাকুরের আগমন হয়। যথাচার মাঙ্গলিকাদি সেরে-সুরে তিনি বিদায় নেন। মহিলারা ছাড়া ও বাড়ীতে কেউ আর থাকেন না। বাগচির বারান্দার বৈঠক

সেদিন আবার বসে। কিন্তু হাস্যপরিহাস আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে না। সবায়ের মনে একটা যেন থমথমে ভাব। আকস্মিক মৃত্যুর আবির্ভাব আজ প্যারীবাবুকে যেন শ্লেষ ব্যঙ্গের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যায়—বাগচির মনে কবেকার পড়া কবিতার কথাগুলো উঁকিঝুঁকি দেয়, মৃত্যুর প্রসঙ্গে,—

'তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে ;
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে ?'

বাগচির মনে হয় দিল্লীর দরবারে হাজিরা দেবার উমেদারী করবার একটি লোকের অভাব ঘটল। ঠকিয়ে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় করবারও। এখন যেখানে লোকটিকে হাজিরা দিতে হবে সেখানে ঠকবাজী চলবে কিনা জানা নেই বাগচির। প্যারীচরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলো মনে আসায় দুঃখিত হন বাগচি। মানুষ নিছক শয়তানও নয়, নিষ্কলুষ দেবতাও নয়। ভাবতে চেষ্টা করেন সভামৃতের মধ্যে কোনো প্রশংসনীয় দিক ছিল কিনা।

ছেলের দল, মানে অমৃত, ব্যাঙা, কনখল, গেটের ধারে কামিনী ফুলের গাছতলায় বসে জটলা করে। রাস্তার ও-পাশের বাড়ী থেকে বিদ্যাভূষণের ছেলে অমূল্য এসে পাশে বসে। অমূল্য যদিও প্রকাশের দলের একজন বড় তলপিদার, কিন্তু বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের শ্মশানযাত্রায় যোগ দেয়নি। নিজস্ব মতামত কিছু গড়ে উঠতে পায়নি, বাবা পছন্দ করবেন না, তাই। তা না হলে অমূল্যর নিজের যাবার ইচ্ছে ছিল। সমাজ-শাসনের ফাঁস কেটে তরুণ মনগুলো উড়ি উড়ি করতে শুরু করেছে, কিন্তু ব্যাধের সজাগ পাহারা এড়ানো দুঃসাধ্য।

স্বজনবিয়োগ বিষয়ে ওদের মধ্যে ব্যাঙা ওয়াকিবহাল। কিছু-দিন আগেই ওর বাবা মারা গিয়েছে। যদিও হাসপাতালে, তবুও

মায়ে ছেলেতে অনেক কেঁদেছে ওরা। ওই নতুন মাসী সেদিন ব্যাঙার চোখের জল মুছিয়েছেন, জটিলাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মনে পড়তে ব্যাঙা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে। অন্য ছেলেরা বোকার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিমর্ষভাবে বসে থাকে। শুধু অমৃত একটু করিৎকর্মা, কিছুক্ষণ উসখুস করে বলে,—প্যারী-বাবু এবার কোথায় যাবে রে, স্বর্গে, না নরকে?

সদ্য সদ্য মৃত্যুর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো অকরুণ মনে হয় কনখলের। গালগল্পের যমরাজা দূত পাঠিয়ে মানুষের আত্মাকে নিয়ে যান। বৈতরণী নদী পার হয়ে দুটো দরওয়াজা। একটা স্বর্গের, একটা নরকের। বেঁচে থাকার সময় যে যেমন ভালো মন্দ কাজ করে তারই বিচার করে খুলে দেওয়া হয় একটা দরওয়াজা। প্যারীবাবুর ভাগ্যে নিশ্চয়,—নাঃ। ভাবনা ভুলতে চায় কনখল। বলে,—তোর বাবা ত বীর ছিল, নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে ডাক্তার সাহেব আর মেম আর বাচ্চাদুটোকে বাঁচাতে গিয়েছিল. আমাকে ত বাঁচিয়েই ছিল—তোর বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে।

ব্যাঙা ধরা গলায় বলে, কিন্তু বাবা যে চুরি করত। চুরি করা ত পাপ,—

—পাপ না ছাই। কাজ্‌কর্ম না থাকলে ঘরে কিছু না থাকলে, চুরি করায় পাপ হয় না। হরেনকাকাদের সাথে বাবা একদিন গল্প করেছিলেন, শুনেছি।

অমূল্য গীতা সোসাইটির পাণ্ডা। বাংলায় গীতার ব্যাখ্যা অনেক শুনেছে। বলে,—ঠিকই ত। মানুষ মারা ত পাপ?—কিন্তু কেষ্টঠাকুর অর্জুনকে মানুষ মারতে বলেছেন, অবিশ্যি ধর্মযুদ্ধে। প্রাণ বাঁচানো ত ধর্ম, তাহলে খিদের সাথে যুদ্ধও ধর্মযুদ্ধ। ব্যাঙার বাবা কিছু পাপ করেনি।

ব্যাঙার বাবার স্বর্গবাস সম্বন্ধে অতঃপর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না। প্যারীবাবুর বর্তমান আবাস সম্বন্ধে মত

প্রকাশে বিরত থাকে ছেলেরা। অপাপবিদ্ধ মনের সহজাত সৌজন্যবোধ কটুচিন্তা নিবারণে সাহায্য করে।

খিড়কির পাশ দিয়ে নিভাননীকে বাড়ী ফিরতে দেখা যায়। ব্যাঙা আর কনখল বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। অমৃত অমূল্যও উঠে পড়ে। বারান্দায় বড়দের বৈঠক তখনো চলে। প্রচারক পরেশবাবু, আর জাফর ডাক্তারও এসে গেছেন। আয়েষা, বা তার মা, আসেননি। হুট করে আয়েষা আজকাল আর কোথাও যাওয়া আসা করে না। বিবি রোজমেরীর স্কুলে যাওয়া শুধু আব্বাসের আগ্রহে বজায় আছে। ইংরেজী চালে ঘরকন্না চালানো সমাজে চলাফেরার কায়দা কানুন শেখাচ্ছেন ফ্লোরেন্সবিবি, পাদ্‌রী নিকলসনের প্রৌঢ়া কুমারী বোন। গিন্নিবান্নি অথবা বয়স্কা সহচরী ছাড়া উদ্‌ভিন্ন যৌবনা কুমারীর অনাত্মীয়সমাজে আত্মপ্রকাশ নিষিদ্ধ। সাহেব-মেমেরা পদে পদে বাধা নিষেধের ধমক থেকে মুক্ত, এই মনে হত কনখলের। কিন্তু ওরে বাবা, পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা নৌকোর পালের মতো ফাঁপা ঘাগরা, পুরো হাত আস্তিনফুলো আঙরাখা, আর বালিশের কুঁচি দেওয়া থুতনীবাঁধা টুপী পরা ফ্লোরেন্সবিবি যেন একটি মূর্তিমতী হৃৎকম্প। হ্যাসেটের মতো ভারিক্কী সাহেবের একটুও বেচাল হবার সাহস নেই তাঁর সামনে। তার ওপর চোখ দুটো ইঁদুরের মতো পিটপিটে, ওপর ঠোঁটে পরিষ্কার গোঁফের রেখা। কনখলের মনে হয়, গাঁয়ের সেই রেফের মতো টিকিওয়ালা বিটেল পূজারী পণ্ডিত কোথায় লাগে এর কাছে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখে দুজনের মতো বিছানা পাতা হয়েছে। মায়ের বালিশ চিনতে দেরী হয় না। মনে মনে খুশী হলেও মুখে বলতে চায় না কনখল। গিয়ে মাকে বলে,—এর দরকার কি ছিল মা, আমি কি একা শুতে ভয় পাই?

—ভয় কিসের? কনখল ত মস্ত বীর। যদি আমি ভয় পাই, তাই আগেভাগে একজন বীরপুরুষের কাছে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বলে হাসেন নিভাননা।

মুখের মতো জবাব জোগায় না কনখলের। একটু থতমত খেয়ে বলে—আচ্ছা, মা, প্রকাশদারা ত চাদর মুড়ি দিয়ে জীবনের বাবাকে নিয়ে গেল। তারপর কি করবে?

—নদীর ঘাটে নিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

—একটা মানুষকে পোড়াবে?

—প্রাণ থাকা পর্যন্ত মানুষ, এখন ত ওটা শুধু দেহ, প্রাণহীন দেহ। দেখিসনি, ওই বাদামগাছটা যখন ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেল, ওটাকে কাটিয়ে কুটিয়ে আমরা জ্বালানীকাঠ করলাম। ওটা ত আব গাছ রইল না,—যতক্ষণ শিকড় দিয়ে মাটির রস টানতো, ফুল ফোটাতো, ফল ফলাতো, ততদিন ওটা জীবন্ত একটা গাছ ছিল। কিন্তু ভেঙে পড়ে শুধু কাঠ হয়ে গেল।

তত্ত্বকথা বোঝে না কনখল। কিন্তু উপমার উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারে। মানে বোঝার থেকে তুলনার ইঙ্গিত সহজে প্রবেশ করে শিশুমনে। কিন্তু মনের গোপন কুঠরীতে একটি তার্কিকও বাস করে। সময়ে অসময়ে সেও মাথা চাড়া দিতে চায়।

—তা যেন হোলো। তবে সাহেবরা আর মুসলমানেরা না পুড়িয়ে কবর দেয় কেন কেউ মরে গেলে?

এইবার জবাব না জোগানোর পালা নিভাননীর। কিন্তু শিশু-মনের কৌতূহল সাধ্যমত মেটানো উচিত। তিনি বলেন,—তোরা ত ভূগোল পড়েছিস। এই পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ মাটি। হিন্দুরা নিষ্প্রাণ দেহ পুড়িয়ে, ছাই করে, নদীর জলে মিশিয়ে দেয়। যারা হিন্দু নয়, তারাও ফেরত দেয় মৃতদেহ পৃথিবীকে—তবে জলে নয়, মাটিতে পুঁতে। ঐ যে মরা গাছের কথা বলেছি—যদি আমাদের মতো কেটে কুটে ঘরে তোলবার কেউ না থাকৃত, তবে ও গাছটাও একদিন মাটিতে মিশে যেত। এই পৃথিবীতে যাদের সৃষ্টি, তারা বেঁচে থেকেও পৃথিবীর, মরে গিয়েও পৃথিবীর।

এ সব কথা দুর্বোধ্য হয়ে আসছে কনখলের পক্ষে, বোঝেন নিভাননী। কিন্তু নিজের চিন্তাধারার খেই ছাড়তে পারেন না।

বলে চলেন, পৃথিবীতে যারা জন্মে,—সব রকমের মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছপালা,—সবাই সবায়ের ভালোর জন্যে বেঁচে থাকে। নিজের প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে, পৃথিবীকে সুন্দর করে রাখে। প্রাণ শেষ হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে যায়—এক হয়ে যায় জল মাটি রোদ হাওয়ার সাথে।

কনখল এত কথার তাৎপর্য বোঝে না। আভাসে শুধু বোঝে, বেঁচে থাকার সাফল্য শুধু প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করা। কিন্তু ঘুম পায় যে। বলে,—মা, খেতে দেবে না?

নিভাননীর সম্বিৎ ফেরে। বলেন,—তাই তো—তোর সাথে গল্প করতে গিয়ে কত রাত হয়ে গেল ছাখ। বাইরের বৈঠক ত এখুনি ভাঙবে বলে মনে হয় না। বাবার খেতে আজ দেরী হবে। চল্, তুই আর ব্যাঙা খেয়ে নিবি চল্।

ব্যাঙা, বাপ মরা অবধি এ বাড়ীতেই থাকে। তাকে ডাক দিয়ে, কনখলের হাত ধরে নিভাননী, রহমতের রসুইখানার দিকে এগোন।

জয়ন্তী পাহাড়ের হিমেল হাওয়ার হিল্লোল সে রাত্রে সমস্ত শিলেট সহরকে অনড়, অবশ করে বইতে থাকে। শুধু লেপের তপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনের মধ্যে একটি ছোট্ট মন স্বপ্নরাজ্যে জাগে। পৃথিবী তো নিজেই কতো সুন্দর, ভাবে সেই মন। তবে কি তাকে আরো সুন্দর অনেক সুন্দর করতে হবে, প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে? বেঁচে থাকলে তাই-ই করতে হবে। আর মরে গেলে? আবার পৃথিবীর বুকেই ফিরে যেতে হবে। যেন একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান পেয়ে মন আশ্বস্ত হয়। স্বপ্নরাজ্যে যে সব ঘুমপাড়ানীরা থাকে, তারাই ভার নেয় ছোট্ট মনটাকে ঘুম পাড়াবার। অসাড়ে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করে কনখল; তারপর এক সময় ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

সকালে ঘুম ভেঙে মাকে দেখতে পায় না কনখল। অনভ্যস্ত

ঠেকে না, মা ত রোজ শোয় না তার পাশে। তড়াক করে উঠে জুতোজামা পরতে পরতে রাত্রের কথা মনে হয়। মা নিশ্চয় নতুন মাসীর ওখানে গেছেন। কনখল ঘর-বারান্দায় গিয়ে ব্যাঙাকে উঠিয়ে দেয়, বলে—আস্তাবলে আয়।

কি কুয়াশা! রাতের অন্ধকারের বাসিন্দা হিমেরা যেন আসন্ন সূর্যোদয়ের আশঙ্কায় পালাই পালাই করছে, কিন্তু তাদের ঘন ধূম্রনিশ্বাস তখনো চারদিক অস্বচ্ছ আবরণে ঘিরে রেখেছে। একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। ওদের গোল্লাছুট খেলার মাঠ যেন একটা ছোটখাটো দীঘি; ছুটো একটা লম্বা গাছের ডগা, একটা বকফুলের আর একটা তেজপাতার—মাথা জাগাচ্ছে অথই গাঙে অদৃশ্য নৌকোর মাস্তুলের শীষের মতো। চেনা পথে আস্তাবলে পৌঁছে যায় কনখল। হারুণ আগেই এসে গেছে। কাঞ্চন লেজের বালাম ছুলিয়ে ঘাড় কাৎ করে যেন চোখ ঠারে, তারপর ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসি হাসি মুখে মৃছু হ্রেষাধ্বনি করে সুপ্রভাত জানায়।

ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যায়। পূবের দূর বড়ো জঙ্গলটার দৈত্যের মতো বিরাট প্রহরী গাছগুলোর পেছন থেকে টকটকে লালমুখো ছুষ্টু ছেলে সূর্যের উঁকি জেগে ওঠে। কি চটপটে ঐ সূর্যটা! উঁকি দিতে না দিতেই গাছের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে একলাফে এগিয়ে যায়। কিন্তু নির্মেঘ নীল আকাশের বিস্তারে পা দিয়ে গতিবেগ শ্লথ করে। যেন ছুষ্টু ছেলের মতোই মজা করে বলতে চায়,—আর ধরবি আমায়? ধর না।

পরাস্ত পৃথিবী পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মাখে না। সদ্য নিদ্রোত্থিতের সুপ্রসন্ন নেত্রোন্মীলনে সকৌতুকে নবজাত আলোক-শিশুর দিকে চেয়ে থাকে।

কাঞ্চনের দলাইমলাই শেষ হওয়া পর্যন্ত আজ আর অপেক্ষা করে না কনখল। ব্যাঙা আসতেই বলে,—চল বেরিয়ে আসি। ছুজনে রওনা দেয় শাহ্ জলালের দর্গা মুখো। রাস্তা নিরালা। এক আধটা বাংলো বাড়ী অনেকটা ঘেরাও জমির মধ্যে জবুথবু

বুড়োর মতো পিঠ কুঁজো করে উবু হয়ে বসে। কোনো কোনো বাড়ীর হাতায় সবে মরসুমী ফুলের প্রথম স্তবক ফুটতে শুরু করেছে। রসুই ঘরের চোঙা দিয়ে উনুনের ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে কোথাও। আণ্ঠাঘরের ময়দানে নিকারবোকার পরা বুড়ো এন্টনী সাহেব বিরাটকায় এক কুকুরের রাশ ধরে বেঁকে পড়ে ছুটছেন। ওঁর নাতনী জুলিবাবাও আর একটা মাঝারীগোছের সাদার ওপর কালো ফুট্‌ফুট্‌ ছাপ দেওয়া কুকুরের সাথে খেলছে একটা লাল বল ছুঁড়ে দিয়ে দিয়ে। কনখল শুনেছে বুড়োর কুকুরটা গ্রেট ডেন, আর জুলিরটা ডালমেশিয়ান। কুকুর দেখতে ওর বেশ লাগে কিন্তু পুষবার আগ্রহ এখনো মনে জাগেনি।

দূর থেকে দর্গার মিনার চোখে পড়ে, কিন্তু কনখল জানে এখনো অনেকটা রাস্তা। আজকের বেড়াতে বেরোনো অনির্দেশ লক্ষ্যে। কালকের মৃত্যুর কালো ছায়া ওর মনকে আদৌ অভিভূত করেনি। মা'র সঙ্গে কথা বলে মন আরো পাতলা হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর শোকের দিন মনে একেবারে রেখাপাত করেনি, তা নয়। নতুন মাসীকে কাঁদতে দেখেছে, জীবনকে কাঁদতে দেখেছে, পাড়ার গিন্নি-বান্নির, এমন-কি মা'র পড়ন্ত চোখে জল দেখেছে। একজন ছিল সে নেই, এতে কষ্ট কার না হয়? কিন্তু প্যারীবাবু বেঁচে থাকতেও ওদের কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিলেন না, মরে গিয়েও অভাববোধের তীব্রতা সঞ্চার করে যাননি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথে প্রথম পরিচয় যেন অকরুণ অপরিচয়ের ছদ্মবেশে, দেখা দিয়ে গেল। জাগ্রতজীবনের বিজয় অভিযানের মন্ত্র কানে দিয়েছেন নিভাননী, শিশুসত্তায় সেই বোধ কাজ করে।

হঠাৎ ব্যাঙা চেঁচিয়ে ওঠে—ছাখ ছাখ ছাগলটার বাচ্চা হচ্ছে। কিন্তু ও কি-রে, খুব কষ্ট পাচ্ছে যে।

বাচ্চা অর্ধেক বেরিয়েছে, কিন্তু পুরো বেরিয়ে আসছে না। ছাগল ঘাড় বেঁকিয়ে আধ-বেরোনো বাচ্চাটাকে যেন চাটবার চেষ্টা করছে।

কনখল এ দৃশ্য আগে দেখেনি। ও ভয় পেয়ে যায়। বলে—

তবে কি হবে ভাই, বাচ্চাটা কি মরে যাবে ?

ব্যাঙা বলে,—দাঁড়া, দেখি। একলাফে ব্যাঙা গিয়ে কোল পেতে বসে বাচ্চার দিকে। ছাগলের পেটে পিঠে হাত বুলোয়। খানিক পরে সুন্দর নধর একটি ধবধবে ছাগলছানা ভুঁয়ে পা দিয়েই থরথর পায়ে নাচতে কুঁদতে চেষ্টা করে, কিন্তু পড়ে পড়ে যায়। মা ছাগল বাচ্চার গা চেটে দেয়।

ব্যাঙার জামা কাপড়, গা হাত পা, স্রাবে রক্তে একাকার হয়ে যায়। কনখল বলে,—কি করবি এখন ?

—কি আর করব, চল বাড়ী ফিরে যাই।

—ওই বাচ্চাকে একা একা রাস্তার ধারে ফেলে ?

—আরে, ওর মা-ই ত রয়েছে। মা থাকতে বাচ্চা কখনো একা হয় ?

দু'জনায় বাড়ির দিকে ফেরে। এবারে হনহন করে চলে। ব্যাঙাকে গিয়ে চটকরে ছাপছন্দ হতে হবে। ও-পাশের পেঁপে গাছওয়ালা বাড়ীর দাওয়ায় এক বুড়োকর্তা কলকেয় ফুঁ লাগাচ্ছিলেন, তিনি আপন মনে বিড়বিড় করেন—ভাবার্থ তার এই যে এ সব চ্যাংড়া লজ্জাহায়ার মাথা খেয়েছে—এই বয়সে প্রসবের মতো একটা দুষ্য ও গোপনীয় ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছে, সমাজে শীলতা ভব্যতা আর কিছু রইল না। অপরাধী দু'জন ততক্ষণ এ সব মন্তব্য শোনার পাল্লার বাইরে।

যেতে যেতে কনখল বলে,—বাচ্চা হওয়া আগে কখনো দেখিনি ভাই। কিন্তু মা'টা কি কষ্ট পাচ্ছিল।

ব্যাঙা পোকপাখালী জীবজন্তুর জগতে বেড়ে ওঠা ছেলে—সৃষ্টি রহস্য নির্দোষভাবে সব জানা ওর। বলে,—আরে সবায়েরই বাচ্চা ঐ ভাবেই হয়, তাই বলে মা কি কষ্টের কথা মনে রাখে ? গরুর বাচ্চা হবার পর যাস ত বাচ্চার কাছে—অ্যায়সা শিং বাগিয়ে আসবে তেড়ে গরুটা—পালাতে পথ পাবি না।

ফিরতি পথে প্রচারক পরেশবাবুর সাথে দেখা হয়ে যায়। ব্যাঙার রক্তাক্ত পরিচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওঁর। পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা

শুনে গম্ভীর হয়ে যান তিনি। প্রজনন ক্রিয়ার একাংশের সাথে অপরিণত বয়স্কের সাক্ষাৎ পরিচয় যেন তাঁর সমর্থন লাভ করে না। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পদচালনা করেন। ব্যাঙা বলে—দেখলি বুড়ো কেমন গোমড়া মুখো হয়ে গেল সব শুনে? জানিস, বুড়োরা সব আড়াল করতে চায় আমাদের কাছ থেকে।

আড়াল করার কি আছে এতে, মাথায় ঢোকে না কনখলের। পরেশবাবুর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার অভাব ওর চোখ এড়ায় না।

সব মা'দেরই ত বাচ্চা হয়—পাখী মা, পশু মা, এমন-কি মানুষ মা'দেরও। তা না হলে ও নিজে হল কি করে? কিন্তু ঐ যে ব্যাঙা বলল, একভাবেই সবাই হয়? তবে কি সেও—ধেৎ! কেমন কান্না কান্না পায় কনখলের। ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। রহস্য উন্মোচনের অনুসন্ধিৎসা থেকে মনকে সবলে নিবৃত্ত করতে চায়।

বাড়ি ফিরে ব্যাঙা চলে যায় পুকুরঘাটে। তার বিপর্যস্ত বেশবাস ও গোপন পদবিন্যাস, খানা কামরার জানালা দিয়ে নিভাননীর চোখে পড়ে। কনখল এসে অভ্যস্ত চেয়ারে বসে। মা'র দিকে কেন যেন নিঃশঙ্ক সহজ চোখে তাকাতে পারে না। এ বৈলক্ষণ্যও নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কিন্তু কিচ্ছু বলেন না তিনি। নেহাৎ পদ্ধতি-মাফিক খাওয়া সেরে কনখল নিজের ঘরে চলে যায়। পড়ার বই খুলে বসে বটে, কিন্তু মন থেকে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নানা দুরধিগম্য গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায়।

বাঁধাধরা ছকে দিনমান কাটে। সন্ধ্যের পর মার কোলে মুখ গুঁজে মনোভাব লাঘব করে কনখল। নিভাননী চকিত হন, হয়ত চিন্তিতও। কিন্তু কে যেন ভেতর থেকে তাঁকে উত্যক্ত বা সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে নিবারণ করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছেলের মাথার চুলে আঙুল চালান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন,—সব জিনিস সব বয়সে শিখতে পারা যায়? দেখা যায়, হয়ত কিছু বোঝাও যায়, কিন্তু জানতে হলে বয়স হওয়া চাই, বিদ্যেবুদ্ধি বাড়া চাই।

কোল থেকে মুখ তুলে কনখল টলটলে চোখে হরিণবাচ্চার মতো

মার মুখের দিকে তাকায়। মা তার দিকে চেয়ে নেই। আপন মনেই বলে যান নিভাননী—চোখকান মেলে চললে কত কি নতুন জিনিস চোখে পড়বে। কিছুটা জানা, খানিক আধজানা, আর অনেক অজানা। আমার কংখ্ আমার কাছে জানতে চাইলে আমি সব বুঝিয়ে দেব। যতটা বুদ্ধিতে বেড় খাবে, ততটা।

এর পর সমস্ত প্রসঙ্গটা লঘু করে হেসে বলেন,—বাবা কি করে আপিসের কাজ করেন, বললে কি তুই বুঝতে পারবি? হরেনবাবু মামলা লড়েন আইনের জোরে সে সব আইনকানুনের মারপ্যাঁচ কি তোর মাথায় ঢুকবে? কলের গানে কত মানুষের গলার আওয়াজ শুনি আমরা, কি করে একখানা কালো চাকতির ভেতরে সব আটকা পড়ে আছে তার কৌশল কি ঝট করে বোঝা যাবে? কতো দেখতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, আর অনেক বড়ো হতে হবে—তবে তো! আচ্ছা, তুই এবার ইস্কুলের পড়াশুনা নিয়ে বোস—আমি একবার নতুন মাসীর খবরদারি করে আসি।

নিজের ঘরে এসে খাতাপত্তর খুলে বসে কনখল। পড়াশুনায় মন বসে না। আকাশ-পাতাল ভাবে—দানা বাঁধে না কোনো ভাবনা। মেঝেতে ব্যাঙা খোলা মোমবাতির সামনে বসে পড়ছে, ও পাশে রহমৎ আধভাঁজ কম্বলে বসে হাঁটুমুড়ি হয়ে ঝিমোচ্ছে। বাইরের বৈঠকের আলাপচারীর আওয়াজ কানে আসে—শুধু অর্থ-হীন শব্দ। মন চায় না সে সব কথার মানের পেছনে ছুটতে। কালকের মরণ, আর আজকের একটা জন্ম, মনের ভারসাম্যে দোলা দিয়ে গেছে, মন দুলছে বারান্দার দেয়ালঘড়ির ঝুলন চাক্তির মতো এদিক ওদিক, তাকে স্ববশে এনে স্থির করতে পারে না কনখল। ছেঁড়াছুটো টুকরো ছবির মতো কত কি দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। ক্লান্ত মাথা হাতে ভর দিয়ে চোখ বোজে কনখল, সদ্যজাত ছানাটার যখন গা চাটছিল ছাগলটা—কী নিবিড় স্নেহে তার চোখ দুটো অর্ধস্তিমিত হয়ে আসছিল, শুধু সেই ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ভেসে ওঠে।

২৪

জিজ্ঞাসা একটা ঘূর্ণির মতো। কী, কেন, তবে, তাহলে ? একটার পর একটা পাক খেয়ে ঘোরে মনের মধ্যে ; সে আবর্তের যেন কোনো শেষ নেই। অন্তর্লোকে জেগে উঠছে আর এক কনখল, যে কেবল জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে পড়ছে। বাইরের কনখল আগের মতোই হাসে, খেলে, খায়-দায়, স্কুলে যায়, কিন্তু থেকে থেকে অন্তর্মুখী হওয়ার বিড়ম্বনা এড়াতে পারে না। এই সদ্য উন্মেষোন্মুখ দ্বৈত-সত্তার ঘাতপ্রতিঘাত নিভাননীর চোখ এড়ায় না, যতক্ষণ কাছে থাকে, ব্যাকুল অভিনিবেশে ঘিরে রাখেন ওকে। মনকে চিরাচরিত সংস্কার থেকে মুক্ত করতে চান, ছেলের মনে যে আর একটা মানুষ জাগছে তাকে শাসন বন্ধনহীন মুক্ত হাওয়া-বাতাসে বিচরণ করতে দিতে চান। খাওয়া-শোওয়া বেশভূষার কড়াকড়ি শিথিল করেন না আদৌ, কিন্তু শেখবার, জানবার কৌতূহল অবারিত হাতে মেটাতে চান।

ধোঁকা লাগে। সব কি ঐটুকু ছেলেকে খোলাখুলি বলা যায়। তাই যখন কনখল ওঁকে শুধোয়—আচ্ছা মা, শুধু মা'দেরই বাচ্চা হয়, বাবাদের হয় না কেন ? হকচকিয়ে যান নিভাননী। আঁচে বোঝেন, সেই সেদিনকার ছাগলছানার জন্মকথা ছেলেমহলে অনালোচিত থাকে নি। নানান বয়সের, নানান ঘরের ছেলেরা একসাথে ঘোরা-ফেরা করে। বয়স্ক কারো কাছে কিছু শুনেছে কনখল, কিন্তু বোঝেনি কিছুই। এ প্রশ্ন তার নিষ্পাপ সরল মনের অদম্য জ্ঞানপিপাসা মাত্র। ফুলের রেণুর উদাহরণ, মৌমাছি প্রজাপতির দৌত্য, এই সব মনোরম আখ্যায়িকা ফেঁদে তখনকার মতো প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যান ছেলের মন। কিন্তু বোঝেন, শক্ত পরীক্ষা সামনে। কোন দুর্ভেদ্য বর্মে

এ দুর্বার প্রশ্নবান ব্যাহত করবেন ভেবে আকুল হন। বাগচি শিক্ষায় আহারে বিহারে বেশভূষায় সংস্কারমুক্ত, হয়ত কিছুটা বা মননেও। কিন্তু সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অপরিণতমস্তিষ্ক অপ্রাপ্তবয়স্কের সাথে রাজী হবেন কিনা, সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। আধুনিকতার তবকমোড়া বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি সাবেকপন্থী নীতিবিদ বাস করে বাগচির অন্তরে, তার কাছে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। নিভাননীর মনশ্চক্ষুতে দেবপ্রতিম হাজী সাহেবের জ্যোতির্ময় মুখ জাগে। তাঁর কাছেই পথনির্দেশ নেবেন তিনি, সেই সত্যসন্ধ ঋষিপ্রতিম জ্ঞানীর কাছ থেকে।

সান্ধ্যনামাজের পর যখন হাজী সাহেব একা পায়চারি করেন চবুতারার ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায়, নিভাননী এসে পৌঁছে যান। বাগচি আর কনখল জাফর ডাক্তারের বাড়ী গেছে, উনিও ফিরবেন সেখানে। আশীর্বাদ বর্ষণ করে হাজী সাহেব বলেন,—মা'কে উতলা দেখছি যেন? মন অশান্ত হয়েছে বুঝি?

শোনেন নিভাননীর সমস্যার কথা। কালেজী তকমা না থাকলেও তাঁর নিভা মা সুশিক্ষিতা জানা ছিল তাঁর। যে প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনা করতে এসেছেন আজ, জানতে পেরে মনে মনে তারিফ করেন। যেন একজন সমবয়সী সতীর্থের সাথে কথা বলছেন, তেমনিভাবে বলেন,—বেশ ত, এ বিষয়ে কি জানতে চাও তুমি?

—যে বিষয় আমাদের দেশে পরমবন্ধুরাও নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করে না, মা হয়ে আমার ছোট ছেলের সাথে কি বলব আমি তার সম্বন্ধে, এইটুকু বুঝে উঠি না বাবা।

নীরবে পুরো এক চক্কর পাক দেন দু'জনায় চবুতারা ঘিরে। তারপর হাজী সাহেব যেন আপন মনেই বলে যান—মূল দোষ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির, বাড়ির, স্কুলের, সঙ্গীসাথীর। অনাবিল শিশু-মনে প্রথম প্রবৃত্তি জাগে লোভ আর রাগ। খাবার চুরি, ফুল চুরি, ছবি চুরি নিজের অজানতে করে বসে ছেলেরা। শাস্তি পায়, শিক্ষা

পায় না। রাগারাগি মারামারিও ঐ এক ফল। মনের সাহচর্য দিতে কেউ এগিয়ে আসে না। না বাপ-মা, না গুরুমশায়েরা। শাস্তিতে ত শুধু ভেতরে ভেতরে জেদ জমে ওঠে। একটু অনবধান হলেই আবার বিচ্যুতির রাস্তায় পা বাড়ায়। বানের জল যেমন বালির বাঁধ মানে না। তোমার আজকের বিষয় কিন্তু শিশুর বেলায় কোন কুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত নয়। নিছক কৌতূহল। গোপন আড়ালের সাথে প্রথম পরিচয়ের দ্বিধা-ভয় আগ্রহ মেশা। বয়স বাড়ার সাথে এ জিজ্ঞাসা প্রবল প্রবৃত্তির রূপ নেবে, যদি না এখন থেকে ঘোলা মনকে তরল করে দেওয়া যায়। সহজ সরল ভাষায় ওকে খুলে বলতে হবে প্রশ্নের উত্তর—মায়ের আবেগ ভালোবাসা মিশিয়ে নয়, অনাত্মীয় অথচ মঙ্গলকামী গুরুর মতো। পারবে?

—কিন্তু—

—বলছি। শক্ত হতে হবে নিজেকে। দূষ্য জিনিসের কোনো সহজাত আকর্ষণ নেই শিশুমনে। অজ্ঞতায় তার উদ্ভব, পারিপার্শ্বিকে বৃদ্ধি। কুশিক্ষা আর মূঢ় বাধা তাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় মাত্র। জ্ঞানবিজ্ঞানের আর পাঁচটা কথার মতো স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে হবে। বয়স যত বাড়বে, পরিচয়ের বিস্তারও বাড়বে। কুৎসিত ইঙ্গিতের কিম্বা অশ্লীল দৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য হবে না কোনো দিন। কিন্তু আজকের নির্ভীক শিক্ষা সেদিন বাঁচাবে ওকে সমস্ত কলুষ বোধ থেকে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিভাননী বলেন,—তাই হবে বাবা। আমার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করব।

—শুধু চেষ্টা নয়, তুমি সফল হবে। মা, আমি সংসারবিরাগী দেওয়ানা মানুষ। কিন্তু আমি দেখেছি, আশ্চর্য মানুষের মনের পরিণতির ক্রমগুলো। বাল্যে, কৈশোরারম্ভে,—স্বচ্ছ, অনাবিল ও প্রৌঢ় বয়সে প্রবৃত্তির তাড়না অন্ধ করে চৈতন্যকে—ফেনিল কর্দমোচ্ছ্বাসে সব পঙ্কিল করে দেয়। আবার বার্ধক্যে, কতো ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহমিলন, কান্নাহাসির অভিজ্ঞতায় থিতিয়ে পড়া পলির

ওপর জাগে শান্ত, স্থির, কাকচক্ষু জলরাশি। মন তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। কিন্তু জেনো, অগণিত মানুষের অগণন চিন্তাধারা অগণন কর্মপদ্ধতি। প্রতি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অগণনরূপে। নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে নিজের কাজ করে যাবে, ছেলেও দেখবে নিজের বুদ্ধি, বিচার, স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠবে। নিজেকে চাপাবে না তার ওপর। তোমার ছাঁচে, কি আর কারুরও ছাঁচে তাকে গড়তে চেষ্টা কোরো না, তাকে তার নিজের মতো গড়ে উঠতে সাহায্য করবে মাত্র। যে চারাগাছ প্রাচীরের আড়ালে মাথা জাগাচ্ছে, তুমি আড়াল সরিয়ে আলো বাতাস আসবার রাস্তা করে দেবে, মমতা দিয়ে জমিকে সরস করে রাখবে, শিশুচারা আপনা থেকেই বিশাল গাছে পরিণত হবার পথে পা বাড়াবে।

এক দমে এ… কথা বলে থামেন হাজী সাহেব। নিভাননীরও বুকের ভার অনেক পাতলা হয়ে যায়। বড়ো রাস্তার মোড়ে বাগচি ও কনখলের দ্রুত পদক্ষেপ নজরে পড়ে। এই দিকেই আসছেন ওঁরা।

হাজী সাহেব বলেন,—একটু আগেই মানুষেব মনের ক্রম-পরিণতিব কথা বলেছি। ছোট ছেলের মন ঝরনাধারার মতো খরস্রোত—থেমে থাকবে না কিছুতেই। আজ এ কৌতূহল, কাল ও জিজ্ঞাসা, ছোটখাটো প্রতিবন্ধকের মতো মাথা জাগাবে। কিন্তু প্রবল জলস্রোতে সব ভেসে যাবে। চলাই তার জীবন, তার চলবার পথ সুগম করে রাখা হিতৈষীর কাজ। তোমার চেয়ে তোমার ছেলের বড় হিতৈষী আর কে আছে, বল?

বাগচিরা এসে পড়তে ওঁদের প্রসঙ্গ শেষ হয়। যথারীতি অভিবাদন আশীর্বাদের পর আর কিছুক্ষণ পায়চারি করে ওঁরা ঘরে এসে বসেন। হাজী সাহেবের নিজের ঘরের পাশের ঘরটায় নানাবিধ কাঁচের পাত্রে, নানা রকম শুকনো আর চিনিজমানো মেওয়ার সংগ্রহ আছে, জানা আছে কনখলের। ও উসখুস করে। হাজী সাহেব যেন সর্বজ্ঞ। আভাসেই বুঝে নেন ওর মনের কথা। গম্ভীর গলায় হাঁক দেন—গোলাম রব্বানি,—

কুর্ণিস করে খাস বান্দা এগিয়ে আসতে কনখলকে তার হাতে সঁপে দিয়ে ইঙ্গিতে ইতিকর্তব্য বুঝিয়ে দেন। ওরা চলে যেতে নিভাননী হেসে বলেন,—আপনার সব দিকে নজর। হাজী সাহেব নীরবে হাসেন শুধু। বাগচিকে বলেন,—জাফরের বাড়ীর হাল কি দেখে এলে ?

—লোকে জনে সরগরম। আয়েষার বিয়ের কথা পাকা হতে দেশদেশান্তর থেকে অনেক আত্মীয় কুটুম এসে গেছেন। পাত্তা পাওয়াই শক্ত। বিয়েতে খুব ধুমধাম হবে বলে মনে হয়।

—আহা, তা ত হবেই। জাফরের ঐ একমাত্র সন্তান, আর বরও পেয়েছে তেমনি! খাসা ছেলে আব্বাস সাহেব। বলে চোখ বোজেন হাজী সাহেব। অস্ফুট স্বরে উর্দু কি পারসীতে কি যেন আউড়ে যান, বোধ হয় আশীর্বাণী।

নিভাননী বলেন,—কংখের খুব একা একা লাগবে ও বিয়ে হয়ে চলে গেল। দুটিতে খুব ভাব হয়েছিল কিনা। আয়েষার ত কনা-গত প্রাণ। সেই জলে ডোবার পর ও যা করেছিল, আমি মা হয়েও তা পারতাম না। আবার ঝগড়া-ঝাটিতেও দু'জনে কেউ কারো কম নয়। এখন শ্বশুর ঘর যাবে, তার ওপর জামাইয়ের বদলীর কাজ, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

হাজী সাহেব বলেন,—টান থাকলে দেখা হবেই! কিন্তু কবে কখন—সে এখন কে বলবে। কনখল নিশ্চয় ভাবছে, আর পাঁচটা জিনিসের মতো বিয়েটাও একটা মজার খেলা। খেলার শেষে ওরা দুটিতে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাত সর্বত্র। তিনি যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

কনখল ফিরে আসে। আখরোট, খোবানী, জর্দা আলু, মনাক্কায় দু'পকেট ভর্তি। এসেই বলে—এই পকেটটায় সব আয়েষার জন্যে। জানো মা, ওপরের ঘরে কত যে ফল আছে, গুণে শেষ করা যায় না। তাও ত আমি আপেল এই একটা ছাড়া নিইনি। যা বড়ো বড়ো।

হাজী সাহেব হেসে বলেন—বেশ ত। আপেল তোমার মন

টেনেছে। ভগবানের কাছে জোর প্রার্থনা লাগাও, দেখবে, দেবদূত গিয়ে বাড়িতে অনেক রেখে এসেছে। আর কাঠের বাক্সে তুলোয় জড়ানো টসটসে আঙুর।

কনখল পুলকিত হয়ে বলে,—তাহলে ত বেশ হয়। চোখ বুজে সত্যিই প্রার্থনা করে কনখল। হাজী সাহেবের কথা কখনো মিথ্যা হবে না। তারপর বলে—যাবে না মা ও বাড়িতে? আয়েষাটা কেমন হয়ে গিয়েছে। নিজে গিয়ে দেখবে চল। ঘাগরা পেশোয়াজ পরে চোখে সুর্মা এঁকে বেগম সেজে বসে আছে ঘরের কোণায়। আমি গেলাম ত কেবল ফিকফিক করে হাসে। আর ছোট বড় কত যে মেয়ে জুটেছে।

বিদায় নিয়ে বাগচিরা ওঠেন, আবার জাফর-ভবনে যাবার অভিলাষী হয়ে। ভগবানের কাছে কনখলের ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করতে ঝুড়ি মাথায় গোলাম রব্বানী রওয়ানা দেয় চুপিসারে ভিনরাস্তায়।

পুলিশ হাসপাতালেব টিলায় পৌঁছে নিভাননী সোজা যান অন্দরে। কুলসম এক-পাল ফুফু চাচী ভাবীব তদ্বিরে ব্যস্ত। গিয়েই বলেন,—কি লো, মেয়ে-বিয়ের উল্লাসে আমাদের ভুলেই রইলি যে একেবারে?

—আর দিদি,—বাড়ী-ভর্তি আত্মীয়কুটুম, সময় পাই না একেবারে।

—তা সত্যি। মেয়ে কোথায় লো, সেও ত ডুমুরের ফুল হয়েছে আজকাল।

কুলসম নিভার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেন,—এঁরা আসবার পর মেয়ের কড়া আবরু। ঘর থেকে বেরোনো পর্যন্ত বারণ। ওই ফ্লোরেন্স বিবি যখন আসে, তখন খালি তার সাথে বাড়ীর পেছনে একটু বেড়াতে পায়। আমার চাচীশাশুড়ীর ভারী কড়া নজর। অসৈরন হবার জো-টি নেই। আর জানেন ত দিদি, এঁরা সব গাঁয়ের মানুষ, এঁদের কায়দা-কেতাই আলাদা।

নিভাননী বলেন,—তা আর জানিনে। দেখতিস যদি আমাকে পুজোর সময় গাঁয়ের বাড়ীতে। জামা সেমিজ নেই, একগলা ঘোমটা টেনে কেবল ফাইফরমাস খাটছি বড়-ভাজদের। তা, ঐ কটা দিনই ত, মানিয়ে নিয়েছি কোনো রকমে।

তা মানিয়ে নেওয়া নিভাননীর আসে বটে। যে আধ ঘণ্টা রইলেন ওবাড়ী, তার মধ্যে করিমের মার ঘর গেরস্তালীর খবর থেকে শুরু করে কুলসমের দূর সম্পর্কের ননদ মরিয়মের বে-আক্কেলে খসমের দস্যুরা সাদীর হদিস পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বার করে নিলেন। তালাক দিলে মরিয়মের বারদিগর নিকা বসবার কোন তকলিফ নেই, এ খবরও অজানা রইল না নিভাননীর। কিন্তু মরদ ভারী মৎলবী, তালাক দিতে নারাজ। মরিয়মের নিজের নামে ছাতকে একটা কমলা বাগানের আধেলা অংশ আছে, মোটা আয়ের সম্পত্তি।

জাফর সাহেবের বুড়ী নানীকে হামলদিস্তায় পান ছেঁচে দিয়ে, খাদিজা আর ফতিমা দুই বোনকে বিবিখোঁপা বেঁধে দিয়ে সব আগন্তুকের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে বাগচিরা যখন ওঠেন, তখন রাত হয়েছে। একপাল মেয়ের মধ্যে কনখল নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। একান্ত সাথী আয়েষা যেন বেদখল হয়ে গিয়েছে মনে হয় ওর। ইচ্ছে থাকলেও তার কাছে ভেড়ে না। পোলো ময়দানের ওপর টিলার ধারে ধারে একা একা ঘুরে বেড়ায়। রুদ্ধ অভিমানে ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে উদ্গত অশ্রু থামায়। মনের মধ্যে একটা বাতিল করে আরেকটা, অনেক প্রতিজ্ঞা বুদ্বুদের মতো ওঠে আর মেলায়। সব কটাই আয়েষাকে নিয়ে, কি করে ওকে জব্দ করা যায় সেই মতলবে। যখন বাড়ী ফেরবার ডাক আসে তখন পাকাপাকি মনস্থির প্রায় হয়ে গেছে। আয়েষা এরপর যেচে কথা কইতে এলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে যেন শুনতেই পায়নি এই ভান করে। কিন্তু আড়াল থেকে চুপিসারে দেখতে হবে আয়েষারও ঠোঁট ফুলে উঠছে কিনা।

২৫

দিল্লী দরবারের রেশ সুদুর মফঃস্বল শহরগুলোকেও অল্পবিস্তর উৎসবমুখর করে। কুচ-কাওয়াজ, খানাপিনা, ক্ষুদে দরবার সিলেটেও হয়। ছেলেদের ধোপদস্ত জামা-কাপড় পরে রুল ব্রিটানিয়া গাইবার জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে জমায়েৎ করা হয়। দুটি কমলালেবু, একটি সন্দেশ মহোল্লাসে খায় ছেলেরা। প্রত্যেকেই একটি করে জর্জমেরির মুখ খোদাই করা তামাব মেডেল পায়, সে আমলের ডবল পয়সা সাইজের। ওই মেডেল নিয়েই ছোট্ট একটি ঘটনা কনখলের মনে গভীর বেখাপাত করে।

গীতা সোসাইটির পাণ্ডাদের ওপর ফতোয়া ছিল মেডেল নেবার। নিলেও বুকে ঝুলিয়ে কেউ না আসে, সেদিকে নজর দেবার নির্দেশ ছিল। এ সব কনখলের জানা নেই। তাই অমৃত, নিবারণ, অমূল্য মেডেল নিল কি নিল না, নিলেও কি করল, খেয়াল করেনি। ঝকঝকে মেডেল লাল-নীল সাদা ইউনিয়ন জ্যাকের রং-এর রিবন সমেত বুকে ঝুলিয়ে আর সবার সাথে সে বাড়ী ফেরার পথ ধরে। দলে অমৃত নিবারণ ব্যাঙা আর কনখল।

মায়াদিদের বাড়ীর পেছনের পুকুর কাছটায় এসে নিবারণ বলে —তোকে বেশ মানিয়েছে রে কণা। চাপরাশীদের যেমন চাপরাশ, তোর বুকেও তেমনি গোলামির ছাপ। ব্যাঙা, তোরও।

এ সব কথা নিবারণের নয়, সোসাইটির পাণ্ডাদের। নিবারণ আউড়ে যায় খালি। একটু হতভম্ব হয়ে থেকে কনখল লক্ষ্য করে দেখে মেডেল অমৃত কি নিবারণ কারোও বুকে ঝুলছে না। থতমত খেয়ে বলে,—তা আগে বললি না কেন? তা'লে—

—কি করতিস তা'হলে? পারতিস না ঝুলিয়ে? তোর বাবা যে সাহেবদের চাকর—

—এই ও নিবারণ—মুখ সামলে কথা বলবি—গর্জে ওঠে অমৃত।

অমৃত কনখলের অকৃত্রিম বন্ধু, তার ওপর বয়স আন্দাজে রীতিমত শক্তিমান। নিবারণ অপ্রতিভ হয়ে বলে,—বারে, স্বামীজিই ত বলেন,—

—অমন কবে স্বামীজি কখখনো বলেন না।

নিবারণ মুখ কাঁচুমাচু কবে বিড়বিড় কবে—বলেন না আবাব। সেদিনই 'ত বলছিলেন আরো কত কি—

এইবার নিবারণেব কাঁধ ধবে ঝাঁকুনি দিয়ে অমৃত বলে,—বল, আর কি বলছিলেন –

সভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ কবে নিবাবণ। বলে,—শুধু স্বামীজি কেন, প্রকাশদার মাও ত সেদিন বলছিলেন, ওবা সাহেবদেব পা-চাটা, আর যতো ভাব সব মছুনমানদের সাথে—মছুনমানেব রান্না খায়, জাফর ডাক্তারের মেয়েটা ত—

অমৃতর একটি বিরাশী সিক্কায় বাকরোধ হয় নিবারণের। ওব কান ধরে অমৃত বলে,—ফ্যাল, থুতু ফ্যাল এই জায়গায়—

আদেশ পালন করতে বিলম্ব হয় না নিবারণের। আবার হুঙ্কার দেয় অমৃত—চাট,—চেটে তোল ওই থুতু—

অসহায় নিবারণ লগুড়াহতের মতো এ হুকুমও তামিল করে। অমৃত ওর কান ছেড়ে দিয়ে বলে,—যা—বাড়ী যা। ফের যদি এমন কথা শুনি তোর মুখে, আস্ত রাখব না জানিস। চল রে কণা —ওকি, তুই কাঁদছিস?

মুখে একটুও শব্দ নেই, চোখের জলে দু'গাল ভেসে যাচ্ছে। কনখল নিজের মেডেল ব্যাঙার মেডেল খুলে তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরে। চোখ মুছে ধরা গলায় বলে,—না কাঁদছি না। চল যাই।

ব্যাঙা অতশত কিছু বোঝে না, ওদের সাথ ধরে।

অমৃত বয়সে ওদের থেকে একটু বড়ো—আর বোঝেও বেশী। ও জানে সিলেটের গোঁড়া হিন্দুদের অন্দর-মহলে বাগচিদের চাল-চলন নিয়ে অনেক বিরূপ আলোচনা হয়। ওদের গীতা সোসাইটির মুরুব্বীরাও গোঁড়া হিন্দু। শুধু সেবার কাজে ধর্মাধর্মের বালাই নেই। আর সব তাতেই নিষ্ঠার সাথে দেব-দেবতা, পূজো মন্তর মানা হয়। বিপিন কার্লাইলকে শাস্তি দেবার ভারও যে নিয়েছিল, মন্তর পড়ে কালীমূর্তির সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে তাকে। এই সিলেটের কে একজন, বিপিন পাল না কে, কলকাতার ইংরেজি কাগজে লিখেছে 'ন্যাংটা কালী রক্ত চায়'। তাই নিয়ে স্বামীজি গোপন সভায় তার মানে বুঝিয়েছেন সোসাইটির বড় বড় সভ্যদের। সেখানে অমৃতের এখনো প্রবেশাধিকার হয়নি, তবে ও জানে। ও সব দেশের কাজ, গোপনে করতে হয়।

বাড়ী গিয়ে মন মরা হয়ে থাকে কনখল। যা হোক করে, কিছু খেয়ে, পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে। ব্যাঙাকে ডাকে না—বাইরে খেলার দলেও যোগ দেয় না। এড়িয়ে চলে নিভাননীকে, কাছে গেলেই মা ধরে ফেলবেন।

বিস্বাদ হয়ে যায় সমস্ত দিনটা। বিয়েব কথা হয়ে আয়েষা পর হয়ে যাচ্ছে। আয়েষা, আয়েষা, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, আয়েষা। নিবারণের কথার খোঁচায় কনখলের ছোট্ট জীবনে প্রথম অপমান-বোধ জাগে মনে। মুসলমান, সাহেব আর হিন্দুরা কি আলাদা জীব নাকি? সবাই ত মানুষ। কেউ আবার মানুষের চেয়েও বড়ো। যেমন হাজী সাহেব। আর দেশের রাজা ত সব রকম লোকই হয়। হিন্দু-মুসলমান সব রকম রাজা-বাদশার কথাই বইয়ে পড়া আছে ওর। এখন না হয় সাহেবরা রাজা, পরেও থাকবে, তার কি কিছু ঠিক আছে? হয়ত মুসলমান, না হয় হিন্দু, আবার রাজা হবে। তখন যারা রাজার অধীনে কাজ করবে, তাদেরও পা-চাটা বলে ঘেন্না করবে সবাই? বুঝে ওঠে না কনখল। কেমন সব গুলিয়ে যায়।

বাবা সাহেবদের চাকর। নিবারণটা বলে কি? তা হলে

হ্যাসেট কখনো মা বাবার সাথে একসাথে বসে চা খেত? ওকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে পোলো খেলতে দিত? শুনেছে, বাবা রাজকর্মচারী। রাজা থাকে বিলেতে। হ্যাসেটও রাজকর্মচারী। কেউ বড়, কেউ ছোট। বেণী দারোগাও রাজকর্মচারী। বেণী বাবাকে দেখলেও যেমন স্যালুট ঠোকে, হ্যাসেটকেও তাই। বাবা ত হ্যাসেটকে স্যালুট করেন না, বলেন—গুড মর্নিং সার। যারা বেশী জানে, নীচের লোকেরা তাদের সার বলে। স্কুলের সব সারকেই ত ওরা সার বলে। শুধু জানা নয়, বয়েসে বড়ো হলেও তাদের সাথে সম্মান করে কথা বলতে হয়।

সাধ্যায়ত্ত নানা যুক্তির সান্ত্বনাতেও সুস্থির হয় না মন। কি যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে নিবারণের কথাগুলো, নিভতে চায় না। প্রকাশদার মায়ের মুখে কিছুদিন আগে শোনা গুটিকয় কথা আজ নতুন মানে নিয়ে মনে পড়ে যায়। বিপিন কার্লাইলকে বদরপুর ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনে, কে বা কারা যখন ধাক্কা মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল, সেই সময়কার কথা। আভাসে ইঙ্গিতে পরে জেনেছে তারা কারা। প্রকাশদার মায়ের সেই কথাগুলো তারই পূর্বাভাস, আজ জানে কনখল।

সেদিন কথকতা শুনে ফিরছিল একটু রাত করেই। অমৃত ওর সাথে। প্রকাশদের বাড়ীর খিড়কি দিয়ে রাস্তা কম হয়—সেই দিক দিয়েই আসছে ওরা। অমৃত হন হন করে এগিয়ে গেছে। কনখল বেশ খানিকটা পেছনে। প্রকাশদার মায়ের চাপা আওয়াজ ওর কানে এল,—

—না, অমৃতকে দিয়ে হবে না। ও ছেলেমানুষ, তাছাড়া মন্ত্রগুপ্তি হয়নি।

অমনি চাপা গলায় পুরুষকণ্ঠের জবাব শোনা গেল—দীক্ষা দিইয়ে নেয়া যাবে, তাতে আটকাবে না। আর কাজটাও অল্পবয়সী ছেলেদের দিয়ে হওয়া ভালো।

—না, বিপিনবাবুর স্কুলের ছাত্র ও, চিনে ফেলবেন।

—চেনবার পর আর কিছু বলবার অবস্থা নাও থাকতে পারে বিপিনের।

—না, না। অমৃত ওই সাহেব ঘেঁষা বাড়ীর ছেলেটার পরম বন্ধু। কোথায় কখন পাঁচ কান হয়ে যাবে—সবসুদ্ধ হাতকড়ি পড়বে।

আর শুনতে পায়নি কনখল। অমৃতর হাঁকে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরেছিল। তখন আর কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিল যে হাতে হাতকড়ি পড়বার ভয় আছে এমন কোনো গোপন কাজের ভার দেওয়ার লোক বাছতে হচ্ছে। অমৃত ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই অপরাধে তাকে কাজ দিতে প্রকাশদার মায়ের আপত্তি।

পরের ঘটনায় কনখলের জানা হয়ে গেছে, সে কি কাজ। বিপিনবাবু ট্রেন থেকে পড়ে শুধু আঘাতই পেয়েছেন, প্রাণে মরেননি। কিন্তু প্রাণে মারবার মতলবই ছিল প্রকাশের মায়ের। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর এই সব সর্বনেশে কাজের সর্দারনী কিনা ঐ মহিলা। প্রথম দিন দেখেই ওঁকে ভালো লাগেনি কনখলের। কদমফুল ছাঁট দেওয়া সুগৌর মুখমণ্ডলে কেবল খড়গের মতো টিকোলো একটি নাক, চেরা চাপা ঠোঁটে সমস্ত অভিব্যক্তি অবরুদ্ধ অস্থির দামিনীর মতো চোখের তারায় মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণ, দাহ্য ও দাহিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবশ্যম্ভাবী অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস, এই সবকটি লক্ষণই যেন জাজ্বল্যমান তাঁর চঞ্চল চরণক্ষেপে, অস্থির হস্তসঞ্চালনে, উদ্ধত গ্রীবাউত্তোলনে কিশোর কনখল ভয় পেয়েছে।

নিজেকে নগণ্য, অপদার্থ মনে হয়েছে সেদিন কনখলের। কী এমন কাজ, যা কনখলের বন্ধু বলেই করবার অযোগ্য হয়ে গেল অমৃত?

পরে, বিপিন কার্লাইলের ঘটনা সব জেনে, ওর মনে হয়েছে, যে কারণেই হোক, ওই ডাকাতনী যে অমৃতকে কাজের ভার দেয়নি, সে ভালোই হয়েছে। কাজটা ত ভারী। চলন্ত ট্রেন থেকে একটা লোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া, তারপর সে বাঁচুক আর মরুক। নিন্দার, হিংসার, অপরাধের—ওই কাজের ভার থেকে তার বন্ধুত্ব অমৃতকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, এই আত্মপ্রসাদে তুষ্ট কনখল।

কিন্তু সেদিন? সেদিন আত্মাবমাননা আত্মধিক্কার এনেছিল, আত্মগোপনের চেতনাও ধীরে ধীরে জেগেছিল। মার কাছে কোনো দিন কিছু লুকোয়নি, সেদিন লুকিয়েছিল। আয়েষার কাছে কিছু লুকোতে পারে না, সেদিন পেরেছিল। বিয়ের কথা উঠে আয়েষা দূর হয়ে গেছে, মেলামেশা সহজ সাবলীল নয়। জীবন কাহিনীর প্রাথমিক কোনো এক অধ্যায়ে সেদিন যেন কে, বড়ো বড়ো ছুটো দাঁড়ি টেনে দিয়েছিল। কিছু নিজের না রেখে নিজেকে উজাড় করে দেবার পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হবার প্রথম পাঠ নিয়েছিল সেদিন।

পার্টিশন রদ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে উঠে গেছে। বাগচির বদলি যিনি আসছেন, তাঁর নাম শুনে সাহেব বলে মনে হয়, কিন্তু বৈকালিক বৈঠকের রহস্যালাপ থেকে কনখল আবিষ্কার করেছে যে লোকটি কালা আদমী এবং উগ্র রকমের সাহেব। হ্যারিস হার্কার যে শ্রীহবি সরকার সে কথা নামধারী হয়ত ভুলতে চেয়েছেন, কিন্তু দেশবাসী ভোলেনি এবং খাস সাহেবরা ঘৃণ্য জীব বলে ভাবতে শুরু করেছে। ওরা মিশনারী পাঠিয়ে লোককে কেরেস্তান করে, স্ত্রী স্বাধীনতায় মেমের অনুকরণ করতে বলে, কোট-টাই-পাৎলুনে শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিত করার মতো অঙ্গভূষণ নামের ফিরিঙ্গিপনায় আমোদ অনুভব করে এবং সরকারী দয়াদাক্ষিণ্য কিঞ্চিৎ বর্ষণ করে থাকে। আদতে আমল দেয় না।

হার্কার সাহেবের দোষের মধ্যে তিনি বিলেতে গিয়েছেন, এবং কৃষিবিছার বৃত্তি পেয়ে নব্য বাঙালীর কাম্য পদ লাভ করেছেন। চলিত ঠাট্টার কালাপানিতে ডুব দিয়ে আসার অজুহাতে রংটা নিকষ না হোক কৃষ্ণ কালো হয়ে গেছে। পিতৃদত্ত নামের সার্থকতা বর্ণেই মালুম।

হার্কার সাহেব আজ এসেছেন, এবং ভ্রাম্যমাণ জেলাজজ লাল-ওয়ানীর বাড়ীতে উঠেছেন। তিন চারটে জেলা নিয়ে একজন করে জজ, বছর ভাগ করে তিন-চার জেলায় ঘুরে বেড়ান। তবু প্রত্যেক জেলা শহরেই একটি করে জজের বাংলো আছে। লালওয়ানী

প্রবীণ সিভিলিয়ান এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে লণ্ডন সফরের সময়ে হার্কারের সাথে পরিচিত ছিলেন। হার্কার অবিবাহিত এবং লালওয়ানী প্রোষিতভার্যা। তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুরাট নগরে আছেন। স্বামীর অবসর গ্রহণের বিলম্ব নেই তাই স্বদেশে ঘরকন্না গোছানোর ভার নিয়ে, সাময়িক বিরহযাপন করছেন।

জজসাহেব সদালাপী লোক। অফিস অন্তে তাঁর ওখানে সরকারী বেসরকারী মজলিসি মানুষের সমাগম হয়। বাগচি ও হরেনবাবুও গিয়ে থাকেন। আজও গিয়েছিলেন। মস্ত বড়ো বাগানওয়ালা বাংলোবাড়ি, বাড়িব পেছনে বেশ অনেকটা দূবে বাবুর্চিখানা এবং আনুষঙ্গিক আরো দুটো একটা ঘর। সেইদিকেই আস্তাবল এবং খিড়কি দরোয়াজা। বাংলোর সামনে ঘেরাও করা গোল বাগানের দু'মুখে দুটো গেট। লাল সুরকির অর্ধচক্রাকাব রাস্তাটির পাড়ের আঁচল ভুঁই চাঁপা ফুলের কেয়ারীখচিত।

মজলিসটি বসে একটি দশাসই শিরীষ গাছতলায়, ওটা বাগানের একটেরে। আটদশখানা বেতের কুর্শী পড়ে এবং প্রচুর নির্দোষ পানীয় ধুপের সদগতি হয়। গরমের দিনে সরবৎ এবং অন্যসময়ে চা কফি ইত্যাদি। কোনো বিশেষ উপলক্ষ না ঘটলে খাদ্যের আয়োজন হয় না। লালওয়ানী সাহেব উগ্রপানীয়বিলাসী নন, কাজেই সাহেব সমাজেও কিছুটা অপাংক্তেয়।

আজ কথা উঠেছে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং প্রত্যেকেরই প্রতিমূর্তি থাকা সম্ভব, এই সম্ভাবনায় নবাগত হরি সরকার (Haris Harker) মারমুখী হয়ে বক্তৃতা করছেন। হরেনবাবু পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। মোটামুটি আলোচনা এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। হরেনবাবু বলেন, পৌত্তলিকতার আবশ্যক এই জন্য যে দেবতা তৈরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাজসরঞ্জাম মাটি ছাড়া আর কিছু সহজ প্রাপ্য নয়, এবং প্রতীকের মাধ্যমে দেবভাবের কল্পনা সাধারণের পক্ষে অনায়াস-সম্ভব। গৃহত্যাগী যোগী ধ্যান-যোগে নিরীশ্বরের কল্পনা করতে পারেন, ক্ষেত্র পরিবেশ এবং সাধনা

অনুকূল হলে। সংসারে সবাই যখন সারাক্ষণ শতকর্মে রত, এবং প্রতি কর্মের উপলক্ষই সাফল্য লাভ, তখন দেবপূজার জন্যে ফললাভের প্রতীক গড়তে দোষ কোথায়? পৃথিবী আমাদের কাছে মূর্ত, ঘরসংসার খুঁটিনাটি কেউ অরূপ নয়, রূপ গ্রহণ করবার জন্যে প্রকৃতি প্রাণপণে চলেছে, চারা থেকে মহীরুহ হচ্ছে, ক্ষীণ জলধারা মহাসাগর হচ্ছে, প্রকৃতির লীলাকে মানুষ কল্পনায় মানবিক গুণসম্পন্ন করে ভাবতে চেয়েছে। এই ত আমার মনে হয়।

হার্কার অশিষ্ট ভাষণে বলে—ড্যাম বিগট্রি। আইডোলেটরস আর ষ্টোন এজ পিপল।

লালওয়ানী শান্তস্বরে বলেন,—যদি ষ্টোন এজ এখনও থেকে থাকে। এই ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও হিন্দু নেই, এবং পশ্চিমী আলোক সবে দেশে প্রবেশ করেছে। এদেশের হিন্দুদের প্রতীক ছাড়া আর কি অবলম্বন হতে পারে? মুসলমান বিশ্বজয় করেছিল, সাহেবরাও করেছে। পার্থিব পরমপ্রাপ্তির আস্বাদ তারা পেয়েছে এবং চরমপ্রাপ্তি নিরীশ্বরে পৌঁছেছে। হিন্দুদের বৈদিক যুগ মূলতঃ কৃষিযুগ ছিল। মাটি ফুঁড়ে সীতা ওঠার কল্পনার মতো মাটিতে গড়ে আরাধ্যের প্রতিমূর্তি গঠনও সহজ ভাবেই তাদের দ্বারা হয়েছে। পার্থিব পরম প্রাপ্তি হিন্দুদের এখনও বাকী আছে।

হার্কার এবারে চিপ্‌টেন কাটে,--হিণ্ডুজ আর বিগটস অ্যাণ্ড বিষ্ট্‌স্‌। দে কমপেলড দেয়ার উইমেন টু এণ্টার দি ফিউনেরাল পায়ারস অফ দেয়ার হাজব্যাণ্ডস।

আলোচনা তিক্ত হয়ে আসে। আবার লালওয়ানী সাহেবই মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন,—মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট এক অংশ সৌন্দর্যপূজারী। হয়ত হিন্দু সমাজের সেই অংশেরই কেউ পরমারাধ্যকে উপাসনার জন্য মানুষের মনের প্রতিটি ভাব অবলম্বন করে একটি করে মূর্তির কল্পনা করেছিল। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির মাপকাঠিতে বিচার করলেও লক্ষ্মীমূর্তির মতো সুন্দরী, সরস্বতীর মতো নিষ্পাপা বিদুষী, শ্রীদুর্গার মতো বিশ্বজননী, শ্রীকৃষ্ণের মতো

ভালোবাসার আধার, কয়টি মেলে? শিশুকে স্নেহ করি, তাই বালগোপাল। বাড়ীর কর্তার মতো আত্মভোলা সুখ দুঃখে সমান সন্তুষ্ট কিঞ্চিৎ নেশাপরায়ণ শিবমূর্তি শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। দুর্গার মুখভাবের মতো স্নেহ-করুণা-কৃপা-ক্ষমা সমন্বিত মাতৃমূর্তি র‍্যাফেল আঁকেন নি। যাক, এ প্রসঙ্গ আজ এখানেই শেষ হোক।

ঠিক এই সময়টায় দুটি উপদ্রব শান্তিভঙ্গ করে। বাবুর্চিখানার দরজায় একটা ঠিকে গাড়ি এসে দাঁড়ায়, এবং কাঞ্চনসওয়ারী কনখল দুপদাপ করে এসে পৌঁছয়। কনখলের কথা পরে। বাঙ্গা মালী খবর নিয়ে আসে কে একজন বয়স্কা মহিলা, সঙ্গে একটি যুবক, এসে 'ছিওরি'র খোঁজ করছে। প্রবীণ লালওয়ানীকে শশব্যস্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর অভিনয় করে হার্কার ওঠে,—চলো, হাম দেখতা কৌন হ্যায়—

লালওয়ানী সাহেব ঘুণ জজ। বহুদিন বাংলা দেশে থেকে কথিত বাংলার অভিজ্ঞতাও কিছু হয়েছে। 'ছিওরি' শুনে একটু ভুরু কুঁচকে ভেবে বলেন,—বোসো হে তোমরা। একটু বাথরুম থেকে আসি।

কনখল বাবাকে বলে—মা হাজী সাহেবের কাছে এসেছেন। একসাথে ফিরবেন বলেছেন।—ধাতস্থ হয়ে বসা স্বভাব নয়। তাছাড়া ঘোড়াটাও আলগা ছাড়া আছে। ওধারে নিয়ে আস্তাবলে রাখলেও হয়। উঠে কাঞ্চনের লাগাম ধরে আস্তাবলের দিকে যায় কনখল। কিন্তু অন্ধকারে বাইরের রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে পড়ে। হার্কারের গলায় ফিস ফিস তর্জন—কিন্তু পবিত্র মাতৃভাষায়।

—আমার পজিসন রইল না। কে ভিক্ষুকের মতো তোমাদের এখানে তাড়া করে আসতে বলেছে? আর এই পেঁচোটার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! একখানা চিঠি লিখে আসতে কি হয়েছিল? ত'হলে আগে থেকে অন্য ব্যবস্থা করে রাখতুম। এখানে রয়েছি বিদেশীর বাসায়, তার ওপর মস্ত লোক,—জেলা জজ। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

মহিলাটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে যা বললেন, কনখল তার মর্মার্থ এই বুঝল যে, গয়না বিক্রী করে হার্কার সাহেবকে তাঁর ঐ মা বিলেত পাঠিয়েছিলেন। আজ একবছর কোনো খবর রাখে না হার্কার এবং চাকুরী পাবার পর এখানে এসে কাজে যোগ দেবার খবর ঐ পোঁচোই সংগ্রহ করেছে। ছেলেকে দীর্ঘকাল না দেখে মা মর্মযন্ত্রণা ভোগ করছেন। জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে ছেলে যোগ্য হয়েছে তাই এখন তাকে দেখে স্বর্গসুখ অনুভব করবেন এবং জীবনের বাকী কটা দিন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবেন। ওঁদের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়।

সগর্জনে হার্কার বলল,—এই নাও দশটা টাকা। গাড়োয়ানকে বলো বাজারে কোনো হিন্দু হোটেলে নিয়ে যাক। রাত কাট্‌লে কাল চাপরাশি পাঠিয়ে যা'হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে যতো সব—

সুগৌর লালওয়ানী টকটকে লাল হয়ে উঠেছেন কিনা, অন্ধকারে কনখল ভালো বুঝতে পারছে না, তবে এটুকু অনুভব করেছে, যে জায়গাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। চাপা আগুনের গরম।

—ইউ স্কাউণ্ড্রেল। মার সামনে বকব না তোমাকে। বাঙ্গা ওহি কেরায়া গাড়িকো ঠায়রানে বোলো। আর, ইয়ে নয়া হাকিমকা সমান সব উস্‌মে উঠায় দো। গেট আউট অ্যাট ওয়ান্স ইউ রেচ। তার পরই অনুতপ্ত সুরে মহিলাকে বললেন,—মা, অপরাধ নেবেন না। আপনার ছেলেকে আমি বাড়ীর বার করে দিচ্ছি, সে তারই ভালোর জন্যে। আর আপনার বুড়োছেলের বাড়ীতে আপনি থাকবেন, যতদিন আপনার ছেলে বাড়ি ভাড়া করে আপনাকে নিয়ে না যায়। আপনার বৌমা এখানে নেই—তাতে অসুবিধে হবে না। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। আমার সেরেস্তাদার নবীনবাবু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সগৃহীণী তাঁকে আনিয়ে নিচ্ছি। আমি দরকার হলে আঠাঘরে গিয়ে শোব।

চিত্রার্পিতের মতো অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে কনখল। ঘোড়া

আস্তাবলে ওঠাবার কথা ভুলে যায়। খিড়কির দরজা দিয়ে অপমানিত পলায়ন স্বচক্ষে দেখে। তারপর ফিরে এসে বাগানে বসে। লাল-ওয়ানীও ফিরেছেন, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে সাধারণ আলোচনায় যোগ দেন। হার্কার কোথায় গেল, সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করেন না। তাঁর কৃতকর্মের যে একজন জলজ্যান্ত সাক্ষী থেকে গেছে, গোটাকয়েক জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তার সে খবর অজানাই থেকে যায়।

আপন মনে দাঁত কিড়মিড় করে কনখল। পারলে হার্কারটাকে অথবা মায়ের ছিওরি, আসলে শ্রীহরিটাকে, গুলি করে মারত। যুক্তিতর্কের বয়স কনখলের নয়। অনুমান, উপমাও মাথায় আসে না। নিজের মা। গয়না বেচে ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন। সেই ছেলে চাকরি পেয়ে ফিরে এসে দোড়গোড়া থেকে বিদেশাগতা মায়ের গাড়ী হাঁকিয়ে দেয়, বলে হিন্দু হোটেলে গিয়ে ওঠো। এই অমানুষিক ব্যবহার অন্যায় ও অসঙ্গত, এ বোধ আছে কনখলের। কি এর প্রকৃষ্ট শাস্তি, ঠিকমতো আঁচ করে উঠতে পারে না।

রাত্তিরে মার কাছে কেঁদেকেটে সব বলে কনখল। হৃষীকেশও শোনেন। তিনি বলেন,—আশ্চর্য ভদ্র এই লালওয়ানী। অতবড় কাণ্ডটা করে এল আর একটু জানতে দিল না? নিভ তুমি কাল গিয়ে ছিওরির মায়ের সাথে দেখা করে এস।

নিভা বলেন,—এক একটা পশুপ্রকৃতির মানুষ যে কি করে জন্মায়।

বাগচি বলেন,—হয়ত জন্মেছিল মানুষ হয়েই, বিলিতী চাকচিক্যের বদহজম রূপান্তর ঘটিয়ে ছেড়েছে।

কনখল শুতে গিয়ে হার্কারের অপরাধে নিজে কেঁদে বালিস ভাসিয়ে দেয়।

২৬

ওদের সিলেট ছাড়তে আর দিন দু-তিন বাকী আছে। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করা, ইত্যাদি কারণে বয়সের অতিরিক্ত সম্মান ছেলেমহলে পেয়ে থাকে কনখল। প্যারীবাবুর ছেলে জীবন একদিন বলে,—ওরে, আমাদের একটা গাদাবন্দুক আছে, সেটা ঢেরদিন খাটের তলায় থেকে জং পড়ে প্রায় নষ্ট হয়ে আছে। একটু সাফসুফ করে দিবি?

গাদা বন্দুকের রহস্য কনখলের জানা নেই, ভাঁজ করে কার্তুজ পোরার হদিস ও জানে। তবে রহমৎ সাবেকেলে লোক, ওর নিশ্চয় এ সব জানা আছে। যাবার আগের দিন দুপুরে রহমৎকে নিয়ে হাজির হয় জীবনদের বাড়ীতে। জীবনদের বাড়ীটা অদ্ভুত গঠনের। বাইরের ঘর দু রাস্তার মোড়ে, এবং একতলার ভিত বাইরের পাঁচিলের থেকে উঁচু। ঘরের সামনে বেশ চওড়া বারান্দা, উঠোনে সাবু গাছ, বিলিতী পাম ও ছোট ঝাউয়ের ঝাড় দিয়ে রাস্তার দিকের নজর প্রায় বন্ধ।

বাড়ীতে বাইসাইকেলের সরঞ্জামের মধ্যে একটা তেলের টেপা ডাব্বা ছিল সেইটি, এবং বন্দুকের নল পরিষ্কার করবার প্যাঁচকষা রড নিয়ে ওরা হাজির। জীবন বন্দুকটা বার করেই রেখেছে। বন্দুকের বাক্স, বারুদ, তুলো, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ছিটে ও ক্যাপ সবই মজুত। মূল দ্রব্যটিই অশক্ত, উপকরণের অভাব নেই। রাস্তামুখী কাঠের বেঞ্চিতে বসে তিনজনে তোড়জোড় করে বন্দুক পরিষ্কার করায় মন দেয়।

নলের ভেতরের মরচে তুলতে ওরা হিমসিম খেয়ে যায়। বাঁকানো

তারের তুলি সমেত রড দিয়ে অতি কষ্টে ইস্পাতের ঔজ্জ্বল্য আংশিক ফেরে। তুলো দিয়ে তেল পরিষ্কার করে বারুদ গাদতে থাকে। তারপব কিছু ছররা ও ছেঁড়া কাগজের পুঁটলী দিয়ে ইঞ্চি তিনেক মশলা তৈয়েরী হয়। কিন্তু রহমৎ আবার খুঁচিয়ে সব বার করে ছররাগুলো সরিয়ে রাখে। বলে,—পুরানো যন্তর, ফেটেফুটে যেতে পারে। ফাঁকা আওয়াজের ব্যবস্থা হলেই হোলো।

ক্যাপ পিনের ওপর বসিয়ে নল আকাশমুখী করে খুট-খাট শব্দে ঘোড়া টিপে যায়, কিন্তু আওয়াজ নেই। রহমৎ বলে, হয় বারুদ নষ্ট হয়ে গেছে, না হয় ক্যাপে পিন টিপছে না। বন্দুক একবার এর হাত থেকে ওর হাত, তিনজনের হাত ফিরি করছে, কিন্তু নিস্ফল চেষ্টা। নির্জীব বোঝার মতো বন্দুকটা নিষ্প্রাণ হয়েই আছে।

এত ক াণ্ডকারখানার মধ্যে কখন যে শীতের বেলা গড়িয়ে এসেছে কেউ খেয়াল করেনি। আজ বিকেলে আয়েষাদের আসার কথা। রাতে খেয়ে যাবেন সবাই। রহমৎ উসখুস করে উঠে যায়। কিন্তু জীবন ও কনখলের জেদ চেপে যায়। আবার বন্দুক খালি করে, আবার বারুদ পুরে বিনা ছররায় ভালো করে গেদে আবার ক্যাপ চাপায়।

কখন আকাশমুখী নল ক্লান্ত কিশোর হাতসুদ্ধ রাস্তামুখী নেমে এসেছে, এবং কখন যে দড়াম করে একটা বিকট গর্জনধ্বনি শোনা গেছে, সে চৈতন্য ওদের আদৌ হয়নি। ওদের সমস্ত চৈতন্য ছাপিয়ে একটা তীব্র আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে—ওরে বাবারে—

এ কণ্ঠস্বর কনখলের জীবনবীণার মুল সুর। এ আয়েষার গলা। ভাগ্যিস রাস্তার ও-দিকটা নির্জন, একটি লোকও নেই রাস্তায়। একলাফে কনখল রাস্তায় নেমে আয়েষার দু-হাত ধরে বারান্দায় উঠিয়ে আনে। ডান হাতের কনুইয়ের ওপর দিয়ে ঝির-ঝির করে করে রক্ত পড়ছে। আয়েষা প্রায় বেহুঁস। অন্দর থেকে পাগলিনীর মতো উষা ছুটে বেরিয়ে আসে। ওকে ডাকতেই নিভা আয়েষাকে

পাঠিয়েছিলেন। উষার হাহাকার একটা আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ধ্বনিত হয়—ওরে কনখল, তুই কি করলিরে, আয়েষাকে মেরে ফেললি—

জীবন ভয়ত্রস্ত হয়েও সম্বিত হারায় না। বলে—আমি কিন্তু ছুঁড়িনি বন্দুক। ছুঁড়েছে কনখল।

দেখতে দেখতে পাশের বাড়ি থেকে বাগচি, জাফর, নিভা, কুলসম, ব্যাঙা, রহমৎ—সবাই এসে হাজির হয়। আয়েষার আহত হাতটা বুকে নিয়ে কনখল বসে আছে, তার এই নিদারুণ অপরাধের জন্য দৈহিক দণ্ড দিতে হলে আয়েষারও লাগবে। বাগচি ক্রুদ্ধ এবং বিপন্ন, নিভাননী ভাবলেশহীন, কুলসম ক্রন্দনশীলা, শুধু জাফর ডাক্তার কিছুমাত্র বিচলিত নন। বন্দুকের আওয়াজ শুনেই রহমৎ ওঁকে বলতে বলতে এসেছে, নলে আদৌ ছিটে পোরা হয়নি, শুধু দু-চার টুকরো ছেঁড়া কাগজ। ধীরভাবে আয়েষার আহত স্থান পরীক্ষা করে জাফর বলেন—সুপারফিসিয়াল উণ্ড। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে আছে। ঘা দু-দিনে সেরে যাবে। তবে কনখল, তুমি বড় হচ্ছ—অস্তর-শস্তর নিয়ে যখন-তখন ঘাঁটাঘাটি কোরো না, যেগুলো হঠাৎ ঘটে, তাই দুর্ঘটনা। ফল খারাপ হলে আফশোষের সীমা থাকবে না। আজকে আয়েষার আঘাত কিছু নয়, কিন্তু ওর বিয়ের কথা হচ্ছে, যদি দৈবাৎ নাক-মুখে চোট লাগত কি বিপদে পড়তাম বলো তো?

কনখল দাঁতে নীচের ঠোঁট চেপে তিন-চারটে বেগুনী দাগ তোলে। চোখের মণিদুটো পাঁকে পড়া অসহায় জন্তুর মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে।

জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই আয়েষার দুষ্টুমি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কনখলের পেটে চিমটি কেটে বলে—খুব আস্তে আস্তে বলে,—দিলি ত? জখম করে তবে ছাড়লি।

হলুদ রঙের দুর্গন্ধ আয়োডোফর্মের পট্টি লাগানোর ব্যবস্থা করে, জীবাণু বিনাশক পেয় একটি ওষুধের ব্যবস্থা করে, জাফর ডাক্তার

বললেন,—আজ রাত ত ওকে অতটা রাস্তা ঝাঁকিতে নেয়া ঠিক হবে না।

নিভাননী বললেন,—ও আমার কাছে থেকেছে। ও আমার কাছেই থাকবে। কাল যাবার আগে আপনাদের কন্যা সমর্পণ করে যাব।

কনখল বোকা বনে গেছে। রাত্তিরে নিভাননীর সাথে শুয়ে আয়েষা যখন প্রায় ঘুমন্ত কনখল উঠে এসে চুপিসারে তাকে দেখে যায়। নিভাননী ঘুমিয়ে পড়েছেন, আয়েষা অর্ধমুদ্রিত চোখে একপলক চেয়ে বলে,—চিহ্ন না রেখে গেলে তোকে কি মনে রাখতুম না?

আয়েষার কোল ঘেঁষে বিছানায় মুখ উপুড় করে শুয়ে পড়ে কনখল। যে হাতটা জখমি নয়, সেইটে দিয়ে কনখলের চুলে কপালে হাত বুলোয় আয়েষা।

হঠাৎ উঠে কনখলের গালে চুমো খেয়ে বলে,—তোর চোখের জল কি নোনতা রে কনা—
